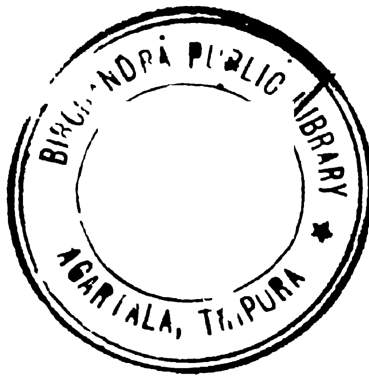
আষাঢ়ের সাঁঝ

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আসরের গল্প

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়



আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র—১৩৩৮

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
৭১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
অশোক ভট্টাচার্য
শোভনা প্রেস
১/১, জাননগর রোড
কলিকাতা-১৭

প্রচ্ছদশিল্পী:
খালেদ চৌধুরী

১২'০০

নিবেদন

গল্প নাম দেওয়া হলেও এই বইয়ের কোন কাহিনীই কাল্পনিক নয় এবং 'আসরের গল্প' নামে পরিচিত করলেও বিষয়বস্তু আরো ব্যাপক। কারণ আসরের সঙ্গে তাদের নায়ক নায়িকার সঙ্গীত জীবন ও সেই সঙ্গে সমকালীন, এমন কি পূর্ববর্তী যুগের কথাও আছে। আমার উদ্দেশ্যও তাই—যে গুনীরা অতীতের ছায়ালোকে আত্মগোপন করেছেন এবং রাগ সঙ্গীতের যে সমৃদ্ধ যুগ কালের পটক্ষেপে ইতিহাস হয়ে উঠেছে, তাঁদের প্রসঙ্গ সেই পৃষ্ঠপটে চিত্রিত করা। যেমন, 'বিদায়, ধ্রুপদ' অধ্যায়ে ধ্রুপদগুণী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত জীবনের সঙ্গে কলকাতায় ধ্রুপদচর্চার একটি রূপরেখা দিয়েছি। কিংবা ভাওয়াল-রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের তবলা বাদনের সূত্রে সমগ্র ঢাকা অঞ্চলের পাখোয়াজ-তবলা বাদ্য ধারার বিবরণ। অর্থাৎ রম্য রচনার আকারে সেকালের সঙ্গীতচর্চা ও কলাবিদ্‌দের বৃত্তান্ত।

বলা বাহুল্য, কোন কাহিনীই চিত্তাকর্ষক করবার জন্যে মনোরম কল্পনার খাদ আদৌ মিশ্রিত করা হয়নি। প্রতিটিই দাঁড়িয়ে আছে সত্যের ভিত্তিতে। শেষ অধ্যায় 'একটি আশ্চর্য প্রতিভা ও অবিশ্বাস্য মৃত্যু' সম্বন্ধেও সেই কথা। ঘটনাবলীর সত্যতায় নিজে নিঃসন্দেহ না হলে এলেখা প্রকাশ করতুম না।

আমার আর একটি লক্ষ্য—সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতজগতের যোগাযোগ স্থাপন। সেজন্যেই, প্রায় অপরিচিত এমন কি উপেক্ষিত সঙ্গীতগুণীদের উপস্থিত করেছি সাহিত্যের দরবারে। তাঁদের সঙ্গীত-জীবনের সূত্রে বর্তমান ও ভাবী কালের পাঠক সমাজ বিগত যুগের সঙ্গীতচর্চার কিছু পরিচয় পাবেন। সঙ্গীতজ্ঞরা আকৃষ্ট হবেন সঙ্গীতবিষয়ক সাহিত্যের প্রতি। সাহিত্যশিল্পীরা হয়ত সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে একটি আত্মিক সম্বন্ধ ও সাজাত্য অনুভব করবেন। বিদগ্ধ সাহিত্য রসিকদের কৌতুহল জাগবে ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে—যে সঙ্গীত আমাদের গরীয়ান সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ; সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য মণ্ডিত মহান বিদ্যা। সে সঙ্গীত-ধারার যেমন গভীরতা, তেমনি বিপুল বিস্তার। অশেষ তার বৈচিত্র্য সম্ভার। সেজন্যেই ঐকান্তিক সাধন সাপেক্ষ। সেই বিরাটের উপযুক্ত আস্বাদন ঘটানো আমার সাধ্যের অতীত। কিন্তু কিছু তার আভাস যদি এ লেখায় পাওয়া যায় তাহলেই আমার প্রয়াস সার্থক জ্ঞান করব।

সৌভাগ্যক্রমে এই সেতুবন্ধনের শুভ সূচনা করেছেন কয়েকজন আচার্য স্থানীয় সাহিত্যগুণী। সমালোচক প্রবর ও সাহিত্যের অধ্যাপক, স্বর্গত

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক প্রকাশের সময় 'আসরের গল্প'কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এখন ভূমিকা'র আকারে তাকে স্বীকৃতি দিলেন বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রবীণতম লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীবিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়। যাঁর শিল্পী মানসের দুই মেরুতে 'স্বার্গদপি গরীয়সী' ও 'নীলাঙ্গুরীয়' ভাস্বর, সেই দীর্ঘকালের সৃজনশীল সাহিত্য রচয়িতায় উদ্বোধনী ভাষণ এই পুস্তকের লক্ষ্যের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান মানে করি। তেমনি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মরমী ব্যাখ্যাকার, শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য রত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধায়ের আন্তরিক বানীও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গৌড়ীয় সংস্কৃতি' পদাবলী সাহিত্য ও কীর্তন সঙ্গীতের ত্রিবেনী সঙ্গমে স্নিগ্ধ তাঁর সাহিত্যলোক। তাঁদেরসকলেরই আশীর্বচন শিরোধার্য।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়কে বইখানি উৎসর্গ করে কৃতার্থ হয়েছি সাহিত্য জগতের সঙ্গে যুক্ত করণের আর এক দিক থেকে। তাঁর নিরলস ও সুদীর্ঘ পরিক্রমায় 'দুই বার বাজা' থেকে 'রতি ও আরতি' প্রভৃতির পর্ব এক মহৎ পরিণতির দ্যোতক। তাঁর সৃষ্টির ধারা আজো অব্যাহত। সেই সঙ্গে জীবনীমালা রচনার সূত্রে বৃহত্তর জাতীয় ধর্মসংস্কৃতির গভীরে তিনি অবগাহন করেছেন এবং সেই উপলব্ধির বার্তা পাঠক সমাজকে তন্নিষ্টভাবে শুনিয়েছেন। বিশেষ ভাবে সেইজন্যে আমি, তাঁরই ভাষায়, 'শ্রদ্ধায় বিশুদ্ধ, স্বীকৃতিতে অকৃপণ।'

এই বইয়ের জন্যে তথ্য সংগ্রহ বহুদিন ধরে বহুজনের কাছে করতে হয়েছে। প্রকাশের প্রাক্কালে তাঁদের সকলের সহযোগিতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

ছবি মুদ্রণের জন্যে দিয়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই। শ্রীজ্ঞান, আবদুল করিম খাঁ ও বাদল খাঁর ছবির জন্যে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এবং শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের ছবির জন্যে শ্রীবনবিহারী মল্লিক বিশেষ ভাবে ধন্য-বাদর্হ।

নিবেদক

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

"আসরের গল্প' বাংলা ভাষায় একটি অভিনব সংযোজন।' সমপূর্ণ অভিনব শুধু এই জন্যেই বলা যায় না যেহেতু এর পূর্বে, গ্রন্থকারেরই লেখা এই ধরণের পুস্তক 'সঙ্গীতের আসরে' পেয়েছি আমরা। দু'খানির গ্রন্থেই গ্রন্থের যা প্রতিপাদ্য তা সুস্পষ্ট। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতি হয়ে গেছেন, কণ্ঠ,যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই—তাঁদের জীবনালেখ্য। সঙ্গীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত বা যে যে ঘটনায় তাঁদের সঙ্গীত-প্রতিভা স্বীয় দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে—এমন সব ঘটনাকে গ্রন্থভুক্ত করেছেন লেখক। যাঁদের সমস্ত জীবনই নানা বৈচিত্রে—বিষাদে-আনন্দে সঙ্গীতময় বলা চলে, তাঁদের আলেখ্য কিছু দীর্ঘায়িত। গ্রন্থের প্রথম কাহিনী 'ছন্দহারা' এবং শেষ কাহিনী "একটি আশ্চর্য্য প্রতিভা ও একটি অবিশ্বাস্য মৃত্যু'—এই পর্য্যায়ের।

আমি "কাহিনী" কথাটা একটু বেছে নিয়েই ব্যবহার করলাম, কেননা এই কাহিনী রূপটিই গ্রন্থটিকে সেই বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যার জন্য আমি একে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে লেখকের একটি অভিনব অবদান বলেছি।

সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শুধু সুর-তাল-লয়াদি নিয়ে সুরকারের জীবন বিবরনী হলে, সাধারণ ভাবে মোদ্দা কথাটা বলে আসরে—সম্মেলনে তাঁদের কৃতিত্ব অকৃতিত্বের রেকর্ড হলে, এ গ্রন্থ একখানি গবেষণা লব্ধ ক্রনিকল বা ইতিহাসে পরিণত হোত। কিন্তু তথ্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম কারুবিন্যাসে, আর অনবদ্য সরস ভাষায় সঙ্গীত-গ্রন্থটির মধ্যে একটি যেন সঙ্গীতেরই ঝঙ্কার এনে দিয়েছে। সর্বসাকুল্যে একটি সবস সুন্দর কাহিনীই।

এ ধরণের গ্রন্থের মূল ভিত্তি তথ্য। এইখানে লেখকের সত্যনিষ্ঠা না থাকলে, অন্য দিক দিয়ে যতই আকর্ষনীয় হোকনা কেন, একখানি সঙ্গীত সংক্রান্ত গ্রন্থহিসাবে এ গ্রন্থের কোনও মূল্যই থাকত না। এতগুলি সুরকারের প্রায় সকলেই বিগত—জীবন সম্বন্ধে এত তথ্য আহরণ আমার আশ্চর্য্যই বলে মনে হয়েছে। পশ্চিমা, বাঙলী বড় বড় শিল্পীর কথা, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াশাঁকো, শোভাবাজার, গোবরডাঙা, দ্বারভাঙ্গা, মুক্তাগাছা প্রভৃতি সঙ্গীত পরিপোষক রাজবাড়ির কথা, পশ্চিমা ও বাংলার বিভিন্ন আসর সম্মেলনের কথা—অবশ্য যতটা প্রাসঙ্গিক সে সব গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন লেখক। ত্রুটি-বিচ্যুতি কোথাও হয়েছে কি না আমি সেকথা বলবার

অধিকারী নই। তবে সুদূর দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবারের দুই পুরুষ ধরে সঙ্গীতের সমাদর সম্বন্ধে আমি এখানকার লোক হওয়ার জন্যেই এবং রাজস্টেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকার জন্যই খানিকটা ওয়াকিবহাল। সেই অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, অন্ততঃ তথ্যসংগ্রহে লেখকের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশই আছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে, এই সব তথ্যকে, কল্পনার সাহায্য না নিয়ে, শুধু উপযুক্ত ভাষায় নিপুণভাবে সাজিয়ে বলে যাওয়া। তথ্যাশ্রিত ঘটনা-বিন্যাসের পরিচয় এ ভূমিকায় দেওয়া সম্ভব নয়, পাঠক নিজেই লক্ষ্য করতে পারবেন তথ্য কিভাবে কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি লেখকের ভাষার কিছু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করলাম—

"সঙ্গীতে যাঁর ছন্দ নৈপুণ্যের সীমা ছিল না, ছন্দো-বৈচিত্রের জন্য যিনি অভিনন্দন লাভ করতেন আসরে আসরে তাঁরই জীবনে ঘটল এমন ছন্দ-পতন। রাগসঙ্গীতের এত বড গুণী, সুর সৃষ্টিতে যাঁর তাললয়ের সুষম বিন্যাস রস-মাধুর্যের সঙ্গে শিল্প পটুত্বের সমন্বয় করত, তাঁর জীবনেই তালভঙ্গ হল।

অন্য কোন শিল্পীর সরল রেখার জীবন নয়। সেকালের এক খ্যাতনাম্নী নটীর তরঙ্গায়িত জীবন। বর্ণালী বর্তমানই তার সর্বস্ব। ভবিষ্যৎ অ-দৃষ্ট, অতীত অদৃশ্য। ইহ-দিনের উচ্ছ্বসিত দ্যুতি সেখানে অনন্ত সুখের মরীচিকা সৃজন করে। আর সেই জমাট আসরে আকস্মাৎ যেন উর্বশীর তালভঙ্গ।"

(ছন্দহারা ১ম পৃঃ)

"দৃষ্টি প্রদীপ জ্বলেনি বটে, কিন্তু অন্তরে আর এক আলোকের রাজ্য। ছন্দোময় সুর তার সেই আলো। সুর সাধকের মনের চোখে তাইতেই এক অপরূপ বিশ্ব বিরাজ করে। নিজেরই নিংসারিত সুর ধারায় সে জগৎ ধরা দেয় তার অন্তরে। সেই সঙ্গীত ধ্বনিতে তার সমগ্র চেতনা উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।"

(দৃষ্টি হীনের সুরজগৎ পৃঃ ১৯০)

"যেন একটি বসন্ত বাহারের খেয়াল আরম্ভ হয়েছিল অপরূপ সম্ভাবনা নিয়ে। সংক্ষিপ্ত আলাপচারির পরে তারই প্রতিশ্রুতিভরা স্থায়ী কলিটি মাত্র শোনা গিয়েছিল। কিন্তু উদাও অন্তরা আর নব নব তান বিস্তারের লীলা বিন্যাসের আগেই অকস্মাৎ গানখানি স্তব্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।"

(একটি আশ্চর্য প্রতিভা ও অবিশ্বাশ্য মৃত্যু পৃঃ ২৩৯)

যখনই যেভাবে প্রয়োজন এসে পড়েছে, লেখকের ভাষা এইভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীত এবং কাব্য মানব মনের দুটি শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি; কাব্য আবার সঙ্গীত-ধর্মী বলেই। লেখক নিজে সুবসাধক কিনা আমার জানা নেই, তবে তিনি সে একজন দরদী, সুরসিক সঙ্গীতজ্ঞ এ পরিচয় যথেষ্টই দিয়েছেন বই খানিতে। তা না হলে, একজন তথ্য-বিলাসী গবেষক মাত্র হলে গ্রন্থের এরূপটী ফোটাতে সক্ষম হতেন না।

দ্বারভাঙ্গা }

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের

করকমলে

লেখকের সঙ্গীত বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থ :

সঙ্গীতের আসরে

বিষ্ণুপুর ঘরাণা

সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও

সঙ্গীত কল্পতরু

॥ ছন্দ হারা ॥

সেকালের বিচিত্র এক নটী-জীবন। আশ্চর্য তার উত্থান-পতনের কাহিনী।

বাংলার নাট্যমঞ্চে প্রথম যুগের গায়িকা-অভিনেত্রী। পাদ-প্রদীপের সামনে প্রথম প্রসিদ্ধি এল। প্রেক্ষাগৃহের দর্শক-শ্রোতাদের সামনে সঙ্গীত-জগতেও প্রথম প্রতিষ্ঠা।

তারপর আরম্ভ হল আসরের পর্ব। যশ, অর্থ আর সার্থকতায় ভরা কলাবতীর জীবন। এত বেশী আসর আর এত বেশী মুজরো সেযুগে আর কোন্ নটীর হত ? সমঝদার মহল থেকে এত তারিফ আর ধনীদের আসরে আসরে এত নাম!

কিন্তু হঠাৎ সে সব জল্‌সার আলো একসঙ্গে নিভে গেল। অন্ধকারের একটা অধ্যায় এসে পড়ল নটীর জীবনে। দীর্ঘকালের অজানা অন্তরাল।

শেষে আবার আলো জ্বলল বটে, কিন্তু সে সন্ধ্যা-দীপের করুণ শিখা। স্নিগ্ধ, কিন্তু ম্লান জ্যোৎস্না। চমকিত দ্যুতি আর নেই, কিন্তু মাধুরী একেবারে নিঃশেষ হয়নি।

তবে জীবনের ছন্দ হারিয়ে গিয়েছিল। আর সেইটিই সবচেয়ে বড় বিস্ময়।

সঙ্গীতে যাঁর ছন্দ-নৈপুণ্যের সীমা ছিল না, ছন্দো-বৈচিত্র্যের জন্যে যিনি অভিনন্দন লাভ করতেন আসরে আসরে, তাঁরই জীবনে ঘটল এমন ছন্দ-পতন! রাগসঙ্গীতের এত বড় গুণী, সুরসৃষ্টিতে যাঁর তাললয়ের সুষম বিন্যাস রস-মাধুর্যের সঙ্গে শিল্প-পটুত্বের সমন্বয় করত, তাঁর জীবনেই তালভঙ্গ হল:

অন্য কোনো শিল্পীর সরল রেখার জীবন নয়। সেকালের এক খ্যাতনাম্নী নটীর তরঙ্গায়িত জীবন। বর্ণালী বর্তমানই তার সর্বস্ব। ভবিষ্যৎ অ-দৃষ্ট, অতীত অদৃশ্য। ইহ-দিনের উচ্ছ্বসিত দ্যুতি সেখানে অনন্ত সুখের মরীচিকা সৃজন করে। আর সেই জমাট আসরে অকস্মাৎ যেন উর্বশীর তালভঙ্গ!

কলাবতীর আলো-আঁধারের জীবন। জানা-অজানার বর্ণ-ছায়াময় রহস্যে ঘেরা। পাদ-প্রদীপের সামনে স্ব-প্রকাশ এবং যবনিকার অন্তরালে নেপথ্যচারী।

সে নটীর জীবনের বেশি অংশই অপরিচয়ের আবরণে ঢাকা। শুধু বিদ্যুৎ চমকে ক্ষণদীপ্তির মতো কটি মাত্র অধ্যায় উদ্‌ভাসিত দেখা যায়। সেই বিক্ষিপ্ত কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে তাঁর জীবনকাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। তবে সেই খণ্ডিত জীবনই ভাস্বর হয়ে আছে নানা নাটকীয়তার জন্যে।

তাঁর জীবনের মন্দ্র মধ্যাহ্ন এবং বিশেষ করে সকরুণ সায়াহ্নের অস্তরাগ কথার বিচ্ছিন্ন বিবরণ জানা যায়। আর সেই সঙ্গে উষাকালের সামান্য আভাস।

শিল্পী জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই যশের স্বর্ণমুকুট তিনি লাভ করেন। মধ্য পর্বে অর্থ ও প্রতিপত্তির অজস্র দাক্ষিণ্য এবং গুণী ও সঙ্গীতরসিক মহলে প্রতিভার স্বীকৃতি। সেদিক থেকে জীবনে সার্থকতা এসেছিল। কারণ সাধারণ নটীর :জীবন নয়। নিছক রূপজীবিনী বলা যায় না, কারণ রূপ ছিল না আদৌ। পেশা ছিল সঙ্গীতচর্চা। তবে সে কলাবতী সঙ্গীত-সাধিকার জীবন সমাজ শাসনের বহির্ভূত, অসামাজিক। সুতরাং পূর্ব জীবন অজ্ঞাত। উর্বশীর রূপতনুর মতন তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা একেবারে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রস্তুতি বা সাধনার পর্বের মতন তাঁর প্রথম জীবনও ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

নাম যাদুমণি। বাঙালী বাঈ শ্রেণীর মধ্যে এত সুপরিচিত নাম সে যুগে আর দ্বিতীয় ছিল না। কণ্ঠ-সঙ্গীতে বহুমুখী প্রতিভার আধার যাদুমণি। খেয়াল টপ্পা ও ঠুংরিতে পারদর্শিনী। তেমন আসর হলে ধ্রুপদও শোনাতেন। উপরন্তু নৃত্য-পটীয়সী। ভাব প্রদর্শন করে (ভাও বাৎলাবার সঙ্গে) নৃত্য পরিবেশন করতেন সুষম ছন্দে। এবং সে সবই রীতিমতো শিক্ষার ফলে সম্ভব হয়েছিল, অশিক্ষিত-পটুত্বে নয়। আর সে শিক্ষা পেয়েছিলেন তখনকার ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণীর কাছে। যেমন, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, জগ্‌দীপ মিশ্র, সারদা সহায় প্রভৃতি।

তাঁদের পরিচয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। নচেৎ যাদুমণির সঙ্গীত-জীবনের পটভূমি ধারণা করা যাবে না।

বেতিয়া ঘরানার গুরুপ্রসাদ মিশ্র উনিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ ও সুপরিচিত গায়ক। কাশীর সন্তান হলেও দীর্ঘকাল তিনি কলকাতায় বাস করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিবনারায়ণ মিশ্রের সঙ্গে এবং বাংলা দেশেই তাঁর সঙ্গীত-জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়েছিল, বলা যায়। তাঁর

বেশির ভাগ শিষ্যও গঠিত হয় বাংলায়। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও উত্তরাধিকারী। তা ছাড়া, খেয়াল-গায়ক শশিভূষণ দে (অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র প্রথম সঙ্গীত-গুরু), গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও গুরুপ্রসাদের কাছে শিক্ষা করেছিলেন। মিশ্রজীর অন্য এক খ্যাতনাম্নী শিষ্য হলেন যাদুমণি। বেতিয়া ঘরানা ধ্রুপদের ঘর, কিন্তু গুরুপ্রসাদ খেয়াল গানের সাধনাও রীতিমতো করেন এবং তাঁর শিষ্যদের খেয়াল অঙ্গেও শিক্ষা দিতেন। কোনো কোনো খেয়াল গান সঙ্গীতের আসরে চিহ্নিত ছিল গুরুপ্রসাদের ঘরের বলে। যেমন, ইমনের সেই বিখ্যাত গানখানি—'গহেরি গহেরি নদীয়া ভরি আয়ি।' যাদুমণি তাঁর কাছে প্রধানত খেয়ালই শিখেছিলেন। ওই গানটিও তিনি পেয়েছিলেন ওস্তাদের কাছে। গানটি যাদুমণির একটি প্রিয় গান ছিল, অনেক আসরে গেয়েছেন এবং শেষ জীবনের কয়েকজন ছাত্রকে শিখিয়েছেনও। তাই পরে একদিন তাঁর এক ছাত্রর মুখে 'গহেরি গহেরি' গানখানি শুনে সেকালের আল্‌ফ্রেড থিয়েটারে হিন্দী নাটকের সঙ্গীত-পরিচালক ঝণ্ডে খাঁ বলেন—এ তো গুরুপ্রসাদের ঘরের গান। তেমনি, খেয়াল-গুণী বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একদিন গানটি শুনে বলেছিলেন—এ যাদুমণির গান।

যাদুমণি নিতান্ত বালিকা বয়সে গুরুপ্রসাদের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন।

গুরুপ্রসাদের কাছে গান শেখবার সুযোগ যাদুমণি কিভাবে পেলেন, সে কৌতূহল-উদ্দীপক কাহিনী তাঁর প্রথম জীবনের কথায় জানানো হবে।

যাদুমণির দ্বিতীয় সঙ্গীত-গুরু জগদ্দীপ মিশ্র। পশ্চিমাঞ্চল থেকে এমন বহুমুখী গুণী বাংলা দেশে বেশি আসেননি। তিনি ছিলেন একাধারে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ও ঠুংরির একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক, উপরন্তু নৃত্যবিদ্। ঘটনাচক্রে কলকাতায় তাঁর শেষ পর্যন্ত থাকা সম্ভব হয়নি এবং যাদুমণি ভিন্ন অন্য বিশেষ কেউ তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগও বোধ হয় পাননি। কলকাতায় তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত-জীবনের প্রসঙ্গ বিশেষ করে বলা হবে 'সঙ্গীতের দীপশিখা' নামে অধ্যায়টিতে। এখানে শুধু বলে রাখা যায় যে জগদ্দীপ মিশ্রের কাছে যাদুমণি টপ্পা, ঠুংরি যেমন শিখেছিলেন, তেমনি নৃত্যও। যতদূর জানা যায়, তাঁর চেয়ে জগদ্দীপ ছিলেন বয়োকনিষ্ঠ।

যাদুমণির আর একজন সঙ্গীতগুরু ছিলেন বারাণসীর গুণী ধ্রুপদী

সারদাসহায় মিশ্র, এ কথাও কোনো কোনো মহলের ধারণা। সারদাসহায়ের অন্য দুই ভ্রাতার সঙ্গেও বাংলার সঙ্গীত জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাঁরা হলেন গোপালপ্রসাদ ও লক্ষ্মীপ্রসাদ। ধ্রুপদী গোপালপ্রসাদের শিষ্য গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক; এবং বীন্‌কার লক্ষ্মীপ্রসাদের শিষ্য—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সারদাসহায়ের যাদুমণি ভিন্ন অন্য বাঙালী শিষ্য কেউ ছিলেন কি না জানা যায় না। সারদাসহায়ের সঙ্গীতপরিবারের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ভ্রাতাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। সেদিক থেকেও হয়ত যাদুমণির সারদাসহায়ের কাছে শিক্ষার সুযোগ ঘটতে পারে।

যাদুমণির এই তিন জন ওস্তাদের মধ্যে গুরুপ্রসাদের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন সর্বপ্রথমে, অতি অল্প বয়সে এবং জগ্‌দীপ মিশ্রের কাছে শিখেছিলেন সব শেষে। জগ্‌দীপের কাছে শিক্ষার অনেক আগেই যাদুমণি গায়িকা হিসেবে প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন এবং বয়সও তখন খানিক পরিণত। সারদাসহায়ের কাছে যাদুমণি শিখে থাকলে তা তাঁর প্রথম জীবনে হওয়াই সম্ভব। গুরুপ্রসাদের কাছে শিক্ষার অব্যবহিত পরেও তা হতে পারে। গুরুপ্রসাদের শিক্ষা অন্য ওস্তাদের চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছিলেন যাদুমণি।

তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার বিষয়ে অন্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

গায়িকা-রূপে যাদুমণির প্রথম খ্যাতি হয় সেকালের বাংলার রঙ্গমঞ্চ থেকে। মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে তিনি যখন প্রথম অবতীর্ণ হন তখন তাঁর বয়স ২০।২১ বছর হবে। কিন্তু তার আগেই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গীত-গুণের পরিচয় পেয়েছিলেন। কারণ গায়িকা হিসাবেই যাদুমণিকে নেওয়া হয়েছিল রঙ্গমঞ্চে।

থিয়েটারের নটী-জীবন তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, দু-বছরের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু বাংলার নাট্যমঞ্চের প্রথম যুগের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের জন্যে তা উল্লেখ্য। কারণ বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের অংশ গ্রহণের তা প্রথম যুগ। বিনোদিনীর যোগদানেরও আগেকার কথা। যাদুমণি প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেত্রীর নাম সেজন্যে ইংলিসম্যান ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে একাধিকবার প্রকাশ পায়। যাদুমণির সূত্রে সে যুগের রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনেত্রী নেওয়ার কথা একটু বলা যায় এখানে। প্রসঙ্গটা জানবার মতন।

যে ন্যাশনাল থিয়েটার (সম্পূর্ণ নাম 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল

সোসাইটি) ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে বাংলা তথা ভারতে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবর্তন করে সে সম্প্রদায়ে পুরুষ অভিনেতারাই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করতেন। যেমন, 'নীলদর্পণ' নাটকে অমৃতলাল বসু 'সৈরিন্ধ্রী', অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী 'সাবিত্রী' (অন্য তিনটি ভূমিকার সঙ্গে), মহেন্দ্রলাল বসু 'পদী ময়রাণী', অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) 'ক্ষেত্রমণি' ইত্যাদির ভূমিকায়। এমনিভাবে 'নীলদর্পণে'র পর 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী,' 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে পুরুষ অভিনেতারা স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ের পরে ন্যাশনাল থিয়েটার যখন ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে যায়, তখন বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ চলছিল। বিখ্যাত শৌখীন ধনী ও সঙ্গীতজ্ঞ সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব, ধনকুবের রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন এই রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী। "মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে (বেঙ্গল) থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন, তোমরা স্ত্রীলোক হইয়া থিয়েটার খোল ; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া করিয়া দিব ; স্ত্রীলোক না হইলে কিছুতেই ভাল হইবে না।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ' পুস্তকে অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা)। বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম অভিনেত্রী নিয়ে ১৮৭৩ খ্রীঃ আগস্ট থেকে 'শর্মিষ্ঠা,' 'স্বপ্নধন', 'মায়াকানন', ইত্যাদি অভিনয় করবার পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হল বাংলার দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ, যেখানে অভিনেত্রীরা স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণা হন। এবং সেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পাঁচজন অভিনেত্রীর অন্যতমা হলেন যাদুমণি। অন্য চারজনের নাম—কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যাদুমণিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তাঁর সঙ্গীত-কণ্ঠের জন্যে। গায়িকা হিসাবে তখনই তাঁর নাম হয়েছিল। এই থিয়েটারে যাদুমণি 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ১৯শে সেপ্টেম্বর। তখন তাঁর বয়স ২০।২১ বছর হবে। সে-সময় গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুরূপা দেবী ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ) এবং স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী। ঐ বছরেরই শেষে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভুবনমোহনের মনান্তর হয় এবং "নগেনবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী

সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান।" ('গিরিশচন্দ্র,' অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৩ পৃঃ)

তারপর নগেন্দ্রনাথ যে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নামে থিয়েটারের দল গড়লেন, যাদুমণিও তার মধ্যে ছিলেন, জানা যায়। যাদুমণি এই সম্প্রদায়ের প্রধানা অভিনেত্রীর সম্মান অর্জন করেন তার পরিচয় আছে নিম্নলিখিত বিবরণীতে—"গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী গড়ের মাঠের সুপরিচিত লিউইস থিয়েটার রয়ালে 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয় করেন··· ৯ জানুয়ারি (১৮৭৫)। যোধপুরের মহারাজা, অনেক গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ সাফল্যলাভ করিয়াছিল। রাধিকার ভূমিকায় যাদুমণি ··বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন।" .(বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৮৮)।

তারপর গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী আগেকার বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে গিয়ে অভিনয় আরম্ভ করে ৬ই ফেব্রুয়ারি (১৮৭৫) থেকে। সেই মিলিত সম্প্রদায়েও গায়িকা যাদুমণি ছিলেন একজন বিশিষ্ট। এ বিষয়ে ইংলিশম্যান পত্রিকা থেকে (১৭ আগস্ট, ১৮৭৫ তারিখের) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ওই পুস্তকে একটি বিবৃতি উদ্‌ধৃত করেছেন—The following actors & actresses deserve special mention···The songstress Jadumani, deserves praise.

এই অভিনীত নাটকটির নাম 'শরৎ সরোজিনী'।

তারপরে আর যাদুমণির কোনো অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায় না। যতদূর মনে হয়, তারপর আর বেশিদিন রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দেখা যায়নি তাঁকে। নচেৎ এ বিষয়ে তাঁর আরো উল্লেখ পাওয়া যেত এবং থিয়েটার জগতে তিনি পরে নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে যশস্বিনী হতেন। রঙ্গমঞ্চে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই যিনি মাত্র ২০।২১ বছর বয়সে সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন, তাঁর অভিনয় প্রতিভা সম্বন্ধে স্বীকৃতি প্রকাশ পায় পত্র-পত্রিকায়। তিনি এ বিভাগে যুক্ত থাকলেও যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারিণী হতেন, তাতে আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু তাঁর প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্র হল সঙ্গীত। তাই হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চের মায়া ত্যাগ করে তিনি ফিরে এলেন সঙ্গীত জগতে—

রঙ্গালয়ে যদিও তিনি গায়িকা রূপেই যোগ দিয়েছিলেন। গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা থিয়েটার জীবনের অনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। এবং যে সময়ে তাঁর রঙ্গালয়ে অভিনয় করার কথা জানা গেল, তার পরবর্তীকালেও হয়ত গুরুপ্রসাদের কাছে তিনি শিখেছিলেন। জগদ্দীপ মিশ্রের কাছে শেখেন তারও পরে। সেই সঙ্গে, থিয়েটার ছাড়বার পর অন্য কোনো কোনো ওস্তাদের কাছেও হয়ত শিখতে বা সংগ্রহ করতে পারেন। কারণ তাঁর সঙ্গীত-জীবনের খুঁটিনাটি সব বৃত্তান্ত জানতে পারা যায়নি। শুধু এটুকু বোঝা যায় যে, থিয়েটারের পাদপ্রদীপ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সঙ্গীতচর্চা করতে থাকেন একান্তভাবে।

এখন সঙ্গীতের আসরে তাঁর খ্যাতির প্রদীপ উজ্জ্বলতর হতে লাগল দিনের পর দিন। সুরেলা, শিক্ষিতপটু বামাকণ্ঠ। ঘরানা ওস্তাদের তালিমে এবং গায়িকার নিজস্ব প্রতিভায় গঠিত। তাছাড়া, সেকালের আসরে বাঙালী নারীশিল্পী প্রায় দুর্লভ ছিল। বিশেষ এমন গুণী গায়িকা যিনি পারদর্শিনী হন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি— তিন অঙ্গেই। উপরন্তু নৃত্যেও অধিকার তাঁর হয়েছিল। 'খাড়ী ঠুংরি' গাইতেন তেমন তেমন আসরে—দাঁড়িয়ে বা ঈষৎ ঘুরে-ফিরে. ভাও বাৎলাবার সঙ্গে। সব মিলে একটি ব্যবসায়িনী, পরিণত সঙ্গীত-প্রতিভা।

সুতরাং যাদুমণি সেকালের সঙ্গীতামোদী ও বিলাসী সমাজে যশ, অর্থ ও প্রতিষ্ঠার ধাপে ধাপে উঠে যেতে লাগলেন। সে কালের সঙ্গীতাসরের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গীতের উপভোগ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে যাঁরা মুক্তহস্ত, তাঁদের দরবারে অসাধারণ নাম-ডাক হল যাদুমণির। তিনি বাছাই করা জলসার পর জলসা থেকে মুজরো পেতে লাগলেন।

শুধু কলকাতার আসরে নয়, আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে, বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সঙ্গীতের খ্যাতি। পশ্চিমের কোনো কোনো রাজদরবার থেকেও তাঁর গানের আমন্ত্রণ আসত। তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে আরো প্রসিদ্ধ হয়ে ফিরতেন।

প্রচুর উপার্জন হতে লাগল যাদুমণির। নানা আসরের মোটা মোটা টাকার মুজরো তো বটেই ; সেই সঙ্গে নিজের ঘরের অনুষ্ঠানেও অপর্যাপ্ত অর্থ। সেসব দিনের যাদুমণির গান আর রোজগারের ধুমধামের কথায় পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু বলেন—আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, যাদুমণির ঘরে

জলসা চলেছে, তিনি গাইছেন। ঘরে লোক ভর্তি, আর বসবার জায়গা নেই। তখনো তাঁর অনুরাগী পৃষ্ঠপোষকরা আসছেন। কিন্তু দোতলার ঘরে আর স্থান সঙ্কুলান হবে না শুনে রাস্তা থেকে জুড়িগাড়িতে বসেই একশ টাকার নোট ছুড়ে দিচ্ছেন ওপরকার বারান্দার ধারের সেই জলসাঘরে।···

শুধু এইসব আসরের উপার্জনই নয়। কোনো কোনো সঙ্গীতপ্রেমী, বিলাসী ধনীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল যাদুমণির ওপরে। তেমন তেমন ব্যক্তি তাঁকে নিজস্ব করে রাখতে চাইতেন, রাখতেনও। সে ধরনের আশ্রয়ের কাঞ্চন-মূল্যও অল্প নয়। এইভাবে শোভাবাজার অঞ্চলে তথাকথিত এক রাজ-পরিবারের জনৈকের আনুকূল্যে বেশ কিছুকাল যাদুমণি কাটিয়েছিলেন।

নটীর জীবনের সেই উচ্ছ্বসিত মধ্য-পর্ব। সুরে সুরে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে উচ্ছল জীবনের ভোগ-পাত্র। দুঃখের তিমির ছায়া যেন তার কোথাও নেই। সুবর্ণ, মণিরত্ন-খচিত যাদুমণির অলঙ্কার শোভার মতো তার সবটাই যেন অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিময়। এমনিভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নটীর জীবনস্রোত বয়ে চলেছিল। দীর্ঘকাল। যৌবনাহুতির শেষ পরিণতি পর্যন্ত।

কিন্তু এই শ্রেণীর আলোকিত জীবনের অন্তরালে কোথায় আত্মগোপন করে থাকে অন্ধকার। বলতে গেলে, আলো আর অন্ধকারের সহাবস্থান এখানে। পাশাপাশি, অতি ঘনিষ্ঠ তাদের অস্তিত্ব। একের সঙ্গে অন্যের কোনো দুস্তর ব্যবধান নেই। দুই সীমানার বদল মাঝে মাঝেই ঘটে যেতে পারে। ঘটেও। কখনো অন্ধকারের জীব আলোকের জগতে উঠে আসে। আবার আলোর সত্তা আকস্মিকভাবে হারিয়েও যায় অন্ধকারের অজানায়।

যাদুমণিরও তাই হল। হঠাৎ এক রাতের বিপর্যয়ে তাঁর জীবনের সমস্ত আলো একসঙ্গে নিভে গেল। তিনি হারিয়ে গেলেন অপরিচয়ের ছায়ার জগতে।

সে-কাল সংবাদপত্রের যুগ নয়। তাই বাইরের বিশেষ কেউ জানতেও পারল না যাদুমণির ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা। উত্তর কলকাতার সেই কুখ্যাত অঞ্চলের মধ্যে তাঁর কি পরিণতি ঘটল তার সন্ধানও আর কেউ পেলে না।

সঙ্গীত-জগতের বহুমুখী প্রতিভা, কোকিল-কণ্ঠী গায়িকা যাদুমণিকে দেখা গেল না আর কোনো আসরে। শুধু সঙ্গীতের আসর থেকে নয়, লোকের মনেও ক্রমে ম্লান হয়ে এল তাঁর গানের স্মৃতি। তাঁর নাম পর্যন্ত অনেকের কাছে বিস্মৃতির অতলে বিলীন হল।

তারপর পৃথিবীর দিন-রাত্রির আবর্তনে একে একে কেটে গেল কয়েক বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে জগতের কত মানুষের জীবনে কত অভাবিত পরিবর্তনই ঘটে গেল।

কয়েক বছর পরে এই জীবন-নাটকের যবনিকা নতুন করে উন্মোচিত হল—অন্য এক জায়গায়, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক অপরিচয়ের অন্ধতল থেকে পরবর্তী অঙ্কের উন্মোচন করলেন। নগেন্দ্রনাথ পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার, কিন্তু নেশা ছিল সঙ্গীতে। নিজে সঙ্গীত-চর্চা করতেন না বটে, কিন্তু গান ভালবাসতেন অন্তরের সঙ্গে। ভাল গান শুনতেন। সঙ্গীতের ভালমন্দ বোঝবার মতো কান তাঁর ছিল এবং সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা। নিজের বৃত্তিগত কর্মে তিনি পরে সি. আই. টি.-র ডেপুটি ভ্যালুয়ার হয়েছিলেন।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ তার অনেক আগেকার কথা। তখন তাঁর প্রথম জীবন। ইঞ্জিনীয়ারের পেশা তখনও আরম্ভ হয়নি। তরুণ বয়সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি প্রেস করেছেন জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বলরাম দে স্ট্রীটে। আর গান শোনার শখ খুব।

তখন তিনি পাইকপাড়ার বাড়িতে থাকেন। একদিন পথের ধারের ওপরের ঘরে রয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন কে গান গাইছে রাস্তার দিকে। প্রথমে সেদিকে কান দেননি। পথে তো কত গানই হয়ে থাকে, তাই মন দিলেন নিজের কাজে।

কিন্তু সেই গান এবার স্পষ্ট করে তাঁর কানে গেল আর তিনি অন্যমনস্ক থাকতে পারলেন না। এ সাধারণ গলার গান নয়। যেন সাধা, তৈরী গলা। টপ্পার দানা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে উঠে নগেন্দ্রনাথ বারান্দায় দেখতে গেলেন—এমন গলায় গান গাইছে কে?

ওপর থেকেই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন—এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান গাইছে বাড়ির সদরের সামনে। নিতান্ত মলিন তার বেশ-বাস, পথের ভিখারিণীর যেমন হয়ে থাকে। উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সেই ভিখারিণী গাইছে —দুখ হরা তারা নাম তোমার···

'দুখ হরা' এবং 'তারা' স্বরের ওপর টপ্পার তানের দোলনের মতো কারুকর্ম লক্ষ্য করলেন নগেন্দ্রনাথ। কণ্ঠও দস্তুরমতো সুরেলা। কোনো ভিখারিণীর এমন গলা শোনা যায় না।

তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন তাকে দেখবার জন্যে। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিখারিণী তখন গাইছে—

দুখ হরা তারা নাম তোমার,
আমি তাই তো ডাকি বারে বার।...

নগেন্দ্রনাথ দেখলেন—ময়লা কাপড়-পরা এক শ্যামবর্ণা নারী। খর্বাকৃতি শীর্ণ শরীর। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা, কিন্তু কণ্ঠে জরার চিহ্ন নেই!

নগেন্দ্রনাথ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? এমন গলা তোমার!

বৃদ্ধা ভিখারিণী এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে, হয়ত ঠোঁট একবার কেঁপে উঠল আত্মপরিচয় দিতে। কিন্তু প্রশ্নকারীর কথায় সহানুভূতির সুর শুনে আস্তে আস্তে বললে, আমি যাদুমণি। কিন্তু আমার সমস্তই গেছে।

নগেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সচকিত হলেন। এ নাম তাঁর অজানা নয়! সাক্ষাৎ ভাবে না দেখলেও যাদুমণির নাম ও গায়িকা হিসেবে খ্যাতির কথা তাঁর বিলক্ষণ জানা ছিল। তাই তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না তাঁকে এই নিদারুণ অবস্থায় দেখে।

—কি করে এমন হল?

যাদুমণি তেমনি ভাবে বললেন, সে অনেক কথা, বাবা।

নগেন্দ্রনাথ তাঁকে বাড়ির মধ্যে ডেকে আনলেন। ওপরের ঘরে এসে বসলেন যাদুমণি। এই চরম দুর্দশা তাঁর কি করে ঘটল, তা নগেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন।

তাঁর আগ্রহ ও সমবেদনা দেখে যাদুমণি সেখানে বসে জানালেন তাঁর অদৃষ্ট বিপর্যয়ের ইতিকথা।

তাঁর জীবনে যশ, অর্থ ও বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যে, সুখৈশ্বর্যের সেই চূড়ান্ত সময়েই একদিন দুর্যোগের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। সেই কাল-রাত্রির কথা নগেন্দ্রনাথকে এই ভাবে বিবৃত করেছিলেন যাদুমণি।

তখন মাঝরাত হবে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে প্রথমটা মনে হল বুঝি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিন্তু যে কষ্টের জন্যে ঘুম ভেঙে যায়, সেই কষ্টটা এখন এত বেশী হতে লাগল যে বুঝতে পারলুম এ স্বপ্ন নয়। দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার, নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলুম না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আর ঘুমের ঘোরে প্রথমে বুঝতে পারিনি

আমার বিপদ। তারপর নিঃশ্বাসের কষ্টে আর গলার যন্ত্রণায় বুঝতে পারলুম কে একজন দু-হাতে আমার গলা টিপে ধরেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই হাতের ভীষণ চাপ সরাতে পারলুম না। চীৎকার করতে গেলুম, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না। অসহ্য যন্ত্রণায় আমার দম বন্ধ হয়ে এল, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে আর আমি শুয়ে আছি সেই বাড়িরই একটি মেয়ের কোলে মাথা রেখে। একটু পরে জানতে পারলুম—আমার যথাসর্বস্ব চুরি গেছে। খোলা পড়ে রয়েছে সব বাক্স, তোরঙ্গ আর আলমারি। আমার সমস্ত জমানো টাকা, সোনা-জড়োয়ার সব গয়না, দামী কাপড়-জামা কিছুই আর নেই। একদিনেই আমি সর্বস্বান্ত।

কিন্তু সেই ভাঙা ভাগ্য আর কেন জোড়া লাগল না, কি করে তিনি ধাপে ধাপে নেমে এসে একেবারে পথে দাঁড়ালেন—তার ধারাবাহিক বিবরণ যাদুমণি দেননি, নগেন্দ্রনাথও সেই সব মর্মন্তুদ কথা জানতে চাননি। ভাগ্যের চাকায় ঘূর্ণমান হয়ে একেবারে ছিট্‌কে পড়েছেন তলদেশে। আর কি জানবার আছে? এমন প্রসিদ্ধা কলাবতী গায়িকা এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়; সহায়-সম্বলহীন। জরার আক্রমণে পীড়িত দেহ, দুরারোগ্য হাঁফানি রোগ সেখানে বাসা বেঁধেছে।...

যাদুমণির বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে নগেন্দ্রনাথ সেদিন স্থির করলেন যে, শুধু সাময়িক সাহায্য দান নয়, তাঁকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন! নচেৎ তাঁর কোনো উপকার হবে না। তিনি উদ্‌যোগী হয়ে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় সেই ব্যবস্থা করতে তৎপর হলেন। যাদুমণি যেন আত্মনির্ভর হতে পারেন সঙ্গীত-চর্চার সাহায্যে।

পূর্ব-জীবনের মতো সঙ্গীত-চর্চা অবশ্য এখন আর তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। সে শক্তি-সামর্থ্য আর নেই এই বৃদ্ধ বয়সে। মুজরো নিয়ে নিয়মিত আসরে গান করা এখন আর তাঁর ক্ষমতা হবে না। তা ছাড়া, সে নাম-ডাকও আর নেই। আগেকার আমলের পৃষ্ঠপোষকদের অনেককেই আর পাওয়া যাবে না। গায়িকা এই ক্ষেত্র থেকে বহুদিন বিদায় নেওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন আর তা সেভাবে পূরণ হবার উপায় নেই। এই সব কথা চিন্তা করলেন নগেন্দ্রনাথ;

শুধু এক পথ আছে—সঙ্গীত-শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু তারও পেশা হিসাবে

নানা অসুবিধা। সেকালের সঙ্গীতক্ষেত্রে বেশী শিক্ষার্থী পাওয়া যেত না, কারণ এ বিদ্যার চর্চা ব্যাপক ছিল না। তা ছাড়া এখানেও থাকে নামের বা প্রসিদ্ধির প্রশ্ন। যাদুমণিকে এখন আর চিনবে ক'জন? তিনি যে কত বড় গুণী এ খবর কে রাখে?

তবু নগেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করতে লাগলেন। হয়ত ভাবলেন, যাদুমণির জীবনযাত্রার প্রয়োজনে এই বাবদ যা ঘাটতি পড়বে তিনিই তা পূরণ করে দেবেন। আর গায়িকার জীবনে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, জীবনযাত্রার আদর্শ এমন বদলেছে যে তাঁর প্রয়োজনও এখন নিতান্ত অল্প।

এই সব বিবেচনা করে এবং অন্য উপায় রহিত হয়ে তিনি যাদুমণির জন্যে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পত্তন করলেন। যে তিনতলা বাড়িটির নীচের তলায় তিনি ক'জন বন্ধুর সঙ্গে প্রেস করেছিলেন, তারই দোতলায় স্থাপিত হল এই সঙ্গীত বিদ্যালয়—'সঙ্গীত পরিষদ্ বিদ্যালয়'। স্কুলের ওপরের তলায় যাদুমণির বাসের ঘর নির্দিষ্ট হল।

সঙ্গীত পরিষদ্‌কে আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচালনার জন্যে একটি রীতিমতো সমিতিও গঠন করা হয়। এক বছরের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে দেখা যায়-- সম্মানিত সভাপতি: মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। সভাপতি: মতিলাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা)। সম্পাদক: গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, এম. এ. বি. এল. এফ. আর. ই. এস. (লণ্ডন)। তত্ত্বাবধায়ক: নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বিদ্যালয়টির কাজ আরম্ভ হয়। বলরাম দে স্ট্রীটে (এখন যে অংশের নাম ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট), ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী মহাশয়ের পৈত্রিক বাড়ির বিপরীত দিকে (তখনকার ৬৭।৯ সংখ্যক বাড়িতে) ছিল এই সঙ্গীত পরিষদ্ এবং যাদুমণির তৎকালীন বাসস্থান।

প্রধানতঃ এখানে তিনিই সঙ্গীত-শিক্ষা দেবেন স্থির হল। তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণধন ভট্টাচার্যকেও নগেন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ করে আনলেন শিক্ষকরূপে। কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য সেকালের একজন কৃতী ধ্রুপদ-গায়ক ছিলেন। বাংলা দেশে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের আদি আচার্য গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য (পাথুরিয়াঘাটার) হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বিশেষ তাঁর পুত্র দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে কৃষ্ণধন 'রাগ পরিচয়' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ভৈরব, ভৈরবী, গুর্জার, তোড়ি, রামকেলি

ও বরাটির স্বরলিপি সমেত রূপ পরিচয় দিয়ে। ধ্রুপদ শেখাবার জন্যে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠানেরও পত্তন করেছিলেন যা তাঁর পুত্র ধ্রুপদী উদয়ভূষণ ভট্টাচার্য আজো বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সে যা হোক, সঙ্গীত পরিষদের এই বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করে যাদুমণির সম্পূর্ণ নতুন জীবন আরম্ভ হল। এ যেন আর এক যাদুমণি। পূর্ব জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সঙ্গীত ভিন্ন। যৌবনকালের ঐশ্বর্য-বিলাস এবং পরবর্তী জীবনের নিঃস্ব দৈন্য দুই এখানে অনুপস্থিত। এখানে অনাড়ম্বর হলেও সুস্থ গৃহস্থের স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার ধারা। বহুদর্শী পরিণত বয়সের অভিযোগহীন প্রশান্তি। শান্ত মনে তিনি ভাগ্যের সব রকম দান মেনে নেবার মতো করে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। শরীরও এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ।

মানস পরিবর্তন অলক্ষ্য। কিন্তু যা দৃষ্টির গোচর সেখানেও কম পরিবর্তিত হননি যাদুমণি। যোগিনীর মতন নিরাভরণ বেশবাস। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে সাদা কাপড়। হরিণচর্মের আসন। সেই আসনে বসেই ছাত্রদের সঙ্গীত-শিক্ষা দেন।

আট-দশটি ছাত্র আসেন বিদ্যালয়ে। সকলেই নিতান্ত তরুণ বয়সী—আঠারো. উনিশ, কুড়ি বছরের সব ভদ্রসন্তান। কেউ কেউ তার মধ্যে কলেজের ছাত্র। সঙ্গীতশিক্ষার আন্তরিক আকর্ষণে এখানে এসে ভর্তি হয়েছেন। প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধা যাদুমণি শুধু সঙ্গীত-গুণে নয়, সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন বিনীত স্বভাবে এবং সস্নেহ, সুশীল ব্যবহারে। সঙ্গীতের পাঠ নিতে যখন তাঁরা আসেন, সন্তানের মতো স্নেহময় ব্যবহার করেন তাঁদের সঙ্গে, ধৈর্য ধরে শেখান। ছাত্রদের বেতন অল্প দিতে হয়, কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়নি কোনো দিন।

এমনি ভাবে যাদুমণির সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের কাজ চলতে লাগল। আচার আচরণে কথাবার্তায় জীবনের পূর্ব ইতিহাসের কোনো চিহ্ন রইল না তাঁর মধ্যে।

সঙ্গীত বিষয়ে শুধু শিক্ষিকারূপেই তখন তাঁর যে একমাত্র পরিচয়, তা অবশ্য নয়। তাঁর শিল্পী-সত্তা তখনও অন্তর্ধান করেনি, যদিও দৃপ্ত মধ্যাহ্নের শেষে দেখা দিয়েছে অপরাহ্নের অস্তরাগের আভাস। 'তৈয়ারী' তখন আর নেই, থাকবার কথাও নয়। তবে শিল্পত্ব আছে, মাধুর্য আছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গীতের অনুভব।

সঙ্গীত-কণ্ঠ ঝিম্, নিস্তেজ হয়ে এসেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম অলঙ্করণ, সুর ও কারিগরি আছে তখনও। প্রায় প্রতি রবিবার বিদ্যালয়েই তাঁর গানের আসর বসে। ছাত্ররা ভিন্ন কিছু কিছু বাইরের শ্রোতা আসেন, কলকাতার কোনো কোনো বিখ্যাত গায়কও মাঝে মাঝে গান শোনান আমন্ত্রিত হয়ে। যাদুমণির গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজান কার্তিকবাবু। খেয়ালে বিশেষ সাধনা ছিল, তাই খেয়ালই বেশি গান। বহু রাগেই তাঁর অধিকার ছিল, সেসব রাগে গাইতেনও। কিন্তু তাঁর বেশি প্রিয় ছিল—মালকোষ, দরবারি, কানাড়া, ভৈরোঁ, বেহাগ, ভৈরবী, বারোঁয়া, ইমন ইত্যাদি ক'টি।

যদিও বহুদিন হল সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, অনেক দিন থেকে কোনো আসরে আর তাঁর নাম শোনা যেত না, সঙ্গীত-সমাজের অনেকেই তাঁর কথা এক রকম ভুলে গিয়েছিল—তবু তাঁর এই নতুন করে ফিরে আসার সংবাদ একেবারে অগোচর বা উপেক্ষিত রইল না! মুখে মুখে বাইরের কোনো কোনো সঙ্গীত-প্রিয় মহল জানতে পারলে যে, যাদুমণি এই গানের স্কুলে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাঁর আসর হয় এখানে। বাইরের কোনো আসরে সাধারণত তাঁর গান হয় না বটে, কিন্তু তিনি এখনও গান করেন, গলা এখনও আছে।

আগেকার আমলের তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং গুণগ্রাহীদের মধ্যেও কেউ কেউ সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর ফিরে আসবার কথা শুনলেন এবং তাঁর গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এমনি ক'টি বিশেষ আসরে যাদুমণি গান গাইলেন বিদ্যালয়ের বাইরে। সেই উপলক্ষ্যে সঙ্গীতজ্ঞ মহলে আবার নতুন করে অনেকদিন পরে তাঁর গুণপনা প্রকাশ পেলে।

এমনি একটি আসর হল দ্বারবঙ্গ-রাজ রামেশ্বর সিং-এর জন্যে। দ্বারবঙ্গ-রাজ যাদুমণির পুরনো পৃষ্ঠপোষক। যতগুলি রাজদরবার সেকালে সঙ্গীত-প্রেমী ও সঙ্গীতের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিখ্যাত ছিল, দ্বারবঙ্গ তাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট। দ্বারবঙ্গ-রাজাদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন লক্ষ্মীশ্বর সিং। তাঁর আমলেই দ্বারবঙ্গ দরবার সঙ্গীতের দরবারে পরিণত হয়। তিনি ভারতের বহু গুণীকে বিভিন্ন সময়ে দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন, তাঁদের বেশ কয়েকজনকে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত রেখেছেন প্রতিদিন সঙ্গীত আস্বাদ করবার জন্যে। সরোদী মুরাদ আলি, সরোদী আবদুল্লা খাঁ, সুরচয়ন ও সরোদ-বাদক আসগর আলী, গায়িকা জোহরা বাঈ, জানকী বাঈ, গায়ক মৌলা বক্স, নর্তকী বেনজীর প্রভৃতি অনেক গুণী এখানকার

দরবারে নিযুক্ত থেকে দ্বারবঙ্গে সঙ্গীতের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের পর দ্বারবঙ্গ রাজ্যের অধিকারী হন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর সিং। মহারাজা রামেশ্বর জ্যেষ্ঠের মতো সঙ্গীতের অত বড় পৃষ্ঠপোষক না হলেও সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং রাজ-দরবারে আগেকার আমলের সঙ্গীত চর্চার ধারা বজায় রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রামেশ্বর সিং স্যার আশুতোষের উদ্‌যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ আনুকূল্য করে-ছিলেন, যার নিদর্শন 'দ্বারভাঙ্গা' বিল্ডিং।

রামেশ্বরের রাজ্যকালেই যাদুমণি আমন্ত্রিত হয়ে এক সময়ে দ্বারবঙ্গে গান গাইতে গিয়েছিলেন। যাদুমণির তা পূর্ব জীবনের কথা; সেই মধ্য জীবনে, যখন তিনি সঙ্গীতখ্যাতির শীর্ষে আসীনা। মহারাজা রামেশ্বর তখন ইন্দ্র-পূজার বার্ষিক অনুষ্ঠান-সভায় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে যাদুমণিকে দ্বারবঙ্গে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানকার এই ইন্দ্রপূজার প্রবর্তকও রামেশ্বর। দ্বারবঙ্গে পুরানো রাজবাড়ি 'পুরাণি দেউড়ি'-র (রাজ্যের নতুন প্রাসাদ 'আনন্দ বাগ প্যালেস' লক্ষ্মীশ্বরের আমলে তৈরি) মন্দির প্রাঙ্গণে সেবার ইন্দ্রপূজা উপলক্ষে যাদুমণি গান গেয়েছিলেন।

রামেশ্বরের সে কথা মনে ছিল এতদিন পরেও। তাই এবার কলকাতায় এসে যখন শুনলেন, যাদুমণি এখনও গানের জগৎ থেকে বিদায় নেননি, তিনি তাঁর গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই সূত্রে যাদুমণির গানের আসর বসল উত্তর কলকাতার ভারত সঙ্গীত সমাজে।

এই আসর উপলক্ষে তাঁর বিগত দিনের পরিবেশ অকাল বসন্তের মতো একবার ফিরে এল। কিংবা তিনি ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। সেই রীতিমতো দরবারী আসরের স্মৃতি।

সেদিন ভারত সঙ্গীত সমাজে মহারাজা রামেশ্বরকে গান শোনাবার জন্যে যাদুমণি একটু বিশেষ রকম প্রস্তুত হয়ে যান। পূর্ব জীবনে তিনি যেমন রাজা-রাজড়ার সঙ্গীত দরবারে যেতেন পেশাদার নটীর বেশে অর্থাৎ দরবারি পোশাকে, এই আসরেও তেমনিভাবে উপস্থিত হতে চাইলেন তিনি।

ভারত সঙ্গীত সমাজ যদিও দরবার নয়, কিন্তু মহারাজা রামেশ্বরের যোগদানের ফলে তা দরবারী মর্যাদা লাভ করেছে, যাদুমণির এই ধারণা। আগেকার আমলে নটী যেমন অভ্যস্ত ছিলেন দরবারি আদব-কায়দা, পোশাক-আশাকে, সে সবই তাঁর মনে পড়ল। এ ধরনের আসরে সাধারণ-

ভাবে অংশ নেবার কথা যেন ভাবতেই পারেন না তিনি, যদিও সে বয়স নেই, জীবনের সে জৌলুস চলে গেছে, সে মনও আজ অন্তর্হিত। তবু তাঁর দরবারি আদব-কায়দার কথা মনে হল শুধু এই কারণে যে—এ ধরনের আসরের যা প্রথা তা ত্যাগ করে তিনি সাধারণ বেশভূষায় মহারাজার সামনে গান গাইতে পারেন না। যে আসরের যা রীতি-নীতি এবং যে রীতিতে আগে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত ছিলেন এখানেও তিনি তাই মানলেন।

রামেশ্বর আসরে উপস্থিত হবার অনেক আগেই তিনি ভারত সঙ্গীত সমাজে এলেন, বিদ্যালয়ের কয়েকজনের সঙ্গে। সেখানে যেমন কাপড় পরে থাকতেন এখনও পরনে তাই ছিল, কিন্তু তাঁর একটি বাক্স বিদ্যালয়ের পরিচারককে নিয়ে আসতে হয়েছিল। সঙ্গীত পরিষদের যে ছাত্ররা সেদিন এসেছিলেন তাঁরা তখন জানতেন না বাক্সটির মধ্যেকার জিনিসপত্র। তার মধ্যে ছিল যাদুমণির বিগত আমলের সামান্য কিছু পোশাক, যা সেই ভয়ানক রাত্রে কোনোক্রমে বেঁচে যায়।

এখন আসর বসবার কিছু আগে তিনি সেই সব সরঞ্জাম নিয়ে পাশের ঘরে সাজতে গেলেন।

তারপর তাঁর ছাত্রেরা তাঁকে দেখতে পেলেন এক অভিনব সাজে, যেমন তাঁরা আগে তাঁকে দেখেননি কখনও। এ তাঁর অন্য আর এক রূপ, সেই পূর্ব জীবনের একটি অবশেষ কিংবা স্মারক। অবশ্য তাঁর মুখভাবে বা ভঙ্গিতে প্রগল্‌ভার কোন চাপল্য নেই। কিন্তু পেশোয়াজ পায়জামা আর ওড়নায়, মুখে ঠোঁটে রঙের প্রলেপে, চোখে সুর্মা এবং কপালে কপোলে অভ্রচূর্ণের অলঙ্করণে সেই বৃদ্ধাকে দেখে ছাত্ররা সরল মনে হাসতে লাগলেন।

যাদুমণি তাঁদের হাসি দেখে ক্রোধ প্রকাশ করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তারা এ সব রীতি কিছুই জানে না।। তাই হাসছে। এ আদব-কায়দা। এর সঙ্গে বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই—এই তাঁর ধারণা। দরবারি কেতা পালন করতে তাঁর দস্তুরমতো আগ্রহ দেখা গেল।

ওদিকে আসরে রামেশ্বর সিং উপস্থিত হয়েছেন, খবর এল। তখন আসরে প্রবেশ করতে এলেন যাদুমণি।

হল-এর দরজা থেকে মহারাজাকে নিখুঁত কুর্নিশ করতে করতে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে তিনি এসে আসরে বসলেন। সম্মানিত অতিথিকে দেহ আনত করে সম্ভ্রম জানিয়ে নটী আসীনা হলেন আদব-কায়দার সঙ্গে।

তার পর কয়েকটি শিষ্টাচার বাক্যের পর তাঁর গান আরম্ভ হল।

পর পর চারখানি গান গাইলেন যাদুমণি দু'টি খেয়াল ও দু'টি ঠুংরি। ষাট বছরের বৃদ্ধার কণ্ঠে আগেকার সেই সতেজ স্বরলীলা আর না থাকলেও এখনও যা আছে তার মূল্যও অল্প নয়। প্রাণের অনুভবের সঙ্গে রাগ-রূপের যথাযথ মহিমা বিস্তার করে তিনি খেয়াল অঙ্গ গাইতে লাগলেন।

প্রথমে ধরেছিলেন দরবারি কানাড়া—

এ্যয়সি চাঁদিনী রাত…

গানের বন্দেশ অতি জমাটি। দরবারির গভীর ভাবের সুরে আসর ভরিয়ে দিয়ে তিনি প্রথম গান শেষ করলেন। তার পর ধরলেন তাঁর প্রিয় ইমন, গুরুপ্রসাদ মিশ্রের ঘরের সেই বিখ্যাত গানটি।

গহেরি গহেরি নদীয়া ভরি আয়ি

চলত পবন পুরবৈয়া নেইয়া মোরি।…

এই গানে তিনি পূর্ব জীবনে অনেক আসর মাত করেছিলেন, এই শেষ বয়সেও তার ব্যতিক্রম হল না।

তার পর ঠুংরি আরম্ভ করলেন—

হামে ছোড চলে বেণীমাধো,

তব সে মোহত রহি মন মে।

হৃদয়স্পর্শী বিরহ-গীতি। সমঝদার শ্রোতাদের মনে আকুল আবেগ জাগিয়ে তিনি দরদ দিয়ে গাইতে লাগলেন। বেণীমাধব বা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধিকার প্রাণের আকৃতি সুরের কাজ মোচড়েই যে প্রকাশ করলেন গায়িকা।

এই গানের পর যাদুমণি আরও একখানি মনোমুগ্ধকর ঠুংরি গাইলেন—

পিয়াকো মিলনে ম্যয় কয়সে আয়সে ওয়ে

দ্বারবঙ্গরাজ সেদিন তাঁর গান শুনে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন এবং ভাল মুজরোও দেন।

সে-সময়ে আর একজন মহান গুণগ্রাহীরও সাক্ষাৎ পান যাদুমণি। তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনিও যাদুমণির পূর্বজীবনে তাঁর গান শোনেন এবং তাঁকেও সঙ্গীত-শিল্পীর একজন পৃষ্ঠপোষকরূপে গণ্য করা যায়। যাদুমণির বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র বিশ্বপতি চৌধুরী তখন চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকায় লেখার সুবাদে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতেন। চিত্তরঞ্জন একদিন বিশ্বপতিবাবুর মুখে শোনেন যে যাদুমণি নামে একজন প্রসিদ্ধা গায়িকা

এখন সঙ্গীত পরিষদে আছেন এবং গান শেখান সেখানে।

চিত্তরঞ্জন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি সেই যাদুমণি ?

আগেকার আমলের গায়িকা যাদুমণিকে তিনি বিশেষ করে জানতেন। চিত্তরঞ্জন রচিত বাংলা গানও গেয়েছেন যাদুমণি। সে শিল্পীকে সঙ্গীতপ্রেমী চিত্তরঞ্জন কেমন করে ভুলবেন ?

তিনি একদিন সঙ্গীত পরিষদে এলেন যাদুমণির সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর গান শুনতে। চিত্তরঞ্জনকে তিনি সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানালেন।

কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, হরিণ চর্মের আসনে বসে প্রবীণা গায়িকা। তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তার পর চিত্তরঞ্জন বললেন—এবার গান হোক।

যাদুমণি জিজ্ঞেস করলেন—তা হ'লে 'কোন্ তারেতে' দিয়ে আরম্ভ করি ?

চিত্তরঞ্জন জানালেন—সে আপনার ইচ্ছে।

'কোন্ তারেতে' অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনেরই রচিত 'কোন্ তারেতে বাজবে বল ওগো প্রাণের বাজনদার।' গানটি রচয়িতার বিশেষ প্রিয় এবং গায়িকাও তাঁকে পূর্বে এটি শুনিয়েছিলেন। যাদুমণি এবারও এটি আদ্যোপান্ত গাইলেন।

গানখানি শেষ করে যাদুমণি রাগ সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। প্রথমে গাইলেন দরবারি কানাড়া, শেষে একটি ঠুংরি। দেশবন্ধু মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। সেদিনের মতন আসর শেষ হল তারপর।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর জীবনের নানা কথায় যাদুমণি সম্পর্কিত প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। সে সব কোন্ সময়ের—অর্থাৎ যাদুমণির মধ্য কিংবা শেষ ঘটনা জীবনের তা সঠিক জানা না গেলেও এখানে উল্লেখ করবার যোগ্য। প্রথম তথ্যটি হল—যাদুমণি একটি সভায় গান গেয়েছিলেন এবং সেখানে সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন। দ্বিতীয় সংবাদ—চিত্তরঞ্জনের গৃহে একবার যাদুমণির সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। সেখানে তিনি স্বরচিত 'তুমি যে আমার গলার মালা, তুমি যে আমার ফুলের কাঁটা' গানখানি গায়িকাকে বিভিন্ন সুরে গাইতে অনুরোধ করেন। যাদুমণিও ভিন্ন ভিন্ন সুরে গানটি গেয়ে সুরের ওপর নিজের অসামান্য অধিকার দেখান এবং সন্তুষ্ট করেন চিত্তরঞ্জনকে।

সঙ্গীত-জীবনের এই শেষ পর্যায়ে যাদুমণি আর একটি আসরে গান গেয়েছিলেন, যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানের তিনি উদ্বোধন করেছিলেন একটি ধ্রুপদ গান গেয়ে এবং সমাপ্তি সঙ্গীতও তাঁরই গীত। তা ছাড়া

রবীন্দ্রনাথের তিনটি গানও যাদুমণি এ আসরে গেয়েছিলেন, কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে নয়। এ বিষয়ে কিছু বিশেষ কথা আছে এবং তা এই আসরের সংবাদ প্রকাশের পরে উল্লেখ করা হবে।

অনুষ্ঠানটির বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় (শনিবার, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে) প্রকাশিত হয়—

The Sangit Parishad/A musical demonstration/Hindu Music and Sir Rabindranath :

The musical demonstration given by the Parishad by way of a protest against the latest utterances of Sir Rabindranath Tagore on Indian Music came off last Friday evening at the Presidency Theatre. On the motion of Rai Jatindranath Chowdhury, Babu Motilal Ghosh was voted to the chair.

The demonstration opened with two Dhrupad songs by Sm. Jadumani and Prof. Jogindra Kishore Banerji of Parishad Vidyalava. Babu Krishna Chandra Ghosh then read his paper which was explained by practical demonstrations···another song by the Lady Vice-Principal (যাদুমণি—লেখক) of the Vidyalava...

রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামে ভারতীয় সঙ্গীতের যে সমালোচনা করেন, তার প্রতিবাদে সঙ্গীত পরিষদ্ উক্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন। সভার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক, শুধু একথা উল্লেখ করা যায় যে, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত-চিন্তামণি মূল প্রতিবাদ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত গান তাঁর ছন্দানুবর্তী শাস্ত্রসিদ্ধ তাল-লয়ে গীত হয় শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে, ভারতীয় সঙ্গীতের তাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরুদ্ধে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের যে পাঁচটি গান সভায় গাওয়া হয় তার তিনটি গেয়েছিলেন যাদুমণি—'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে' (বাগেশ্রী। তাল : কীর্তি), 'বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে' (পূরবী। তাল : প্রতিমাভঙ্গ) এবং 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে' (কেদারা। তাল : বসন্ত)।

যাদুমণি যে সুরে ও তালে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গান সেই সভায়

গেয়েছিলেন সেই তিনটি গানের স্বরলিপি ও ছন্দের সঙ্কেত পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত-চিন্তামণি লিখিত ও সভায় পঠিত প্রবন্ধটি নিয়েই সেই পুস্তিকাটি—'হিন্দু সঙ্গীত ও কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ' অনুষ্ঠানটির ছয় মাস পরে প্রকাশিত (২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫) হয় সেই পুস্তিকায় উক্ত লেখক যাদুমণির উদ্দেশে ভূমিকায় নিবেদন করেছেন—

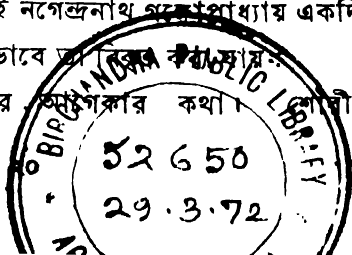
'আপনার সুমার্জিত কণ্ঠ ও অভ্রান্ত শিক্ষানৈপুণ্যের সাহায্য না পাইলে আমি এই প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইতাম না। সুরতালাদি যে সমস্ত গুরুতর বিষয় এতন্মধ্যে আলোচিত হইয়াছে, তাহা আপনারই অসামান্য শিল্পচাতুর্য-প্রসাদে সম্ভবপর হইয়াছে। আপনার সর্ববিধ মুদ্রাদোষ-বিবর্জিত সুন্দর সুমিষ্ট আলাপ-রীতি দর্শন ও শ্রবণ করিলে, ওস্তাদ ভীতিরূপ পদার্থটি আর চীনদেশীয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেবল তাহাই নহে, আপনার অসামান্য কারুকার্য খচিত বিবিধ অলঙ্কার-বিমণ্ডিত যাবতীয় রাগরাগিণীর গায়নাদি শ্রবণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয় এবং এই বিশাল বিশ্ব যে ছন্দ ও সঙ্গীতময়, তাহা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।'...

এই আসরের বিবরণ যা পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে, এখানে যাদুমণির একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতে তালের গুরুত্ব কতখানি এবং তা যে বিজ্ঞানসম্মত, এ কথা প্রদর্শন করবার জন্যে তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন এই সভায়। শুধু শিল্পী নয়, এখানে তাঁকে তাত্ত্বিক রূপেও পাওয়া যায়।

জীবন সায়াহ্নে এই বোধ হয় তাঁর শেষ বড় আসর। তার আট ন' মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সে কথা বলবার আগে আরও কিছু জানবার আছে তাঁর বিষয়ে। বিশেষ করে তাঁর প্রথম জীবনের একেবারে বালিকা বয়সের কথা। তাঁর প্রথম গান শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার কথা, যা প্রায় নাটকীয় বলা চলে। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-প্রেম ও মহানুভবতার একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে এই বৃত্তান্তে।

ঘটনাটির কথা তাঁর নিজের মুখেই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন শুনেছিলেন, স্মৃতিচারণের সময়। এইভাবে তা বিবৃত করা যায়:

বর্ণনার সময়ের প্রায় ৫৫ বছর আগেকার কথা। শৌরীন্দ্রমোহন



ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা ভবন। তার দোতলার জলসাঘরে তখন গানের আসর বসেছে। ধ্রুপদের আসর। বেতিয়া ঘরানার খ্যাতিমান গায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্র ধ্রুপদ গাইছেন, পাখোয়াজে সঙ্গত হচ্ছে। শৌরীন্দ্রমোহন রয়েছেন আরও কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতাদের সঙ্গে।

গান শুনতে শুনতে হল্-এর দরজার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তে শৌরীন্দ্র-মোহন দেখলেন—দরজার সামনে পাপোশের ওপর একটা ছোট মেয়ে বসে গান শুনছে। লক্ষ্য করে দেখলেন, চেনা মনে হল মেয়েটাকে। বাড়িতেই অনেকবার দেখেছেন। বাড়িতে কাজ করে অমুক, তারই মেয়ে শুনেছিলেন। ৯-১০ বছর বয়স হবে হয়ত। তাকে আসরের সামনের দরজায় বসে থাকতে দেখে শৌরীন্দ্রমোহন একজন পরিচারককে দিয়ে তাকে সরে যেতে বললেন। মেয়েটি চলে গেলে আবার গানে নিবিষ্ট হলেন শৌরীন্দ্রমোহন। খানিক পরে আবার দরজার দিকে চোখ পড়ায় দেখলেন, মেয়েটি আবার এসে পাপোশের ওপর বসেছে এবং এক মনে গান শুনছে। একদৃষ্টে গায়কের দিকে চেয়ে, অন্য কোনো দিকে তার খেয়াল নেই, স্পষ্টই বোঝা গেল। শৌরীন্দ্রমোহন আশ্চর্য বোধ করলেন, এবার আর তাকে তাড়িয়ে দিলেন না। ধ্রুপদ গান একটা এই বয়সের মেয়ে এমন তন্ময় হয়ে শুনছে, এ কথা উপলব্ধি করে চমৎকৃত হলেন তিনি।

সে দিন আসরে যতক্ষণ গান হল, তিনি লক্ষ্য করলেন, সে তেমনি স্থির হয়ে বসে শেষ পর্যন্ত শুনলে।

আসর ভেঙ্গে যাবার পর শৌরীন্দ্রমোহন তাকে ডেকে আনালেন। সে তখন ভয়ে জড়সড়। তিনি তাকে অভয় দিয়ে জানতে চাইলেন যে তার কি গান শিখতে ইচ্ছা করে? যদি তিনি ঐ ওস্তাদের কাছে শেখবার ব্যবস্থা করে দেন, সে শিখবে?

সে রাজি হল। শৌরীন্দ্রমোহন তারপর তার গান শেখবার ভার দিলেন গুরুপ্রসাদ মিশ্রকে। মিশ্রজী দীর্ঘকাল শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-সভায় নিযুক্ত গায়ক ছিলেন এবং তাঁর কাছে মেয়েটি বহুদিন ধরে রীতিমতো সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ পায়।

এমনি করে শৌরীন্দ্রমোহনের আনুকূল্যে সেদিনকার যে পরিচয়হীন মেয়েটি পশ্চিমা কলাবন্তের অধীনে গান শিখতে আরম্ভ করলে, সে-ই হল ভাবীকালের সুপরিচিতা গায়িকা যাদুমণি। কিন্তু মেয়েটি কিভাবে পেশাদার

নটীতে পরিণত হল, থিয়েটারে যোগ দিলে, সমাজ-বহির্ভূত জীবনে চলে গেল—তার ক্রম-পর্যায়ের বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। যেমন জানা যায় না তার জন্ম পরিচয়।…

যাদুমণির জীবনের শেষের অধ্যায় বর্ণনা করবার আগে তাঁর শিষ্য-প্রসঙ্গের কথা কিছু আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, সঙ্গীত পরিষদে তাঁর ৮।১০ জন ছাত্র ছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম হল—অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, গঙ্গাধর ঘোষ চৌধুরী, ইন্দুভূষণ প্রভৃতি। কিন্তু তাঁদের কেউই সঙ্গীত জগতে কৃতী হননি। সে জন্যে, বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রও রীতিমতো তৈরী হল না বলে আক্ষেপ করতেন যাদুমণি।

কিন্তু তাঁর মধ্যজীবনে এমন একজন ছাত্র তাঁর কাছে টপ্পা ও খেয়াল শিখেছিলেন, যিনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী। তিনি হলেন অন্ধগায়ক সাতকড়ি মালাকর। প্রথম জীবনে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য সাতকড়ি মালাকর গুরুর শেষ বয়সে তাঁরই নির্দেশে যাদুমণির কাছে শিখতে যান। যাদুমণি তখন শোভাবাজারের সেই বিলাসী ধনীর আশ্রয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে গানের মধ্যে সাতকড়িবাবু চার মাত্রা আট মাত্রার টুকরো তানে যে মুন্সীয়ানা দেখাতেন, তা—তিনি বলতেন—যাদুমণির কাছে শেখা। সাতকড়ি মালাকরের সঙ্গীতজীবন যাদুমণির শিষ্য-কৃতি ও শিক্ষাদানের একটি নিদর্শন-রূপে স্মরণ করা যায়। 'দৃষ্টিহীনের সুরজগৎ' নামে পরের একটি অধ্যায়ে মালাকর মহাশয়ের সঙ্গীতজীবনের পরিচয় দেওয়া হবে।

যাদুমণির শেষ জীবনের ছাত্রদের মধ্যে অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ধ্রুপদ ও খেয়াল চর্চা করতেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁর সঙ্গীতজীবন পরিণতি লাভ করেনি। আর একজন ছাত্র বিশ্বপতি চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন উত্তর জীবনে। যাদুমণির অন্তিম পর্বে এঁরা তাঁকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন এবং তিনি যে যথার্থ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন তার বহু পরিচয় পেয়েছিলেন।

দিনের পর দিন যাদুমণির সঙ্গীত শিক্ষা দেবার সময় তাঁরা দেখেছেন নানা রাগে তাঁর অসাধারণ অধিকার, তাঁর বিস্তার-নৈপুণ্য, তাঁর টপ্পার দানার অবলীলাক্রম, তাঁর ঠুংরির ভাবসম্পদ ও মাধুর্য। রবিবারের সান্ধ্য আসরে অন্যান্য গায়কদের সামনে এই বৃদ্ধার সঙ্গীতকৃতির যে পরিচয় পেতেন, বয়সের হিসাবে সে গুণপণা কদাচিৎ প্রকাশ পায়। গানের ক্ষমতা তখনও

কতখানি আছে, তার প্রমাণ পান ভারত-সঙ্গীত সমাজে মহারাজা রামেশ্বর সিং-এর সেই আসরে। চিত্তরঞ্জনকে তাঁরই রচিত কাব্য-সঙ্গীত শুনিয়ে যে মুগ্ধ করেন, তা যাদুমণির শিল্পী-সত্তার আর এক প্রকাশ। গায়িকার কাব্যপ্রিয় ভাবুক-মনের প্রকাশ।

ঘরোয়াভাবে যাদুমণির শিল্পীমনের নানা বিচিত্র রূপায়ণ তাঁরা মাঝে মাঝে দেখতেন।

ছাত্রদের অনুরোধে একদিন নৃত্য প্রসঙ্গে 'ভাও বাৎলানো' (ভাব প্রদর্শন) দেখিয়েছিলেন—হয়ত তা জগদ্দীপ মিশ্রের শিক্ষার ফল। হাতের মুদ্রায়, মুখ-চোখের ভাব প্রকাশে রাধার কৃষ্ণ-বিরহের আকুল ভাব 'হামে ছোড়ে বেণী মাধো' গানটির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতেন। বলতেন, 'আমি বসে বসেই দেখাব, চলে চলে দেখাতে পারব না।' (আগেকার আসরে সব নামকরা বাঈজীরাই, যেমন গহর জান, নূরজাহান, আগ্রার মাল্‌কা জান প্রভৃতিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আসরে ঘুরে-ফিরে ভাও বাৎলাবার সঙ্গে ঠুংরি গাইতেন) যাদুমণি তাঁর সেই মৃগচর্মের আসনে বসে রীতিমতো শিক্ষাপটুভাবে চোখের তারা ঘুরিয়ে, অর্থাৎ ভ্রূবিলাস সহযোগে মুখে ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তাঁর পূর্ব জীবনে অধীত একটি নৃত্য-শিল্পের আঙ্গিকের পরিচয় দিতেন।

ঘরে এক একদিন কীর্তনাঙ্গে গান গেয়ে শোনাতেন ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে। সে আর এক রকমের রসোত্তীর্ণ সঙ্গীত। নিস্তব্ধ নিশীথিনীতে তিনি গোবিন্দদাসের পদ গাইছেন—

মাধব কি কহব দৈব বিপাক...

তাঁর কণ্ঠে যেন কথা ও সুরের ইন্দ্রজাল রচনা আরম্ভ হয়। বাইরে বসন্তের মায়ারজনী জ্যোৎস্নাধারায় আকুল। ঘরের মধ্যে ভাব-মুগ্ধা গায়িকা গেয়ে চলেছেন—

পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির ত্যজি যব পদ চারি আওলু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই ন পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ।

একে ফুলকামিনী   তাহে কুহুযামিনী

ঘোর গহন অতি দূর।

আর তাহে জলধর   বরখিয়ে ঝর ঝর

হাম যাওব কোন্ পুর॥

একে পদ পঙ্কজ   পঙ্কে বিভূষিত

কণ্টকে জরজর ভেল।

তুয়া দরশন আশে   কছু নাহি জানলু

চির দুখ অব দূর গেল॥

তোহারি মুরলী যব   শ্রবণে প্রবেশল

ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।

পন্থক দুখ   তৃণ করি না গণলুঁ

কহতহি গোবিন্দদাস।

সে সুরের পরশমণিতে জ্যোৎস্নামগ্ন নিথর রাত্রি যেন প্রাণ পেয়ে মুখর হত। অভিসারিকা রাধার বেদনায় যেন আবেগ বিধুর হত জ্যোৎস্নাধারা। যেন মধু-মরীচিকা জাগাত এমন জাত সঙ্গীত-শিল্পী তিনি।

তাঁর সঙ্গীতে প্রাণের স্পন্দন থাকত আর অন্তরের গভীর অনুভব। একদিন বিশ্বপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। হাতে ছিল একটি কবিতার বই—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'একতারা'। যাদুমণির সে দিন শরীর ভাল ছিল না, শুয়েছিলেন। কবিতার বই দেখে বললেন, 'একটা কবিতা পড় শুনি।' ছাত্র বইটি খুলতেই বেরুল সেই পাতাটি—

'মাঝি, ভিড়ায়োনা চলুক তরী নদীর মাঝে;—

তরী এ ঘাটেতে বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে'

তিনি শেষ পর্যন্ত কবিতাটি পড়ে শোনালেন। পড়া শেষ হতে দেখেন—শ্রোত্রীর দুচোখ অশ্রুপূর্ণ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'কি চমৎকার এই লোকটির প্রাণ!' বলে বিছানা থেকে উঠে বললেন, 'সুর দাও তো বিশ্বপতি!'

তানপুরায় সুর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যাদুমণি তন্ময় হয়ে গাইতে লাগলেন সাহানা সুরে—

ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে,

জলটি যেথা ছুঁয়েই আছে,

এখনো ওই যে ঘাটেতে
পল্লীবালার কাঁকন বাজে।
তরী সেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।
ডুবছে রবি নীল গগনে,
যদিই আঁধার হয়ে এসে,
তবু নদীর মাঝে মাঝে
তরী মোদের চলুক ভেসে।
এই গাঁয়ের ভাই নামটি শুনে,
প্রাণটি এমন করে কেনে,
ঘুম পাড়ানো কোন্ বেদনা
জেগে উঠে হৃদয় মাঝে;
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।
মৌন সাঁঝের ম্লান মাধুরী
কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁঝের দীপটি ছোট
বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে!
একটি গৃহ হেথায় কিনা
ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবি‍ি যার আজও আমার
হৃদয় কোণে সদাই রাজে।
তরী হেথা বাঁধ‌ নাকো আজকে সাঁঝে।
এই নদীরই এই ঘাটেতে
এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া.
যেত ছোট কলসিখানি
কোমল তাহার বক্ষে নিয়া।
উল্লাসে জল উথলে উঠি,
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি,
পথের মাঝে আমায় দেখে
ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে,
তটিনীর ওই শ্যামল কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজকেও সেই চিতার পরে,
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে,
আজও মধুর মুখখানি তার
দেয় যে বাধা সকল কাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।

(এখানে বলে রাখা যায় যে, কুমুদরঞ্জন কবিতারূপে রচনা করলেও গান হিসেবে এটির চলন হয়। যাদুমণি হয়ত আগে থেকেই জানতেন গানখানি। পরেও, প্রথম দুটি লাইন পরিবর্তিত হয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। রেকর্ড হয় দুবার। একবার ইন্দুবালার কণ্ঠে গান এবং দ্বিতীয়ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের ক্ল্যারিওনেটে গানের সুর।)

যাদুমণি গানটি আগাগোড়া সাহানায় গেয়ে গেলেন অতি দরদ দিয়ে। কি করুণ, কি মর্মস্পর্শী তাঁর সেই সুরের আবেশ।

তাঁর সুরের জগৎ ভাবের জগতের সঙ্গে, তাঁর আত্মা সুরের জগতের সঙ্গে এমন সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে বাঁধা ছিল যে, একটি ভাবের আলোড়নেই যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। হৃদয়স্পর্শী এই কাব্যের আবেদনে জেগে উঠল তাঁর প্রাণের সুর। তাঁর সাহানা। তাঁর স্পর্শকাতর মন গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে।...

এমনিভাবে তাঁর শিল্পীসত্তার যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় পান তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র এই দু-একজন ছাত্র, তেমনি মানুষটিকেও অত্যন্ত কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পান তাঁরা। অন্তিম পর্বে অনুতপ্ত, পাপ-ভয়ে উদ্বিগ্ন সে যেন আর এক ব্যক্তি-মানুষ এক একদিন বলতেন—'হ্যাঁ রে, মানুষ পাপ করলে পরলোকে তার শাস্তি হয়, না রে?'

—আপনি কেন পাপের কথা, শাস্তির কথা এ সব ভাবছেন?

—ভাবব না, আমি কি কম পাপ করেছি? এর চেয়ে বড় পাপ মেয়ে-মানুষের আর কি আছে? কি করে জীবন কাটিয়েছি...

এমনিভাবে স্মৃতির দংশনে কাতর হতেন। আবার কোনো কোনো দিন বলতেন—হ্যাঁ রে, আমি মরে গেলে তোরা কি রাস্তায় ফেলে দিবি, ডোমের হাতে দিবি?

—কেন এ কথা বলছেন?

—না; এমনি জিজ্ঞেস করছি। আর ক'দিনই বা বাঁচব! মরে গেলে কি আমার সৎকার হবে না? সদ্‌গতি হবে না?

আমরা আপনার সৎকার করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আপনাকে সৎকার করতে নিয়ে যাব।

—সত্যি বলছিস? কিন্তু তোরা যে বামুনের ছেলে; তোরা কি পারবি?

—নিশ্চয় পারব, আপনি কেন ভাবছেন?

—আঃ, আমায় বাঁচালি। আমি মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করচি তোরা সুখী হবি, ভগবান তোদের ভাল করবেন। আমার সৎকার যদি তোরা করিস, তোদের পাপ হবে না। —একটু থেমে বলেন—এজন্যে কোনো পাপ হবে না রে। আমি বামুনের মেয়ে। আমার বাবা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এমনি অসতর্ক মুহূর্তে এক একদিন জন্মের কথা শোনা যেত বটে; কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ জানা যেত না ও বিষয়ে।

শেষের দিন ঘনিয়ে আসছিল, সেজন্যই হয়ত এত পরলোকের চিন্তা আর অতীতের জন্যে অনুশোচনা। এক একটি ছোটো খাটো ব্যাপারও যেন অন্তিমের ইঙ্গিত দিত।...

একটি চন্দনা পাখী পুষেছিলেন। দু-একটা গানও শিখিয়েছিলেন আদরের পাখীটাকে। চন্দনা গাইত—দুখ হরা তারা নাম তোমার...। দানাগুলো অনেকটাই গলায় বেরুত তার। একদিন বিশ্বপতি চৌধুরীকে পাখীটি দিয়ে বললেন—কবে আছি, কবে নেই, এটা তুমি বাড়িতে নিয়ে রাখ।

তার কিছুদিন পরেই যাদুমণির সব যন্ত্রণার অবসান ঘটল। বয়স তখন ৬৫ বছর হবে। সঙ্গীত পরিষদ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরের কথা। (১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ)

হাঁপানির অসুখ ছিল, মাঝে মাঝেই শ্বাসকষ্ট পেতেন। তবু মৃত্যু হয়েছিল আকস্মিক। সেদিন প্রথম রাতেও গান শিখিয়েছেন ছাত্রদের। তারপর রাত্রির কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্তে চরমক্ষণ এসেছে, কেউ জানে না। পরের দিন সকালে স্নেহাস্পদ ছাত্রেরা নগেন্দ্রনাথের মুখে শুনলেন শেষের সংবাদ।

সংকারের যে আশ্বাস পেয়ে মাটির পৃথিবীর শিল্পী নিশ্চিন্ত ছিলেন, তা যথাযথ পালিত হয়েছিল।

উপরন্তু যা কখনো কল্পনা করতে পারেননি, তাও হয়েছিল। বাংলার গৌরব বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আয়োজন করা হয় তাঁর স্মৃতিসভার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যা একটি অসাধারণ ঘটনা বলা যায়। বিশ্বপতি চৌধুরি প্রমুখ উৎসাহী ছাত্রদের উদ্‌যোগে সে সভার অনুষ্ঠান হয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে। আর তেমনি উল্লেখনীয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সে সভায় সভাপতি এবং নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দুই প্রধান বক্তা।

সেখানে বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যাদুমণির স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর গায়িকা হিসেবে খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা বলেন।

অমৃতলাল জানান—গানের জন্যে কাপ্তেন বাবুদের রাস্তা থেকে একশ' টাকার নোট জুড়ি-গাড়িতে বসে তাঁর দোতালার ঘরে ছুড়ে দিতে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। নাট্যাচার্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাচনভঙ্গীতে আরও বলেন, কিন্তু যাদুমণি যে এতদিন বেঁচেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে জানতে পারলাম। আমি জানতাম তিনি অনেকদিন আগে মারা গেছেন, কারণ তাঁর কথা আর ইদানিং শুনিনি।

আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যাদুমণির সঙ্গীত-গুণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ধরনের কথা বলেন যে—আমরা মানুষকে ঘৃণা করতেও চাই না, ক্ষমা করতেও চাই না, আমরা চাই মানুষকে ভাল বাসতে।...

।। সঙ্গীতময় জীবন ।।

রানাঘাটের পাল চৌধুরী পরিবারের জলসাঘর। সেখানে সেদিন আসর বসেছে। যেমন প্রাসাদতুল্য ভবন, তেমনি সুসজ্জিত বিশাল জলসাঘর।...

শুধু ঐশ্বর্যের আড়ম্বড়ে নয়, নিয়মিত উচ্চ শ্রেণীর আসরের জন্যেও বিখ্যাত এই সঙ্গীত-সভা। সেকালের বাংলার যত ধনী-বংশ সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এই শিল্পচর্চার শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছেন, রানাঘাটের

পাল চৌধুরীরা তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট।

পশ্চিমাঞ্চলের এত খ্যাতনামা সঙ্গীত-গুণী এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন, এত সর্বভারতীয় কলাকার ও কলাবতী এ দরবারে বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত থেকেছেন যার দৃষ্টান্ত বেশি পাওয়া যায় না। বাসৎ খাঁর মতন বহুমান্য সঙ্গীত-সাধক থেকে আরম্ভ করে অনেকেই অলঙ্কৃত করেছেন পাল চৌধুরী ভবনের সঙ্গীত-সভা। সকলের নাম উল্লেখ করতে হলে তালিকা অতি দীর্ঘ হয়ে পড়বে। সেজন্যে তাঁদের আর নাম দেওয়া হল না।

এখানে নিযুক্ত থেকে অনুষ্ঠান করা কিংবা সাময়িকভাবে এসে আসরে সঙ্গীত পরিবেশন শুধু নয়। আরও একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে পাল চৌধুরী মহাশয়দের এই জলসাঘর। এখানে সমাগত শিল্পীরা কর্তাদের ইচ্ছায় ও আগ্রহে একাধিক বাঙালী শিক্ষার্থীকে এখানে তালিম দিয়েছেন। এই সুযোগের সবচেয়ে সদ্ব্যবহার করেন তখনকার বাংলার দুই সঙ্গীত-প্রতিভা। বামাচরণ ভট্টাচার্য ও নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রথম জনের কথা 'সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে এবং বক্ষ্যমান ধারার 'শিল্পী বড়' অধ্যায়ে বলা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গ নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শিক্ষা যে এখানেই একান্তভাবে হয়েছিল, তা নয়। সে-সব কথা আলোচনা হবে যথাস্থানে।

এখন সেদিনের জলসাঘরের ছোট্ট ঘটনাটি দিয়ে নিবন্ধ আরম্ভ করা যাক।

খানিকক্ষণ আগে সে রাতের আসর বসেছে। জলসাঘরে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে আছেন নগেন্দ্রনাথ এবং পশ্চিমা কলাকারদের মধ্যে বড়ে দুন্নি খাঁ।

তখনকার সঙ্গীত-জগতে দুজন দুন্নি খাঁ ছিলেন। অন্য জনকে বলা হত ছোটে দুন্নি খাঁ, ঠুংরির ওস্তাদ এবং ল ক্ষ্ণৌ নিবাসী, কলকাতাতেও অনেকদিন ছিলেন। বিখ্যাত সরদী আমীর খাঁর শ্বশুর। তিনি নন, বড়ে দুন্নি খাঁ সেদিন রানাঘাটের আসরে উপস্থিত।

খাঁ সাহের দিল্লী থেকে আসেন। ছোটে দুন্নির যেমন ঠুংরিতে খ্যাতি, এর তেমনি খেয়াল আর টপ্পাতেও। নগেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে দুই অঙ্গের শিক্ষার সুযোগ পান। বিশেষ খেয়াল। সেদি ‌ের আসরের আগে থেকে নগেন্দ্রনাথ বড়ে দুন্নির কাছে শিক্ষার্থী।

ঐ আসরের ঘটনাটি কিন্তু কোনো কৌতূহল-উদ্দীপক কাহিনী বা কোনো 'সঙ্গীত-যুদ্ধে'র বিবরণ নয়। কোনো চমকপ্রদ নাটকীয়তাও এতে নেই। এ শুধু এক সানন্দ পরিবেশে সুরের আবাহন ও তার উপযুক্ত গুণ গ্রহণের কথা।

তরুণশিল্পীকে প্রবীণ গুণীর সমাদর।

নগেন্দ্রনাথকে বয়সে তখনও যুবক বলা যায়। কিন্তু সঙ্গীতের জ্ঞানে ও শিল্পায়নে তিনি তখনই প্রবীণ।

আসরে সেদিন তিনি খেয়াল গাইছিলেন। তাঁর পরে গাইবার কথা ওস্তাদ দুন্নি খাঁর। তিনিও তখন অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে বসে গান শুনেছেন।

নগেন্দ্রনাথ গাইছেন দরবারী কানাড়া। কণ্ঠ সুমিষ্ট, সতেজ ও দরাজ। অতি সুরেলা। মনোমুগ্ধকর সূক্ষ্ম কারুকর্মে ভরা। আর সে গলায় শুধু রাগের যথাযথ রূপায়ণ নয়। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু আবেদন ছিল। সঙ্গীতে রস-সৃষ্টির প্রেরণা।

তাঁর দরবারী কানাড়া শুনতে শুনতে মর্মজ্ঞ শ্রোতাদের সেই রকম অনুভবই জাগল। সঙ্গীতধারায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠল পাল চৌধুরীদের সেই জলসাঘর।

তারপর এক সময়ে নগেন্দ্রনাথের গান শেষ হল। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত হয়ে সাধুবাদ করলেন, সাবাস দিলেন তাঁকে।

তখন ওস্তাদ বড়ে দুন্নি খাঁকে তাঁর গান আরম্ভ করতে অনুরোধ করা হল।

কিন্তু খাঁ সাহেব চমৎকার আপত্তি জানিয়ে বললেন—ভট্‌চাযের সুরে এখন ঘর ভরে আছে। আমি আজ গাইব না। এখন ও-ই গান করুক। আমি কাল গাইব।

নগেন্দ্রনাথের গান শেষ হতে তিনি যেমন অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি অভিনন্দন লাভ করলে দুন্নি খাঁর এই মন্তব্যটি। খাঁ সাহেবকে আর তারপর কেউ অনুরোধ করলেন না।

সেই মনোরম পরিবেশে এবার টপ্পা আরম্ভ করলেন নগেন্দ্রনাথ।...

পাল চৌধুরীদের জলসাঘরেই আর একটি আসর। নগেন্দ্রনাথের তখন তরুণ বয়স। ঠুংরি চর্চা কিছু কিছু পিতার কাছে শুনে আরম্ভ করেছেন বটে, কিন্তু ভালভাবে কিংবা ওস্তাদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পাননি।

স্বনামধন্যা শ্রীজান বাঈ সে সময়ে মুজরো করতে এসেছেন পাল চৌধুরীদের দরবারে। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা এবং ঠুংরি চার অঙ্গেই এত বড় গুণী নারী-শিল্পীদের মধ্যে সেকালে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি তাঁর সঙ্গীতজীবনের দীর্ঘকাল বাংলা দেশেই বাস করেছিলেন এবং তাঁর নাম নানা আসরের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে।

পাল চৌধুরীদের বাড়ির জল্‌সায় সেবার প্রথম মুজরায় আসেন শ্রীজান আর কয়েকদিন ধরে তাঁর গান হয় এখানে। নগেন্দ্রনাথও নিমন্ত্রিত হয়ে শ্রীজানের সবক'টি আসরে গান শুনতে আসেন। তার মধ্যে একদিন শ্রীজানের দুটি গান নগেন্দ্রনাথের এত বেশি ভাল লাগে যে অনুরোধ জানিয়ে আর একবার করে শুনে নেন গান দুখানি। প্রতিভাবান সুরশিল্পীদের যেমন দেখা যায় তিনিও তেমনি শ্রুতিধর ছিলেন এবং সেই গান দুটি তখনি আয়ত্ব করে নেন।

তারপর আসে শ্রীজানের সেবারকার মুজরার শেষ আসর। সেদিন কর্তাদের তিনি জানালেন যে, রাণাঘাটের গুণীদের গান শোনবার তাঁর ইচ্ছা।

রানাঘাটের প্রতিনিধি হয়ে পশ্চিমা শিল্পীদের গান শোনাতে পারেন নগেন্দ্রনাথই, যদিও তখন তিনি যুবক এবং শিক্ষার্থী।

গৃহস্বামীদের অনুরোধে তখন শ্রীজানকে নগেন্দ্রনাথ গান শোনালেন। উৎকৃষ্ট টপ্পা এবং ঠুংরিও। গানের শেষে শ্রীজানের অনুমতি নিয়ে তাঁরই মুখে শোনা সেই গান দুটি গাইলেন নির্ভুলভাবে।

শ্রীজান তাঁর অনুকরণ ও গায়ন ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হলেন। নগেন্দ্রনাথকে তিনি সাবাস দিলেন বার বার করে।

নগেন্দ্রনাথ এই কদিন শ্রীজানের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখন শ্রীজানের প্রশংসালাভের পর তাঁর কাছে শিষ্যত্বের ইচ্ছা জানালেন।

সানন্দে রাজি হলের শ্রীজান্। এমনিভাবে প্রতিভার জোরে শ্রীজানের কাছে নগেন্দ্রনাথ শিক্ষা ও সংগ্রহের সুযোগ পেলেন। অসমান্যা এই কলাবতীর কাছে তিনি বিশেষকরে শেখেন ঠুংরি।

তা ছাড়া খেয়াল গানও যথেষ্ট পান। সে যাত্রায় নগেন্দ্রনাথ রানাঘাটে থেকে শ্রীজানের তালিম কিছুদিন পান। তারপর যতবার শ্রীজান এসেছেন পাল চৌধুরী ভবনে মুজরায়, প্রতিবারই ডেকে পাঠিয়েছেন নগেন্দ্রনাথকে। তাঁকে চীজ দিয়েছেন। কলকাতাতেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ও তালিম পেয়েছেন নগেন্দ্রনাথ।

আর একটি আসর। শ্রীজানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অনেক বছর পরের কথা। নগেন্দ্রনাথ তখন পঞ্চাশোর্ধ এবং সঙ্গীতক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ, বাংলার এক নেতৃস্থানীয় শিল্পী।

এই আসর হয় কলকাতায়। গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায় পরিবারের যে ভবন মানিকতলায় (এখনকার বিবেকানন্দ রোডে) ছিল, তা তখনকার কলকাতার একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত-সভা হিসেবে সুপরিচিত। এই পরিবারের স্বনামধন্য শিকারী ও সুরবাহার-বাদক জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জন্যেই সেকালের গোবরডাঙা গৃহের আসর সঙ্গীত-রসিকদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। আর নগেন্দ্রাথ ভট্টাচার্যের গান কলকাতার যে ক'টি আসরে সবচেয়ে বেশি হয়েছে, গোবরডাঙা ভবন তার মধ্যে অন্যতম।

সেদিনকার আসর বসে সকালবেলা। সাধারণতঃ আসরে নগেন্দ্রনাথের গান হত শেষ দিকে। তাঁর মাধুর্যময় কণ্ঠে আসর এমন জমে যেত যে তার পর অন্য গায়কের গান গাওয়া অনেক সময়েই কঠিন হত। তাই অন্যান্যদের গান হয়ে যেত আগে।

সেদিনও যখন নগেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করলেন তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আসরে তিনি সাধারণত আগে খেয়াল গেয়ে শেষ করতেন টপ্পা দিয়ে। অনেক আসরে প্রথমে গাইতেন ধ্রুপদ, তারপর খেয়াল ও টপ্পা। শুধু টপ্পা প্রায় কোনো আসরেই গাইতেন না।

টপ্পা গান গাইবার বিষয়ে তিনি এই মত প্রকাশ করতেন যে, 'আগে ঘণ্টা দুয়েক (খেয়াল ইত্যাদি) অন্য গান গেয়ে গলা তেতে না উঠলে টপ্পার দানা ভালভাবে বেরোয় না। টপ্পা গাইবার জন্যে এমনি করে গলা তৈরী করে নেয়া দরকার। আসরে হঠাৎ টপ্পা ফরমাশ করলে ভাল করে গাওয়া যায় না।'

সে যা হোক, অনেক বেলায় গোবরডাঙা ভবনের আসরে সেদিন তিনি গান ধরলেন। প্রথমে ভৈরবীর খেয়াল। ভৈরবী তাঁর অতিপ্রিয় এবং এতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন এমন প্রসিদ্ধি আছে। শুধু যে ভৈরবীর অনেক গান তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল তা নয়, একাধিক চালের ভৈরবী শুনিয়ে তিনি মাৎ করে দিতেন আসর। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। একটি ভৈরবীর অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে গেয়ে আসরে সুর জমিয়ে দিলেন আর তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে, গলা তাতিয়ে নিলেন। তারপর আরম্ভ করলেন টপ্পা, ভীমপলশ্রীতে! ভীমপলশ্রীও তাঁর বিশেষ প্রিয় রাগ।

তাঁর ভীমপলশ্রীয় টপ্পাও শোনবার বস্তু ছিল। এ আসরেও যখন ভীমপলশ্রী টপ্পা গাইতে লাগলেন, শ্রোতাদের মন ভরে গেল। গান শেষ হতে ঘর মুখর হয়ে উঠল তাঁর প্রশংসাধ্বনিতে।

কিন্তু সেই সুন্দর আবহের মধ্যেও একটি বেসুর বাজল।

একজন বাঙালী গায়ক (নামটি জানা যায়নি) তাঁর কাছাকাছি কয়েকজনকে শুনিয়ে নগেন্দ্রনাথের গানের সমালোচনা করে বললেন—উনি ঈশ্বর-দত্ত কণ্ঠ-সম্পদের জন্যেই শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। কিন্তু তাঁর দুটি রাগরূপই ভুল।

কথাটা মুখে মুখে গুঞ্জরণ হতে হতে ভট্টাচার্য মশায়েরও কানে গেল।

শুনে কিন্তু বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হলেন না তিনি। বরং মন্তব্যকারীকে তাঁর কাছে আসতে আহ্বান করলেন।

সে গায়ক তাঁর কাছে গিয়ে বসতে নগেন্দ্রনাথ দেখলেন তাঁর বয়স হবে ৩০।৩২ বছর। তাঁকে শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—আমার গানের কোথায় ভুল হয়েছে?

—ভৈরবী আর ভীমপলশ্রী ঠিক দেখানো হয়নি।

শ্রোতারা অনেকেই আশ্চর্য হলেন, কৌতূহলীও। এত বড় গায়ককে সকলের সামনে মুখের ওপর ভুল বলে দিলে একজন! উৎসুক হয়ে তাঁরা লক্ষ্য করতে লাগলেন নগেন্দ্রনাথের দিকে—তিনি কি বলেন জবাবে! কেউ কেউ একটা বিবাদের সম্ভাবনা দেখে উৎফুল্ল হলেন। আবার কেউ কেউ ভাবলেন, আসরটা এবার মাটি হবে বুঝি তর্কাতর্কির চোটে।

আসরে এত লোকের সামনে এমন অপবাদ সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ কিন্তু ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হলেন না। ধীরভাবে বললেন—বাবা, তুমি আমার ছেলের মতন। তুমি বলছি বলে কিছু মনে করো না। তুমি কত রকমের ভৈরবী আর ভীমপলশ্রী গাইতে পার, আগে বল তো।

সেই গায়ক আশ্চর্য হয়ে বললেন—কত রকমের আবার কি? ভৈরবী ভৈরবীই। ভীমপলশ্রীও একই রকমের ভীমপলশ্রী। দু-রকমের ভৈরবী কিংবা দু-রকমের ভীমপলশ্রী আমি স্বীকার করি না।

নগেন্দ্রনাথ হাসি-মুখে বললেন—এইখানেই তোমার ভুল। রাগের যে রকমফের হতে পারে, এক ঘরের সঙ্গে আর এক ঘরের কিংবা এক জায়গার সঙ্গে আর এক জায়গার যে তফাত হয় তা তোমার জানা নেই, দেখছি। অথচ এক কথায় বলে দিলে—'ভুল'। তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম। অনেক কিছু এখনও তোমার জানতে-শিখতে বাকি আছে। কিছু জানতে না চেয়েই একেবারের 'ভুল' বলে দিলে। একটু বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেও

পারতে, এ ভৈরবী এরকম কেন গাইলুম, ভৈরবী তো অন্য রকম শোনা যায়। আচ্ছা ওসব কথা যাক, এবার শোন। ভৈরবীর দু-রকম রূপই দেখা গেছে। আমি যে ভৈরবী আজ গাইলুম ধৈবত বাদী আর গান্ধারকে সম্বাদী করে, সেটি মোটেই ভুল নয়। তাও ভৈরবীর এক রূপ, যদিও অপ্রচলিত। তোমাদের ঘরে হয়ত তার চলন নেই। কিন্তু তাই বলে একে তুমি ভুল বলতে পার না। কোনো ওস্তাদই একে ভুল বলেন না। তুমি এটা না জানতে পার। তেমনি ভীমপলশ্রী বা ভীমপলাশীর রূপেও প্রকারভেদ আছে। প্রথমে ভৈরবী শোন। এক রকম ভৈরবী তো শুনিয়েছি। এখন আর এক রকম ভৈরবী গাইছি।

এই বলে তিনি ভৈরবী গেয়ে শোনাতে লাগলেন যার বাদী মধ্যম আর সম্বাদী ষড়জ। ভৈরবীর এই রূপ সচরাচর শোনা যায় এবং এইটিই বেশি প্রচলিত।

ভৈরবী শেষ করে এবার তিনি ভীমপলশ্রীর প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন। আসরের প্রায় সমস্ত শ্রোতাই তখন বুঝতে পেরেছেন তাঁর যুক্তির সারবত্তা আর বক্তব্য কি।

ভীমপলশ্রীর কথায় নগেন্দ্রনাথ আবার গান ধরলেন। গান দিয়েই মীমাংসা করতে চাইলেন সঙ্গীত বিষয়ের সমস্যা। আর সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

গান গেয়ে তিন রকমের ভীমপলশ্রীর দৃষ্টান্ত দিলেন তিনি। তাদের একটির সঙ্গে আর একটির কি পার্থক্য তাও বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। আগেকার ওস্তাদদের গাওয়া ভীমপলশ্রীর সঙ্গে এখনকার চলিত ভীমপলশ্রীর কতখানি তফাত হয়ে গেছে দেখিয়ে দিলেন গানের উদাহরণ দিয়ে। বিশেষ করে তিনি ব্যাখ্যা করলেন হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ভীমপলশ্রীর সঙ্গে বাংলা দেশে প্রচলিত রূপটির বিভিন্নতা। ভিন্ন সাঙ্গীতিক পরিবেশে কেমন করে একই রাগ ধীরে ধীরে কতখানি রূপান্তর গ্রহণ করেছে।

এমনি ভাবে সঙ্গীত সহযোগে তর্কের সমাধান এবং শ্রোতাদের আপনার বক্তব্যে বিশ্বাস জন্মাবার পর নগেন্দ্রনাথ সেই গায়কের উদ্দেশে বললেন—গানের আসর ঝগড়ার জায়গা নয় বাবা! আর যদি ঝগড়া করে গান বন্ধ করে দেওয়াই উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সেজন্যে নিজেকে তেমনিভাবে প্রস্তুত করতে হয়। আসরে লড়বার উপযুক্ত হয়ে আসতে হয়। সমালোচনা বড় কঠিন জিনিস।...

তারপর আর সেই প্রতিবাদী গায়কের বাক্‌স্ফূর্তি হয়নি !

এমনি আরও একটি বিতর্কিত আসরের কথা জানা যায়, যা থেকে রাগের গঠন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান ও ক্রিয়াসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ আসরটিও হয় কলকাতায়। সম্ভবত লালচাঁদ বড়াল মশায়ের বাড়িতে। এটিও সকালবেলার আসর। এখানে নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন আরও কয়েকজন গুণী উপস্থিত ছিলেন—ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যন্ত্রী আফ্‌তাব উদ্দীন খাঁ প্রভৃতি। পশ্চিমাঞ্চলের একজন বড় ওস্তাদ সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, তাঁর নামটি জানা যায়নি। তবে তাঁর জন্যেই সাঙ্গীতিক বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল এই আসরে।

নগেন্দ্রনাথ তখন খেয়াল গাইছিলেন রামকেলিতে (রামকিরি বা রামক্রী রাগ)।

গানখানি তিনি তাঁহার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চমৎকার করে গাইলেন এবং শেষ করতে আসরের অনেকেরই সাধুবাদ পেলেন।

কিন্তু সেই পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান গুণী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে নাটকীয়-ভাবে বললেন—রাগে গলদ আছে।

আকস্মিক এই অপ্রিয় মন্তব্যে আসরের স্নিগ্ধ পরিবেশটি একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সকলে নগেন্দ্রনাথ ও ওস্তাদজীর দিকে চাইতে লাগলেন—এবার অসুরের উপদ্রব আরম্ভ হবে না কি ?

নগেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন—রাগে কি ভুল আছে খাঁ সাহেব ?

খাঁ সাহেব গর্বিত মুখে উত্তর দিলেন—রামকেলিতে কড়ি মধ্যম লাগালেন না। এই হিসেবে মস্ত ভুল।

নগেন্দ্রনাথ তখন দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন—আমি ভুল করিনি। যদি এ আসরে প্রমাণ হয় যে আমার ভুল হয়েছে, আমি তা হলে গানের জগৎ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নেব। আসরে গান গাওয়া একেবারে ছেড়ে দেব।

ভট্টাচার্য মশায়ের এই প্রতিজ্ঞা শুনে আসরে বেশ চাঞ্চল্য জাগল। একটা জমাট আনন্দের আশায় অনেকেই উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

নগেন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথমে নিজের সমর্থনে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ কিছু দিলেন না। তখন সেই ওস্তাদ সুবিধে পেয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলতে লাগলের রামকেলির গলদের কথা।

ভট্টাচার্য মশায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরব হয়ে রইলেন। তারপর শুধু বললেন—আসরে আর যে সব গুণীরা রয়েছেন তাঁরা কি বলেন আগে শুনি। পরে আমার মত জানাব।

তখন উপস্থিত সঙ্গীতবিদ্‌দের মধ্যে আলোচনা হতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না তাঁরা। শেষে সকলে নগেন্দ্রনাথকে তাঁর এ বিষয়ে মতামত জানাবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

নগেন্দ্রনাথ প্রথমে বললেন—রামকেলির দু-রকম রূপ তো প্রচলিত আছে ঘরানা ভেদে। আমি দু-রকমই জানি। তীব্র মধ্যম না দিয়ে যে রামকেলি গেয়েছি সে রামকেলি অপ্রচলিত বা ভুল নয়। তবে খাঁ সাহেব সেটা না জানতে পারেন। আর যে রামকেলিতে তীব্র (বা কড়ি) মধ্যম লাগে সেও শুধু অবরোহণে। আরোহণের সময় একেবারেই বর্জিত। অবরোহণে যেটুকু কড়ি মধ্যম লাগে তাও দুর্বল। কড়ি মধ্যমের কোনো গুরুত্বই নেই রামকেলিতে, অনেক ঘরানাতেই একথা স্বীকৃত। সুতরাং কড়ি মধ্যম না লাগালে রামকেলির রূপের কোনো বিকৃতিই ঘটে না। কড়ি মধ্যম না থাকলেই সে রামকেলিকে ভুল বলার কোনো অর্থ নেই।

এই পর্যন্ত বলে তিনি আর দু'টি রামকেলির গান শোনালেন। দু'টিরই অবরোহণে আছে কড়ি মধ্যমের দুর্বল প্রয়োগ। কড়ি মধ্যম যুক্ত রামকেলি দুখানি গেয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, রামকেলিতে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার তাঁর অজানা নয়। আগে যে এরকম রামকেলি শোনানান, সেটি ইচ্ছাপূর্বক। সেই রকম রামকেলি বহু ঘরানাতেই প্রচলিত আছে। কেউ ভুল বলেন না তাকে।

পরিশেষে তিনি একটি ব্যক্তিগত মত এই রাগের ক্ষেত্রে জানান যে, কড়ি মধ্যমের ব্যবহারকে প্রাধান্য না দিলেও কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। কারণ রামকেলি একটি সন্ধি প্রকাশ রাগ। এখানে দুই মধ্যমের একটি গূঢ় তাৎপর্য থাকতে পারে। তাই একদিকে কড়ি মধ্যমে যেমন অস্তোন্মুখ যামিনীর শেষ সংকেত, অন্যদিকে তেমনি শুদ্ধ মধ্যমের তেজস্বিতায় যেন মার্তণ্ডদেবের আশু উদয়যাত্রার ঘোষণা।

নগেন্দ্রনাথের এই হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রয়োগ, তাঁর গোঁড়ামি-বর্জিত মন, রাগের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি এবং সাধনসিদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আসরের শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন। দু-রকমের রামকেলির নিদর্শন তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হতে

দেখে পরিষ্কার ধারণা করতে পারলেন তাঁর বক্তব্য কি। খাঁসাহেবও শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের মতামত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

আসরটির উপসংহার দেখা গেল সুরের সম্প্রীতির মধ্যেই। নগেন্দ্রনাথের মধুকণ্ঠের মতন তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের জন্যে উৎকট কিছু ঘটতে পারলে না। মধুরেণ সমাপ্ত হল।...

নগেন্দ্রনাথের আরো একটি আসরের কথা বলে তাঁর আসরের প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। এই ঘটনাটির সময় তাঁর বৃদ্ধ বয়স—প্রায় ৬৫ বছর। কলকাতার সঙ্গীত সমাজে ষষ্ঠীবাবু নামে সুপরিচিত ভূপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর গৃহে নগেন্দ্রনাথের এই গানের আসর হয়েছিল।

উত্তর কলকাতার সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতবোদ্ধা ষষ্ঠীবাবুর আয়োজিত আসরে বাংলার অমন গুণী কেউ বিশেষ ছিলেন না যাঁর অনুষ্ঠান হয়নি কোনো না কোনো দিন। শুধু বাঙালী শিল্পী নন, পশ্চিমাঞ্চলের নানা গুণীর গান-বাজনাও তাঁর গৃহে হয়ে গেছে। ষষ্ঠীবাবুর প্রতি অন্তরের প্রীতির টানে উপস্থিত হয়েছেন অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ।

সেদিনের আসরও ছিল তেমনি একটি। অর্থাৎ বাঙালীদের সঙ্গে বহিরাগত কয়েকজন শিল্পীরও সমাগম হয়েছিল। নগেন্দ্রনাথও আমন্ত্রিত হন অনুষ্ঠানের জন্যে। বিশিষ্ট শ্রোতাদের অন্যতম ছিলেন সুসঙ্গের রাজা সুরেন্দ্রনাথ সিংহ।

সে আসরের প্রধান আকর্ষণ-রূপে পশ্চিমাঞ্চলের দুজন নবাগত শিল্পী উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের নাম অবশ্য জানা যায়নি। এইমাত্র শোনা গেছে যে, তাঁদের একজন ছিলেন হিন্দু, আর একজন মুসলমান।

তাঁরা দুজনেই খেয়াল গায়ক। পর পর তাঁদের দুজনের গান হল। একজন গাইলেন মালকোষ ও পিলু। আর একজনের হল দেশ ও খাম্বাজ।

গান দুজনেরই বেশ উতরে গেল। কিন্তু গোলমাল বাধল তারপর তর্কাতর্কিতে। দুজনের ঘরানা পৃথক। তাই পরস্পরের রাগরূপকে ভুল প্রমাণ করতে দুজনেই সদাপটে তৎপর হয়ে উঠলেন। ক্রমে প্রায় মল্লযুদ্ধের পূর্বাভাষ দেখা গেল সুরের আসরে।

প্রথমে শ্রোতারা কৌতুক অনুভব করেছিলেন! কিন্তু অবস্থা ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে আসর পণ্ড হবার উপক্রম করতে সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শান্তি স্থাপন করতে। কারণ গান তখনো কয়েকজনের বাকি।

শেষ পর্যন্ত অন্যান্য শিল্পী ও কয়েকজন মান্য শ্রোতা মিলে নগেন্দ্রনাথকে

এবিষয়ে মধ্যস্থ হতে অনুরোধ করলেন। তিনিও তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন প্রসন্ন মনে।

প্রথমে, ভারতীয় সঙ্গীতের ঘরানার রহস্য ও তাৎপর্য বিষয়ে একটু আলোচনা করলেন। তিনি বললেন যে, ঘরানাভেদে রাগের তারতম্য কেবল বাহ্যিক স্বরবিন্যাসের সামান্য হেরফের মাত্র নয়। ঘরানাগুলির আসল বৈশিষ্ট্য রয়েছে গায়কীর মধ্যে। এই 'গায়কী' বাইরের শ্রুতি ও বিভিন্ন অলঙ্কারের সাহায্যে অন্তরের গভীরতম ভাবলোককে প্রকাশ করে। সেই ভাবলোকের সার্থক প্রকাশের মধ্যেই হয় গানের প্রাণ-প্রতিষ্টা। একই রাগ ভিন্ন ভিন্ন গায়কীতে বিভিন্ন ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে।

নগেন্দ্রনাথ আরো বুঝিয়ে দিলেন—পশ্চিমের দুই শিল্পীর গাওয়া রাগ-গুলির মধ্যে মালকোষ হল বীররস প্রধান আর দেশ, খাম্বাজ ও পিলুতে প্রধানত শৃঙ্গার রস লীলায়িত হয়ে থাকে। অথচ গায়কীভেদে এই প্রত্যেকটি রাগের অন্তর্নিহিত বিষাদকে ভক্তিরসে স্নিগ্ধ করে আত্মনিবেদনের ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়।

আলোচনার শেষে নগেন্দ্রনাথ সকলের অনুমতি নিয়ে যখন ওই চারটি রাগ ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার গায়কীতে একের পর এক গেয়ে শোনালেন তখন একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল সেই বাক-বিতণ্ডাময় আসরের পরিবেশ।

তাঁর উদার মধুর কণ্ঠে শ্রোতাদের মনে বিচিত্র রসের আবেশ সৃষ্টি হতে লাগল। তারপর নানা অলঙ্কারে ভূষিত তাঁর রাগ-রূপায়ণ কখন রাগ-ধ্যানের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল, কখন সেই অতিথি গায়কদ্বয়ের মধ্যে জাগল আত্ম-নিবেদনের ভাব, তা লক্ষ্য করবার শক্তি আর কারো রইল না। আসর তখন তাঁর সুরের ধারায় আচ্ছন্ন।

নগেন্দ্রনাথ শুধু সঙ্গীতের ব্যাকরণ কিংবা শৈলীগত বস্তু নিয়ে চর্চা করতেন না। তিনি তার অন্তরঙ্গ রূপলোকে প্রবেশ করেছিলেন অন্তরের প্রেরণায়। তিনি একজন যথার্থ শিল্পী ছিলেন এবং সঙ্গীতের ভাবুকও। তাঁর দু-একটি কথা বা প্রাসঙ্গিক মতামত উল্লেখ করলে তাঁর সঙ্গীত-চিন্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

যেমন তিনি বলতেন—গান শুধু তান-লয়ের ফান্দা নয়। সুরে নিজে ডুবে গিয়ে ডোবাতে হবে সমস্ত শ্রোতাদের। তবেই তা সত্যিকার গান।

তাল আর লয়ের গতির প্রসঙ্গ নিয়ে ছাত্রদের কাছে আলোচনা করতেন।

তখন দেখা যেত, তালের চুলচেরা মাত্রা-বিভাগ বিশেষ পছন্দ করতেন না তিনি। অনেক যথার্থ গুণীর মতন তিনিও মাত্রা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তালই আসল এ ক্ষেত্রে। তালের রহস্য ভাল করে বুঝলেই মাত্রাজ্ঞান আপনি এসে যায়।

শিষ্যদের শিক্ষা দেবার সময় তাই তিনি তালের ওপরই গুরুত্ব দিতেন। শেখাতেন, বোঝাতেন তালের গতি, প্রকৃতি, মর্মকথা। তাল বুঝলেই আর সব বোঝা হয়।

তিনি বলতেন—গানের বড় বিভাগ (অর্থাৎ তাল) শিখতে পারলেই ছোট বিভাগ (অর্থাৎ মাত্রা) আপনি আয়ত্তে আসে। খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে তিনি কথাটি বোঝাতেন—মনে করো ত্রিতালের চারটি বিভাগ (তিন তাল আর এক ফাঁক) যেন গরুর চারটি পা। গরু যখন চলে, তখন কি তার চারটে পায়ের পদক্ষেপে ছোট বড় হয়? চারটে পা-ই তো সমান তালে, তালে তালে পড়ে। ঠিক তেমনি ত্রিতালের ব্যাপার। গাইতে গাইতে আপনি ঠিক তালে তালে পড়ে যাবে। মাত্রার হিসেব রাখবার দরকার হয় না।

মাত্রা দিয়ে তাই শেখাতেন না কোনো শিষ্যকে।

তিনি বেশি বিলম্বিত ও মধ্যলয়ে গাইতেন। চীজ্ যা শোনাতেন, সবই ছিল বিলম্বিত লয়ের। হয়ত তিনি ইচ্ছা করেই বিলম্বিত লয়ে শোনাতেন। যেমন, পূরিয়ার সেই বিখ্যাত গানখানি—সপ্‌নে মে আয়ে জী। এই গান শ্রী পট বর্ধন প্রমুখ অনেক গুণীই মধ্যলয়ে গেয়েছেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ গাইতেন বিলম্বিত চালে।

লয়ের প্রসঙ্গে শিষ্যদের বলতেন—বিলম্বিত লয়ে গাইবার সময় সঙ্গত-কারকে শুধু ঠেকা বাজাতে দেবে। পরে মধ্যলয়ে গান করে তবল্‌চীকে তার কেরামতি দেখাবার অবসর দিও। মধ্যলয়ের মধ্যে দিয়েই দ্রুত লয়ের কাজ দেখাবে।

এখানে মধ্যলয় বলতে তিনি বিশেষভাবে বুঝতেন—তেলেনা। তেলেনার অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁর ছিল।

সুরের কথায় ছাত্রদের এই উপদেশ দিতেন—স্বর-সাধনাই আসল জিনিস। গান তো সকলেই গায়। চাষা মাঠে কাজ করতে করতে গাইতে থাকে। যাত্রাদলের জুড়িরাও গান গায়। আবার আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান ওস্তাদরাও গাইছেন। কিন্তু কত তফাত! সকলের গানেই সেই সাতটি

স্বরের প্রয়োগ। কিন্তু কি হেরফের। স্বরই সাধনাসাপেক্ষ। এই সাধনার ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।...

লয়ের ব্যাপারে নগেন্দ্রনাথের মত ছিল, খেয়ালে বিলম্বিত ও মধ্যলয়েই সঙ্গীতের মূল নীতি অনুসৃত হতে পারে।

শুধু তাল লয়ই নয়, সঙ্গীতের সকল দিকেই তাঁর আচার্যজনোচিত কতকগুলি নিজস্ব মতামত ছিল। তাঁর সেই সব মতামত গড়ে উঠেছিল অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার ভিত্তিতে। সামগ্রিকভাবে গান ও শিল্পী সম্বন্ধেও তাঁর একটি সুন্দর মন্তব্য শোনা যেত।

তিনি বলতেন, 'সঙ্গীত মোহিনী বিদ্যা। সুতরাং যতক্ষণ সম্মোহন শক্তি আয়ত্বে না আসে, ততক্ষণ সে শিল্পী অকিঞ্চিৎকর।'

নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন সেই সম্মোহন শক্তির অধিকারী। কণ্ঠমাধুর্য ও রসোপলব্ধির অপরূপ পুলকে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন।

জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর এই সঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব জাজ্বল্যমান ছিল গানের আসরে। তাঁর সুরের আবেশে শ্রোতাদের মনে কখনো আনন্দ কখনো অশ্রুর আবেগ জাগত। আবার কখনো এক অপূর্ব চাঞ্চল্যহীন ভাব-গাঢ় অনুভব সৃষ্টি হত সকলের মনোরাজ্যে।...

রাগ রাগিণীর ব্যাকরণ সম্বন্ধেও নগেন্দ্রনাথের নানা মতামত শোনা যেত। তার মধ্যে একটি হল—রাগ নির্ণয় করার আগে জাতিতত্ত্বের উদ্ধার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাঁর একটি নিজস্ব অভিমত ছিল, 'সাহিত্যের মতন সঙ্গীতেও কিছু কিছু আর্ষ প্রয়োগ আছে।'

ধ্রুপদ ও খেয়াল গান সম্বন্ধে তাঁর একটি চমৎকার সঙ্গীতচিন্তা এইভাবে প্রকাশ পায়—'ধ্রুপদ ও খেয়াল দুটিই গোড়ের মালা। পার্থক্য শুধু মালা ও ফুলের আকৃতিতে। ধ্রুপদের মালা বড় বড় বেলফুল দিয়ে গাঁথা। আর খেয়ালের মালা ছোট ছোট ফুলের তৈরি। দুটিরই পরিবেশন প্রায় সমান। ধ্রুপদের চার তুক বলে এমনিতেই বিস্তারিত। কিন্তু খেয়ালে গানের পদ ছোট হয় বলে তাকে বাড়াবার জন্যে তান কর্তবের প্রয়োজন হয়।

নগেন্দ্রনাথ তাঁর অন্যতম ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতেন যে, কোনো রাগ শেখাবার সময় ধ্রুপদের সঙ্গে সেই রাগের বিশিষ্ট পদ্ধতির খেয়ালও শেখাতেন।

খেয়াল ও টপ্পার অতি বিচক্ষণ শিক্ষকরূপে এই সব ছিল তাঁর মতামত

ও ধারণা। আর শিল্পী হিসেবে যেমন, তেমনি শিক্ষকরূপেও বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁর স্মরণীয় আসন ছিল। সমগ্রভাবে তিনি ছিলেন সমসাময়িক-কালের সঙ্গীত-জগতের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সত্যকার একজন আচার্য। অতি কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করে মহিমময় আসনে দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

সেকালের বাংলা দেশে সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কোথায় ছিল তা বুঝতে পারা যাবে তাঁর শিষ্যদের কথা মনে রাখলে। এখানে একটি কথা বলে রাখা যায় যে, সেকালের অনেক বাঙালী সঙ্গীতাচার্যদের মতন তিনিও ছিলেন অপেশাদার। আসরে গাইবার জন্যে তিনি যেমন দক্ষিণা নিতেন না, ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারেও তেমনি। বরং কোনো কোনো অভাবী শিষ্যকে অর্থ সাহায্য করতেন শোনা গেছে।

আগ্রহী সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের যেমন অকৃপণভাবে দান করেছেন সঙ্গীত-বিদ্যা, তেমনি কুশলী ছিলেন তাদের উপযুক্তভাবে গঠিত করতে। এমন সযত্নে এবং নিপুণভাবে তিনি শিক্ষা দিতেন যে তাঁকে একজন আদর্শ শিক্ষক বলা যায়। শেখাবার সময় গানখানি ছাত্রের কণ্ঠে সঠিকভাবে তুলে না দিয়ে কখনও নিশ্চিন্ত হতেন না। আর যে গান কাউকে শেখান তার 'বন্দিশ' কখনও তিলমাত্র এদিক-ওদিক করতেন না তিনি। কোন গান কুড়ি বছর আগে একজনকে যেভাবে মূলের সঙ্গে অভিন্ন রেখে শিখিয়েছেন, কুড়ি বছর পরেও আর একজনকে শেখান তার বন্দিশ অক্ষুণ্ণ রেখে। সঙ্গীতের ঐতিহ্য সঠিকভাবে ধারণ ও রক্ষা করতে গেলে এমন নিষ্ঠাই দরকার।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আসরে আসরে পদ্মবাবু নামে সুপরিচিত) এবং নগেন্দ্রনাথ দত্ত। ভট্টাচার্য মশায়ের প্রিয়তম শিষ্য, ললিতকণ্ঠ পদ্মবাবু তাঁর সুশিক্ষার সুবর্ণ ফল।

'রানাঘাটের কোয়েল' অধ্যায়টিতে পদ্মবাবুর পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হবে। এখানে শুধু স্বনামধন্য গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক। পদ্মবাবুর তখন ১৯ বছর মাত্র বয়স। গান শেখা আরম্ভ হয়েছে তারও ক'বছর আগে, নগেন্দ্রনাথের কাছে। গুরুর সঙ্গেই সেবার কাশী যান। অঘোরনাথও তখন শেষ বয়সে কাশীবাসী। সেখানে তখন পদ্মবাবুর গান একদিন শোনেন। গান শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে নগেন্দ্রনাথকে বলে ওঠেন—ভট্চার্য, কি জিনিসই তৈরি করেছ ?···

ভট্টাচার্য মশায়ের আর এক সুযোগ্য শিষ্য নগেন্দ্রনাথ দত্ত খেয়াল ও টপ্পা

গায়করূপে খ্যাতিমান ছিলেন কলকাতায় আসরে, কর্মসূত্রে কলকাতায় অবস্থানের জন্যে।

পদ্মবাবুর কণ্ঠমাধুর্য নগেন্দ্রনাথ দত্তের না থাকলেও গুণী হিসেবে তাঁরও সুনাম ছিল। তা ছাড়া শিক্ষক হিসেবেও কৃতিত্ব ছিল দত্ত মশায়ের। কলকাতা ও রানাঘাটে তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি গুরুর সঙ্গীত-ধারাকে বিস্তৃত করেছিলেন। সঙ্গীত-রত্ন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কৃতী খেয়াল ও ঠুংরি গায়ক শচীন্দ্রনাথ দাসের (মোতিলাল) প্রথম সঙ্গীতগুরু ছিলেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভীষ্মদেবের বিষয়ে এখানে আর একটু বিশেষ করে জানাবার আছে। তিনি শুধু যে দত্ত মশায়ের কাছে প্রথম জীবনে শিখেছিলেন, তা নয়। সে সময় ভীষ্মদেব নিয়মিত যাতায়াত করতেন রানাঘাটে, আত্মীয়তার সূত্রে। তখন ভট্টাচার্য মশায়ের এক শিষ্য হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (হাস্যরসের অভিনেতাও) কাছে ভীষ্মদেব বছর দুয়েক গানও শেখেন। ভীষ্মদেবের তখন কিশোর বয়স হলেও অনেকদিন শুনেছেন নগেন্দ্রনাথের গান। ভট্টাচার্য মশায়ের তখন শেষ বয়স হলেও শিষ্যদের শেখাচ্ছেন কিংবা কিছু গেয়ে দেখাচ্ছেন এমন ঘনিষ্ঠ পরিবেশে দিনের পর দিন ভীষ্মদেব সঙ্গীতাচার্যকে দেখেছেন। তাঁর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব ভীষ্মদেবের তরুণ জীবনে হয়ত কিছু পরোক্ষ প্রেরণাও দিয়ে থাকতে পারে।

ভীষ্মদেব ও শচীন্দ্রনাথ ছাড়া নগেন্দ্রনাথের (দত্ত) শিষ্যদের মধ্যে গোপাল দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ দত্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, বিজনকুমার বসু, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। তাঁদের মধ্যে শিবকুমারের কথা ভট্টাচার্য মশায়ের পারিবারিক প্রসঙ্গে বিশেষ করে আবার বলা হবে।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে প্রথম জীবন থেকেই শিখতে আরম্ভ করেন রানাঘাটে। পরে কলকাতা বাসের সময় পরিণত বয়সে ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে কিছুকাল শিখলেও ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ থেকে কোনদিন বিরত হননি। কলকাতায় থাকবার সময় তখন তিনি যেমন বাদল খাঁর কাছে শিখতেন, তেমনি প্রতি সপ্তার শেষে দেশে অর্থাৎ রানাঘাটে যেতেন এবং শিখতেন ও সংগ্রহ করতেন ভট্টাচার্য মশায়ের পদতলে বসে।

পদ্মবাবু ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত দু'জনেই ছিলেন খেয়াল ও টপ্পা গায়ক। তাঁরা ভট্টাচার্য মশায়ের শিষ্যদের মধ্যে সঙ্গীত-জগতে অধিকতর পরিচিতি লাভ

করেন সত্য, কিন্তু তাঁরা ছাড়াও কৃতী গুরুভাই তাঁদের আরও ছিলেন। তাঁরা হলেন নগেন্দ্রনাথের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য।

শেষোক্ত দু'জনের মধ্যে প্রমথনাথ (৩৮ বছরে) অকালমৃত্যুর জন্যে সঙ্গীত-ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধির বেশি সুযোগ পাননি; কিন্তু টপ্পা, বিশেষ খেয়ালে তিনি অতি সুকণ্ঠ গায়ক হয়েছিলেন। তাঁর মিহি গলায় মিড়ের সূক্ষ্ম কারুকর্ম ছিল শোনবার মতন। নগেন্দ্রনাথের তিনি হাতে-গড়া শিষ্য ছিলেন। স্বাভাবিক পরমায়ু লাভ করলে প্রমথনাথ স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতেন সঙ্গীত-জগতে।

নগেন্দ্রনাথের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ এই পরিবারে নগেন্দ্র-নাথের পরে একজন প্রতিষ্ঠাবান গায়ক। অতিশয় দরাজ তাঁর গলায় গমকের প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য অলঙ্কারের অভাব ছিল না এবং হিন্দুস্থানী খেয়াল টপ্পায় একজন রীতিমত গুণী গায়ক ছিলেন।

সেকালের রানাঘাট, মালিপোতা, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, উলা বা বীরনগর, যশোরের কিছু অংশ, বনগাঁ ইত্যাদি স্থানে গায়করূপে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। কারণ এই সব জায়গাতেই তাঁর গান বেশি হত। তা ছাড়া ভাওয়াল রাজ-দরবারে এবং কলকাতার কয়েকটি পরিবারের আসরেও শ্রোতারা পেতেন তাঁর গুণপনার পরিচয়।

রীতিমত শিক্ষিতপটু গায়ক হওয়া সত্ত্বেও, আজীবন শৌখীনরূপে মফস্বলে বাস করার জন্যে যথোচিত খ্যাতিমান তিনি হননি। সঙ্গীত-চর্চাকেই জীবনের বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করে যদি কলকাতায় বসবাস করতেন তা হলে তাঁর নাম হয়ত সুপরিচিত থেকে যেত তখনকার বাংলার সঙ্গীত-জগতে। পারিবারিক প্রসঙ্গে তাঁর কথা পরে আবার আসবে।

এখানে ভট্টাচার্য মশায়ের অন্যান্য শিষ্যদের নামগুলিও উল্লেখ করে রাখা যায়। যথা—সৌরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (দৌহিত্র), সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (হাস্যরসের অভিনেতারূপে অধিকতর খ্যাতিমান), দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপধ্যায়, প্রমথনাখ চন্দ্র, অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চরণ কুণ্ডু, তরুণেন্দু ঘোষাল, সুধীর দাস, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

পদ্মবাবু থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত শিষ্যই রানাঘাট অঞ্চলের নিবাসী ছিলেন, গুরুর মতন। সুতরাং বোঝা যায় যে, অঞ্চলটি ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গীত-জীবনের প্রভাবে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল। রানাঘাটকে কেন্দ্র করে সন্নিহিত অনেক দূর স্থানে পর্যন্ত সঙ্গীতাচার্যরূপে বিপুল গৌরবে অবস্থান

করেন তিনি।

নগেন্দ্রনাথকে আমৃত্যু রানাঘাটে বাস করার ফলে সমগ্র অঞ্চলটি সঙ্গীত-চর্চায় রীতিমত সমৃদ্ধ হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নিজেকে সেজন্যে বঞ্চিত করেন বৃহত্তর সঙ্গীত-জগতে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভে। তাঁর তুল্য আচার্য-স্থানীয় গুণী যদি কলকাতায় অবস্থান করতেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের সম্মেলনাদিতে যোগ দিতেন তা হলে সর্বভারতীয় সঙ্গীত-ক্ষেত্রে বাংলা দেশ আরও একজন যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের গৌরব লাভ করত।

ওস্তাদ রমজান খাঁ প্রমুখ কোনো কোনো গুণী এবং কলকাতার তাঁর কয়েকজন অনুরাগী তাঁকে অনেকবার বলেছিলেন কলকাতায় বাস করতে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ রানাঘাট ত্যাগ করে আসতে সম্মত হননি।

তার একটি কারণ এই যে, তিনি রানাঘাটকে রাগসঙ্গীত চর্চার একটি ভাল কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যরা সকলেই সেজন্যে রানাঘাট নিবাসী। তাঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ দত্ত উত্তরজীবনে কলকাতায় চাকরি সূত্রে অনেক সময় থাকতেন এবং বাদল খাঁর শিক্ষাও নিতেন। তবু রানাঘাটের সঙ্গে সম্পর্কছেদ তাঁরও হয়নি। প্রতি সপ্তায় তিনি আসতেন রানাঘাটে এবং আচার্যের কাছেও।

ভট্টাচার্য মশায়ের প্রাণের একটি প্রিয় কামনা ও আশা ছিল যে তাঁর পরেও রানাঘাটে পদ্মবাবুকে মধ্যমণি করে সঙ্গীতচর্চার একটি মণ্ডলী থাকবে। কিন্তু তাঁরই জীবিতকালে পদ্মবাবুর অকাল মৃত্যুতে এই সাধটি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পদ্মবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সেই আশাভঙ্গে শোকও কম বাজেনি তাঁর বুকে।

পদ্মবাবু গুরুর তুল্য আয়ুষ্মান হলে তাঁকে কেন্দ্রে রেখে রানাঘাটে যে সঙ্গীতের পরিবেশ গড়ে উঠত তাতে এই সম্প্রদায়টির ধারাও বজায় থাকত। আর তাঁর প্রবর্তকরূপে বেঁচে থাকত ভট্টাচার্য মশায়েরও নাম।

রানাঘাট তথা নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবন সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এখানে তাঁর আসরের প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য জানিয়ে রাখা যায়।

রানাঘাটে তিনি বসবাস করলেও তাঁর গানের আসর অনেক জায়গাতেই হত, শুধু এই অঞ্চলে নয়।

কলকাতায় তাঁর গানের অনুষ্ঠান লালচাঁদ বড়ালের বাড়ি ও গোবরডাঙা ভবনে হবার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। কলকাতায় তাঁর অন্যান্য আসরের

মধ্যে জোড়াসাঁকোর হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মশায়ের বাড়ির হোলির আসর, ভবানীপুরের নাটোর ভবন, শঙ্কর উৎসব (বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন) উল্লেখ-যোগ্য। এই ক'টি আসরেই নগেন্দ্রনাথ কলকাতায় গেয়েছেন সবচেয়ে বেশি।

তাঁর অন্যান্য আসরের মধ্যে উল্লেখ করবার মতন হল—গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায় পরিবারের ভবন, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি, উলার মুখোপাধ্যায় ভবন, রানাঘাটের পাল-চৌধুরীদের গৃহ, ত্রিপুরার রাজদরবার, মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ) সঙ্গীত সভা, ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নগেন্দ্রনাথের ভায়রাভাই) বাড়ি, প্রভৃতি আসরে তিনি খেয়াল ও টপ্পাই বেশি গাইতেন। কখনও কখনও ধ্রুপদ দিয়ে আরম্ভ করতেন অনুষ্ঠান। তাঁর সঙ্গীতের সঞ্চয় অপর্যাপ্ত হলেও সাধারণত তিনি প্রচলিত রাগের গানই পরিবেশন করতেন। তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল ভৈরবী আর খাম্বাজ। ভৈরবীতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

ধ্রুপদেও তিনি অপ্রচলিত রাগের পক্ষপাতী ছিলেন না, তবে দেবগিরি, নটনারায়ণ ও দেওশাঘ গাইতে শোনা গেছে তাঁকে।

উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বর্তমান শতকের প্রথম পাদকে বাংলার আসরে খেয়াল গান তিনি অনেক শুনিয়েছেন। তিনি এবং বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-জনেই খেয়াল গুণী (লক্ষ্ণৌর) আহম্মদ খাঁর শিষ্য। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী খেয়াল গায়কদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ও বামাচরণের বয়োকনিষ্ঠ সাতকড়ি মালাকর মশায়ের নামও উল্লেখ করবার মতন।

এই তিনজনের জন্যে বাংলার উৎসরে আসরে খেয়াল গান অনেকখানি জনপ্রিয় হয়েছে। এঁদের সমকালে আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীও খেয়াল শুনিয়েছেন আসরে। তবে তিনি ছিলেন মুখ্যত ধ্রুপদী। নগেন্দ্রনাথ ও বামাচরণের আগেকার যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী খেয়াল গায়ক ছিলেন (যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সভাগায়ক) গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, যদিও তিনি ধ্রুপদ ও টপ্পার সাধনাও করেছিলেন। চক্রবর্তী মশায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙালী খেয়াল গায়ক আর একজন ছিলেন—কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। তবে কার্তিকেয়চন্দ্রের সঙ্গীতজীবন বৃহত্তর বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রসারিত না হয়ে কৃষ্ণনগর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সঙ্গীত তাঁর জীবনে একান্ত সাধনও ছিল না।...

নগেন্দ্রনাথ খেয়াল গানের সঙ্গে টপ্পার জন্যেও রীতিমতো খ্যাতিমান ছিলেন, এমন কি কোনো মতে, টপ্পা গানের জন্যেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল সমধিক। কেউ কেউ তাঁকে টপ্পার যাদুকর বলেও অভিহিত করতেন এবং বলতেন টপ্পাই ভট্টাচার্য মশায়ের forte।

বাংলা দেশে টপ্পা সাধনার যে ক'টি প্রধান ধারা আছে নগেন্দ্রনাথ তার একটির অন্যতম নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তা হল, বারাণসীর ইমাম বাদীর টপ্পা-ধারা।

ইমাম বাদীর দুই শিষ্য নগেন্দ্রনাথ ও (ইমাম বাদীর পুত্র) রমজান খাঁ বাংলা দেশে বহু শিষ্য গঠন করে এবং আসরে আসরে দীর্ঘকাল যাবৎ পরিবেশন করে এই ঘরের টপ্পা সুপ্রচলিত করেন। এত বিভিন্ন এবং গম্ভীর চালের টপ্পা গান মহেশ ওস্তাদ আর রমজান খাঁ ভিন্ন আর বেশি কেউ শোনাননি বাংলা দেশে।

বাংলায় আরো একটি প্রাচীন টপ্পাধারার কথা না বললে এ সম্পদের উত্তর সাধক হিসেবে নগেন্দ্রনাথের কথা পুরো জানা যাবে না। তিনি প্রথম টপ্পা চর্চা আরম্ভ করেছিলেন তাঁর পিতা উমানাথের দৃষ্টান্তে। উমানাথের সঙ্গীত জীবনের কথা পরে আসবে। এখানে শুধু বক্তব্য যে, উমানাথ প্রথম টপ্পা শেখেন গুপ্তিপাড়ার অম্বিকাচরণ নামে টপ্পাগায়কের কাছে। অম্বিকাচরণ ছিলেন বাংলার আদি টপ্পাচার্য, গুপ্তিপাড়া নিবাসী কালী মীর্জার শিষ্য। কালী মীর্জা নিধুবাবুরও ১২।১৩ বছর আগে বারাণসী থেকে টপ্পা-সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে বাংলায় ফিরেছিলেন। কালী মীর্জা এবং ইমাম বাদী দুজনের টপ্পা ধারার একই উৎস—কাশী নিবাসী শাদে খাঁ, যিনি শোরী মিঞার প্রধান শিষ্য মিঞা গাম্মুর পুত্র। সুতরাং নিজের শিক্ষা ও পিতার শিক্ষা দুদিক থেকেই নগেন্দ্রনাথ খানদানী ঘরের টপ্পা লাভ করেছিলেন।

তাঁর সঙ্গীত-জীবনের শ্রুতিস্মৃতির অনেকখানি জুড়ে আছে তাঁর চিত্তাকর্ষক টপ্পা গান।

আসরে দেড় ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা খেয়াল গানের পরে টপ্পা শুনিয়ে নগেন্দ্রনাথ মাৎ করে দিতেন শ্রোতাদের। আসরে গায়করূপে তাঁর জনপ্রিয়তা অসামান্য হয়েছিল। 'আসর-জমানো গাইয়ে' যাঁদের বলা যায় তিনি ছিলেন তা-ই। দীর্ঘ দেহ, সুপুরুষ—আসরে সৃষ্টি করতেন উপযুক্ত পরিবেশ ও অবারিত সুরের পরিমণ্ডল।

সৌম্য, সমাহিতভাবে তিনি গেয়ে যেতেন। মুদ্রাদোষের পরিবর্তে তাঁর ছিল মনোমুগ্ধকর মুদ্রা। কণ্ঠের অলঙ্কার, গানের ভাব আরও হৃদয়গ্রাহী হত তাঁর হাত ও আঙুলের নানা বঙ্কিম ইঙ্গিতে, আন্দোলনে। সঙ্গীতের সৌন্দর্য তাতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেত।

গান গেয়ে শ্রোতাদের যেমন তৃপ্তি দিতেন, তেমনি পেতেন নিজেও। আসর সজীব হয়ে থাকত তাঁর উপস্থিতিতে। নানা জায়গায় তাঁর আসরের নাম আগে করা হয়েছে। তাঁর আরও এক আসর বসত, জলসাঘরে নয়—শিকার-শিবিরে। জঙ্গলের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে তাঁর কত গানের আসর হয়েছে। তিনি নিজে ছিলেন শিকারে উৎসাহী।

তা ছাড়া, শিকারী ও শিকার-বিলাসী তাঁর সঙ্গীত সুহৃদদের উদ্‌যোগে এমন অনেক আসর বসেছে শিকারের আগে ও পরে। আকাশতলে উন্মুক্ত প্রকৃতির পটভূমিতে সে সব সময় তাঁর গানের ধারা উৎসারিত হত। শিকারের শিবির পরিণত হত সঙ্গীতের আসরে। শিকারপ্রিয় ও সঙ্গীতপ্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের সানন্দ সম্মেলনে।

রানাঘাটের পাল-চৌধুরী পরিবার ভিন্ন আর যাঁদের সঙ্গে সঙ্গীতের সূত্রে নগেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙায় মুখোপাধ্যায় পরিবারের জ্ঞানদাপ্রসন্ন এবং (ময়মনসিংহ) মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী। জ্ঞানদাপ্রসন্ন ছিলেন উঁচুদরের শিকারী এবং সেই সঙ্গে সুরবাহার বাদকও। জগৎকিশোর সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিকার বিষয়েও উৎসাহী।

তাঁদের দুজনের জন্যে, বিশেষ জ্ঞানদাপ্রসন্নের উদ্‌যোগে অনেক শিকারের শিবিরে নগেন্দ্রনাথের গানের আসর বসেছে। গারো পাহাড় অঞ্চলের শিকার শিবির থেকে এদিকে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার জঙ্গলের কাছাকাছি নানা আসর হয়েছে শিকারের উপলক্ষে। জ্ঞানদাপ্রসন্ন শিকার অভিযানে গেলে অনেক সময়েই সঙ্গীতজ্ঞদেরও নিয়ে যেতেন।

এমনিভাবে সুরবাহারবাদক মহম্মদখাঁ (জ্ঞানদাপ্রসন্নের ওস্তাদ), নগেন্দ্রনাথ, সেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে নিয়ে এবং তিনি স্বয়ং মিলে তাঁবুর মধ্যেই গড়ে তুললেন জলসাঘর। বনগাঁর দিকে পারমাদুনিয়া জঙ্গল, গাঙনা-পুরের কাছে দেবগ্রামের জঙ্গল (দেবল রাজার ভিটার প্রসিদ্ধি যেখানে), রানাঘাটের দিকে জঙ্গল সিন্দ্রাণী, মালিপোতার কাছাকাছিও তখন জঙ্গলের অভাব ছিল না—এই সব অঞ্চলে জ্ঞানদাপ্রসন্ন শিকারে আসতেন। এবং

শিকারের শিবির পড়লে সেখানে সঙ্গীতের আসর বসত না এমন হয়েছে কদাচিৎ। আর আসর বসেছে অথচ নগেন্দ্রনাথ গান করেননি এমন ঘটনাও খুব কম। এমনি করে শিকার-শিবিরেও তাঁর গান অল্প হয়নি।

সাধারণত নগেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী খেয়াল ও টপ্পা গানই গাইতেন আসরে। কিন্তু কখনও কখনও বাংলা টপ্পাও গাইতেন। তখন নিধুবাবু কিংবা মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে পিতা উমানাথ ভট্টাচার্যের কিংবা নিজের রচনাও শোনাতেন তিনি। তিনি গান কিছু কিছু লিখতেন এবং তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এককালে সে সব গান শোনা যেত।

নগেন্দ্রনাথের গান রচনার দুটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হল—

১ ॥ ভীমপলশ্রী। মধ্যমান

লাগিল নয়নে, কি ক্ষণে মনে,
নবীন কিশোর সুন্দর ওই সে যমুনা পুলিনে ॥
পদে পদে আরোপিয়ে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হিলায়ে
ইন্দীবর নিন্দিয়ে নীল বরণ,
আরো তাহে আঁখি শর সন্ধানে ॥
আর তো গৃহে যাওয়া হল না,
বুঝি কুল রহে মুরলি শুনে।
চলিতে চরণ বাধে চরণে ॥

১ ॥ ভৈরবী

কে বলে তারিণী তোমার কালো বরণী,
অনুপমা রূপ শ্যামা ভুবন মোহিনী (জগৎ জননী)।
নইলে কেন ত্রিলোচন, করেন পরম যতন,
সতত সাধিছেন তোমার (ঐ রাঙা) চরণ দুখানি।

সঙ্গীতরচনার বিষয়ে তাঁর পিতা উমানাথের নাম যে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর উত্তরাধিকার স্বরূপ নরেন্দ্রনাথ অনেক কিছু লাভ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভাও এই সূত্রে পাওয়া। উমানাথের প্রধান পরিচয় হল, তিনি সেকালের বাংলার একজন বিখ্যাত কথক। তা ছাড়া তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক এবং গান রচয়িতা। সেকালের কথকরা সকলেই অল্পবিস্তর গানের চর্চা করতেন। কারণ কথকতার অঙ্গ ছিল গান।

কিন্তু উমানাথ ছিলেন তার চেয়ে কিছু বেশী! তিনি একজন শিক্ষিতপটু

গায়ক ছিলেন এবং অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতের চর্চা রীতিমতোভাবে করেছিলেন। পরে জীবনের বৃত্তি হিসেবে কথকতা অবলম্বন করেন, কিন্তু সঙ্গীতচর্চা পরিত্যাগ করেননি কোনো দিনই। এবং নগেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে ১৭।১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন উমানাথের অন্য দুই পুত্রেরও সঙ্গীতশিক্ষা পত্তন পিতার কাছে। বলা যায়, উমানাথের দৃষ্টান্তেই পরিবারে সঙ্গীতচর্চা প্রচলন হয়। তাঁর পূর্বপুরুষ পর্য্যন্ত এঁরা এ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন মালিপোতা গ্রামের পণ্ডিত বংশ বলে।

রানাঘাট থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে (রানাঘাট-বনগ্রাম শাখায় গাঙনাপুর স্টেশনের কাছে) মালিপোতা গ্রামে এই পরিবারের পৈত্রিক নিবাস। ভট্টাচার্য তাঁদের উপাধি ছিল, কুল পদবী চট্টোপাধ্যায়।

উমানাথের পিতা গৌরীনাথ পর্যন্ত এই বংশের নৈয়ায়িক পণ্ডিত রূপে খ্যাতি ছিল। সেই সঙ্গে গৌরীনাথ কথকতার চর্চা প্রথম আরম্ভ করেন। গানের চর্চাও তিনি কিছু কিছু করেছিলেন বটে, তবে সঙ্গীতের ধারা রীতিমতো আরম্ভ হয় উমানাথের সময় থেকে।

বাল্যকাল থেকেই উমানাথ সুকণ্ঠ। অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে তিনি নদীয়া পাহাড়পুরে মাতামহের কাছে যখন বাস করতেন, তখন তিনি একদিন চূর্নি নদীর ধারে বসে আপন মনে গান গাইছিলেন। এমন সময় নদীতে বজরা ভাসিয়ে চলেছিলেন উত্তরবঙ্গের কোনো বর্ধিষ্ণু জমিদার।

উমানাথের কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি বজরা থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। তারপর তাঁর মাতামহের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর শিক্ষার সব দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান উত্তরবঙ্গে। প্রায় ৭।৮ বছর সেখানে থেকে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে উমানাথ ধ্রুপদ গানও শিক্ষা করেন কলাবতের অধীনে।

তারপর তিনি উত্তর বাংলা থেকে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার কাছে চলে আসেন। এখানকার নন্দীগ্রাম আমগাছিয়া অঞ্চলে ক'বছর বাস করবার সময় তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার আর এক পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। তিনি রীতিমতো টপ্পা চর্চার সুযোগ লাভ করেন এখানে।

আগে থেকেই গুপ্তিপাড়া অঞ্চলে হিন্দুস্থানী টপ্পা অনুশীলনের একটি ধারা বর্তমান ছিল। বাংলার এক আদি টপ্পাচার্য, কালী মীর্জা নামে সঙ্গীতজগতে

সুপরিচিত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গুপ্তিপাড়ার সন্তান। ১০৷১১ বছর ধরে কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ইত্যাদি অঞ্চলে বাস করে তিনি টপ্পা সঙ্গীতে কৃতবিদ্য হন। তারপর ফিরে এসে গুপ্তিপাড়ায় বাস করেন কয়েক বছর।

সেই সময় তাঁর প্রভাবে এ অঞ্চলে হিন্দুস্থানী টপ্পাচর্চা আরম্ভ হয় এবং তাঁর কয়েকজন শিষ্যও এখানে হয়েছিলেন। কালী মীর্জার সেই শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম অম্বিকাচরণ। অম্বিকাচরণের পদবী কি ছিল তা অজ্ঞাত, তবে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথা জানা গেছে।

উমানাথ উক্ত অম্বিকাচরণের কাছেই শিক্ষা করেন টপ্পা। এমনিভাবে কালী মীর্জার (যাঁর রাগবিদ্যার এক শিষ্য হয়েছিলেন স্বনামধন্য যুগপুরুষ রামমোহন রায়) টপ্পা সম্পদের উত্তরাধিকার উমানাথ কিছু পরিমাণে লাভ করেন।

তা ছাড়া, সমসাময়িক কালের বাংলার টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও উমানাথের যোগাযোগ ছিল, মনে হয়। কারণ উমানাথের গান সংগ্রহের খাতায় মহেশচন্দ্র রচিত কয়েকটি বাংলা টপ্পা দেখা যায়।

এই পর্যন্ত উমানাথের সঙ্গীতশিক্ষার কথা। উত্তর-জীবনে তিনি কথকতাতেই আত্মনিয়োগ এবং তখনকার বাংলার একজন খ্যাতনামা কথকরূপে জীবনে সাফল্য অর্জন করেন। যশের সঙ্গে অনেক বিষয়সম্পত্তি করে মালিপোতায় নিজের বিরাট বাড়িতে বাস করতে থাকেন অতি সম্পন্ন গৃহস্থের মতোন।

বাংলার অনেক অঞ্চলে এবং বিহারেও কোনো কোনো জায়গায় উমানাথের কথকতার আসর হত। সেকালের বাংলার কথকতাপ্রিয় এমন কোনো জমিদার পরিবার প্রায় ছিলেন না যেখানে উমানাথের কথকতা হয়নি। কথকতার মধ্যে মধ্যে তাঁর মাধুর্যময় কণ্ঠে ধ্রুপদাঙ্গ কিংবা টপ্পা অঙ্গের গান অতি আকর্ষণের বস্তু ছিল তাঁর শ্রোতাদের কাছে।

এইভাবে কথক বৃত্তিধারী হয়েও উমানাথ সঙ্গীতের চর্চা বরাবর বজায় রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, পুত্রদের নিজে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়ে পণ্ডিত বংশকে রূপান্তরিত করেন সাঙ্গীতিক পরিবারে।

উমানাথ নিজে গান রচনাও করতেন, কথকতার পালা রচনার সঙ্গে এবং তা ছাড়াও তাঁর রচিত গান পরে তাঁর পুত্র নগেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আসরে

পাইতেন। উমানাথের লেখা দু'টি গান এখানে দেওয়া হল। প্রথমটি ধ্রুপদাঙ্গের।

মূলতান। চৌতাল

রাম নব দুর্বাদল শ্যাম তাড়কানাশন নিখিল সুকৃতধন,
কাম নির্বাণ-ধাম সম যাম সব ॥
সীতানাথ অনাথনাথ ভরব পূর্বজাত কুশ লব তাত,
দশরথতনয় নিরূপম যশোরব ॥
অখিল জগত-বন্ধো, করুণাময় গুণসিন্ধো,
তব শরণাগত বিজয় হৃদয় তিমির হর ॥
দূরিত ভাব রাবণাদ্য নিশাচর গণনাশন,
তারণ কারণ জানকী মনো রভসে রাঘব ॥

গৌরী। কাওয়ালী

শিবশঙ্কর বম্ বম্ ভোলানাথ,
কৈলাস শিখরপতি বৃষভাসনে গতি,
পাগল চঞ্চলমতি গায়ে বাঘছাল।
ছাই ভস্ম মাখা গায় শ্মশানে নেচে বেড়ায়,
ভাঙ্গ্ ধূতুরা খায় গলে হাড় মালা ॥
বিষপানে ত্রিনয়ন ঢুলু ঢুলু সর্বক্ষণ,
শিরে জটা ফণীগণ ডরে যে গিরিবালা ॥
নন্দী ভৃঙ্গী দুই পাশে কভু রোষে, কভু হাসে,
কভু ঘোর উল্লাসে, দেখে পঞ্চভূতের খেলা ॥

উমানাথের গান রচনা-শক্তি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺নগেন্দ্রনাথও লাভ করেছিলেন।

উমানাথ সঙ্গীতের চর্চা নিজে যেমন বজায় রেখেছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর মালিপোতার বাড়িতে নামী কলাবতদের আসা-যাওয়া ছিল, অনেকের আসরও বসেছে। এ সম্পর্কে নাম পাওয়া যায় বড়ে দুন্নি খাঁ, শ্রীজান বাঈ, আহম্মদ খাঁ প্রভৃতি গুণীর। খেয়াল গায়ক আহম্মদ খাঁ একবার এ বাড়িতে এসে মাস তিনেক ছিলেন। কথকথার সূত্রে রানাঘাটের পাল-চৌধুরী বংশীয়দের সঙ্গে উমানাথের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। তাঁদের জলসাঘর থেকেও

তাঁর বাড়িতে অনেক ওস্তাদদের আগমন ঘটেছে।

এমনিভাবে তাঁদের পরিবারে উমানাথ সৃষ্টি করেছিলেন সঙ্গীতের পরিবেশ। নিজের তিন পুত্রকে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দেন কয়েক বছর ধরে। তাঁদের মধ্যে প্রতিভাবান নগেন্দ্রনাথ সবচেয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করে বৃহত্তর সঙ্গীত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পান। তা ছাড়া উমানাথের কনিষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ তাঁর কম্বু কণ্ঠের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন এ অঞ্চলে।...

নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষার কথা বলবার আগে, তাঁর আগেকার রানাঘাটের সঙ্গীত চর্চায় আরো কজনের নাম উল্লেখ করা উচিত। উমানাথের সমকালে রানাঘাটের দুজন খ্যাতিমান গায়ক হলেন মথুর চক্রবর্তী ও জগদীশ চক্রবর্তী। তাঁদের মধ্যে মথুর চক্রবর্তী ছিলেন ধ্রুপদী এবং রাজা শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের নিযুক্ত সভা-গায়ক। জগদীশ চক্রবর্তী খেয়াল-গায়ক এবং তিনিও পূর্বোক্তের মতোন রানাঘাটের বাইরে সঙ্গীতজীবনের অধিকাংশই কাটিয়ে ছিলেন। জগদীশ প্রায় শেষ বয়সে রানাঘাটে অবসর জীবন যাপন করতে আসেন। তবে তিনি যে অতি গুণী ছিলেন তার একটি প্রমাণ এই যে, শ্রীজান বাঈ তখন রানাঘাটে মুজরো করতে এলে প্রণাম করে যেতেন জগদীশবাবুকে।...

নগেন্দ্রনাথ পিতার কাছে অল্প বয়স থেকে ধ্রুপদ ও ধামার শিক্ষা করেন এবং কিছু টপ্পাও। ১১।১২ বছর বয়স থেকে উমানাথের সঙ্গে তাঁর অনেক কথকতার আসরে উপস্থিত থাকতেন। এইভাবে তাঁর পিতার দৃষ্টান্তে কথকতাতেও জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে বেশি আত্মনিয়োগ করতেন না। সঙ্গীতই তাঁর চিরদিনের প্রিয় সাধন।

বাল্যকাল থেকে পিতার সঙ্গে কথকতার আসরে আসরে নানা জায়গায় যাতায়াতের ফলে নগেন্দ্রনাথের অনেক বিশিষ্ট পরিবারে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।

পরবর্তী জীবনে যে সব বিখ্যাত বাড়ির আসরে নগেন্দ্রনাথের গান বেশি হয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পিতার সময় থেকে। যেমন রানাঘাটের পাল-চৌধুরী, উলা ও গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায়-ভবন, ত্রিপুরার দরবার ইত্যাদি।...

পিতার কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার পর নগেন্দ্রনাথ কয়েকজন ভারতবিখ্যাত কলাবতের কাছে শেখবার সুযোগ পান। রানাঘাটের পাল-চৌধুরীদের

পৃষ্ঠপোষকতার কথা নিবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকতে পারে। বলতে গেলে এত বেশি পশ্চিমী গুণীর কাছে খুব কম বাঙালী শিখেছিলেন সেযুগে। তিনি যে এমন দিকপাল গায়ক হয়েছিলেন আর ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি চার রীতির সঙ্গীতেই যে তাঁর ভাণ্ডার এত ঐশ্বর্যময় হয়েছিল, তার মূলে ছিল এই বহুমুখী শিক্ষার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আপন পারিবারিক পরিবেশ থেকে আরম্ভ করে সেকালের ক'টি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ভবনের কল্যাণে এত গুণীসঙ্গ তিনি লাভ করেছিলেন।

পৈত্রিক বাড়িতে ওস্তাদ সংসর্গ প্রথম জীবন থেকেই ঘটেছিল তাঁর। তা ছাড়া মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরীদের এবং উলা (বীরনগর) ও গোবরডাঙার দু'টি মুখোপাধ্যায় ভবন থেকেও তিনি নানা গুণীর কাছে ভালভাবে শিক্ষার সুযোগ পান।

তা ছাড়া আরও নানা সূত্রে বিভিন্ন কলাবতের শিক্ষা লাভ করেন তিনি। যাঁদের কাছে তাঁর রীতিমতোভাবে শেখা সম্ভব হয় পিতার অধীনে শেখার পরে, তাঁরা হলেন—বন্নে খাঁ, আহম্মদ খাঁ, যদু ভট্ট, ইমাম বাদী, বড়ে দুন্নি খাঁ ও শ্রীজান বাঈ। তাঁদের মধ্যে তিনি বেশি তালিম পান বন্নে খাঁ (খেয়াল ও তেলেনা) ও আহম্মদ খাঁর (খেয়াল) কাছে। তারপর শ্রীজান বাঈ, ইমাম বাদী ও যদু ভট্টের কাছে।

যদু ভট্টের সঙ্গ তিনি পেয়েছিলেন ত্রিপুরায়, যেখানে যদু ভট্ট জীবনের শেষ ছ'টি বছর দরবারী গায়করূপে অবস্থান করেন। সেই ছ'বছর ত্রিপুরায় যদু ভট্টের কাছে তিনি অনেক সময়েই শিখেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন যদু ভট্টের শিক্ষণ আর কেউ পাননি এমনভাবে। ধ্রুপদ গানে যদু ভট্টের শিষ্য একমাত্র তাঁকেই বলা যায়।

শ্রীজান বাঈয়ের কাছে ঠুংরি শিক্ষার সুযোগ নগেন্দ্রনাথ পান রানাঘাটের পাল-চৌধুরী ভবনে, উলার মুখোপাধ্যায় পরিবারের আসরে এবং মুক্তাগাছাতেও। শ্রীজানের কাছে অবশ্য তিনি শুধু ঠুংরিই শেখেননি, খেয়ালও পেয়েছিলেন প্রচুর। দীর্ঘকাল ধরে এই শিক্ষার সূত্রে যাতায়াতের জন্যে শ্রীজানের সঙ্গে সঙ্গীতিক যোগাযোগ তাঁর বিশেষভাবে হয়েছিল। শ্রীজান নগেন্দ্রনাথের এমন গুণগ্রাহী হন যে, তাঁকে কলকাতায় সঙ্গীতসমাজে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্যে অনেকবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কথাতেও সম্মত হননি নগেন্দ্রনাথ। আহমদ খাঁ ও বড়ে দুন্নি খাঁকে

বেশির ভাগ রানাঘাটেই তিনি পেয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনের কাছেই তিনি তালিম পান খেয়ালের, শেষোক্তের কাছে টপ্পারও।

বারাণসীর মহারাজার সভাগায়িকা ইমাম বাদীর (ইনি মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবারেও এক সময় ছিলেন, শোনা যায়) কাজেই নগেন্দ্রনাথ টপ্পা শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। সেই সুবাদে ওস্তাদ রমজান খাঁর সঙ্গে তাঁর একটি প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।

রমজান খাঁ দীর্ঘকাল কলকাতায় বাস করবার সময় নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বহুবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে নানা আসরে। রমজানকে তিনি রানাঘাটের আসরে গাইতেও নিয়ে গেছেন। দীর্ঘদিনের সংস্রবে রমজান খাঁর কাছ থেকে পরোক্ষেও কিছু টপ্পা সঞ্চিত হয়েছে তাঁর ভাণ্ডারে।

তাছাড়া, সেকালের বাংলার শ্রেষ্ঠ টপ্পাগুণী মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পিতার সময় থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। উমানাথের কাছে মহেশচন্দ্র আসতেন নগেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা থেকে। বয়োকনিষ্ঠ মহেশচন্দ্রের সঙ্গে অনেককাল যাবৎ উমানাথের একটি হার্দিক-সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল। উমানাথ ও নগেন্দ্রনাথ দু-জনেরই গান সংগ্রহের খাতায় মহেশচন্দ্র রচিত কয়েকটি টপ্পা গান পাওয়া গেছে। মহেশচন্দ্রের অনেক গানের আসর হয়েছে উমানাথের গৃহে। পিতার প্রীতির পাত্র এবং নিজের বয়োজ্যেষ্ঠ মহেশচন্দ্রের কাছেও নগেন্দ্রনাথ এমনিভাবে টপ্পা সঙ্গীত লাভ করেছিলেন।

সেই সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও উল্লিখিত সঙ্গীতপ্রেমী পরিবারগুলির উচ্চাঙ্গের আসরে অন্যান্য কলাবতদের সঙ্গীতচর্চা থেকেও যে সঙ্গীত বিষয়ে উপকৃত হন, তা অনুমান করা যায়।

এমনিভাবে গঠিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবন।

সম্পূর্ণ অপেশাদার থেকে আমৃত্যু সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে তিনি নিয়োজিত রাখেন। উমানাথের সময়ে ও দৃষ্টান্তে পরিবারে যে সঙ্গীত-চর্চার পত্তন হয়েছিল, নগেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তা লাভ করে পরিপূর্ণতা।

নগেন্দ্রনাথ বাড়ির প্রায় সকলকে সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়ে রীতিমতো সঙ্গীতজ্ঞ পরিবার গঠন করেন (তাঁর অনাত্মীয় শিষ্য-মণ্ডলীর কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে)। তাঁর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতার কাছে সঙ্গীত-চর্চা করলেও নির্দেশাদি পান জ্যেষ্ঠের কাছেও। তারপর তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি প্রথম থেকেই শিক্ষা দিয়ে গায়ক করে তোলেন। দৌহিত্র সৌরেশও তাঁর

সঙ্গীত-শিষ্য। দৌহিত্রী-পুত্র শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ও কিশোর বয়সে নগেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছেন। এমন কি নিজের এক কন্যা এবং দুই দৌহিত্রী-কন্যাকেও নগেন্দ্রনাথ গান শিখিয়েছিলেন যা সেকালের স্থানীয় অঞ্চলে প্রায় অভাবিত ছিল।

নগেন্দ্রনাথের প্রভাবে এ বংশে সঙ্গীতচর্চার জন্যে তখন এমন খ্যাতি হয় যে, আগেকার আমলে পণ্ডিত বংশ বলে যে মালিপোতার ভট্টাচার্য পরিবারের পরিচয় ছিল, এ অঞ্চলের সাধারণ লোক সে কথা ভুলে গিয়ে গানের জন্যেই মনে রাখে এই ভট্টাচার্য উপাধির বংশটিকে।

ভট্চার্য বাড়ির সবাই গাইয়ে—সেসব দিনে স্থানীয় অঞ্চলের লোকদের মনে এই ধারণা জন্মে যায়। এ বাড়ির গানের আসর বন্ধ থাকত কদাচিৎ।

ভট্টাচার্য মশায়ের এই পারিবারিক সঙ্গীতচর্চা ও পরিবেশের একটি সুফল —শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। কিছু পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি কৈশোরে নগেন্দ্র-নাথের (ভট্টাচার্য) কাছে শেখেন এবং আগে নগেন্দ্রনাথ দত্তের শিষ্য প্রসঙ্গেও শিবকুমারের নাম উল্লিখিত হয়। কিশোরকালে স্বয়ং আচার্যের কাছে শিক্ষার সুযোগ পান শিবকুমার। পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে অনেক গান শেখেন এবং সেই সাঙ্গীতিক আবহের মধ্যে বর্ধিত হন। তা ছাড়া দত্ত নগেন্দ্রনাথেরও শিক্ষালাভ করেন তিনি একই সঙ্গীত ধারায়। তারপর উত্তররাধিকার সূত্রে নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সমগ্র লিখিত সঙ্গীত-সংগ্রহও তিনি লাভ করেন। এজন্যে ভট্টাচার্য মশায়ের খেয়াল টপ্পার ঐতিহ্যের এক সার্থক উত্তর-সাধক বলা চলে শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে।...

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, নগেন্দ্রনাথের পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ এ বংশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গায়ক হন। তাঁর মতোন অসাধারণ দরাজ গলা সচরাচর শোনা যেত না সেকালে। সে জন্যে স্থানীয় অঞ্চলে তিনি অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার কাছাকাছি অঞ্চলে প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাঁর অনেক আসর মাৎ করবার চমকপ্রদ কাহিনী। ভাওয়াল দরবারেও সত্যেন্দ্রনাথের গান অনেক বার হয়েছে। সেখানে পশ্চিমা গুণীদের সঙ্গে বসে হিন্দুস্থানী গান শুনিয়েছেন তিনি সমান মর্যাদায়। ভাওয়াল দরবারে তাঁর গানের প্রাইভেট রেকর্ড হয়েছিল, কিন্তু সেসবের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথ জি শার্পে গান গাইতেন। এত উচ্চ গ্রামে বাঁধে ছিল তাঁর

ভরাট কণ্ঠ। অনেক সময় তারা গ্রামের পঞ্চমে সুরকে স্থায়ী করে তিনি তান কারী করতেন। (লয়েও এমনি সিদ্ধ ছিলেন যে অনেক তবলচীকে নাকাল হতে হয়েছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতে বসে)।

সেকালের নিস্তব্ধ পল্লীতে কোনো রাতের আসরে তিনি যখন গাইতেন, পাশের গ্রাম থেকে সহজেই তাঁর গান শোনা যেত। নদীপথে যদি গান গাইতে গাইতে নৌকায় আসতেন (এরকম সময়েও তিনি প্রাণের আরামে গান গাইতেন, সঙ্গীত তাঁর এমন অভিন্নসত্তা ছিল যে গান না গাওয়া অবস্থায় তিনি খুব কমই থাকতেন।)—মাইল খানেক দূর থেকে ভেসে আসত তাঁর গানের সুর। আর সকলেই বুঝতে পারত, সত্যেন্দ্রনাথ নৌকায় দূর থেকে আসছেন। তিনি উপস্থিত হবার অনেক আগে থেকে এসে পৌঁছে যেত তাঁর অতি দরাজ গলার সুর।

একবার তিনি যশোর থেকে ফিরছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ ও গুণমুগ্ধ বন্ধু ক্যাপ্টেন সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (কৃতী চিকিৎসক) বাড়ি গিয়েছিলেন, যেমন যেতেন মাঝে মাঝেই। সেখানে গেলেই সত্যেন্দ্রনাথের গানের আসর হত। কাছাকাছি অন্য জায়গায় হলেও সুরেন্দ্রনাথ যেতেন তাঁর গান শুনতে। পারতপক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের গানের আসর তিনি বাদ দিতেন না।

এদিনেও সুরেন্দ্রনাথের ওখানে গান গেয়ে তিনি ফিরেছিলেন নৌকায়। বনগাঁ থেকে ইছামতী নদীতে আসছিলেন। মালিপোতায় নয়, ইছামতীর ধারে ঘাটবাঁওড় গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়ি, সেখানে।

আগে থাকতে খবর দেওয়া ছিল না যে, আসছেন। তবে সেজন্যে কিছু আসে-যায়নি। সেকালের শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের অভ্যর্থনা, আদরযত্ন সদা-প্রস্তুত। অসুবিধার কথা এই তাঁর মনে হয়েছিল যে, ফিরতে ফিরতে রাত তখন অনেক হয়ে গেছে। কন্‌কনে শীতের রাত, তাও একটা বেজে গেছে ঘাটবাঁওড়ে পৌঁছবার অনেক আগেই। সে বাড়িতে পৌঁছতে দুটো বেজে যাবে নির্ঘাৎ। এত রাত্রে এই অন্ধকারে দরজা ঠেলাঠেলি করে তাঁদের জাগাবেন। তাঁরা খাওয়াবার জন্যে নিশ্চয় তখন রান্নার আয়োজন, ইত্যাদি করবেন। বড়ই কষ্ট দেওয়া হবে—এই সব ভেবে সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন মনে মনে। কিন্তু কোনো উপায় নেই, রাত যতই হোক যেতে হবে, মালিপোতায় ফেরা এখন আরও অসুবিধা।

এই সব কথা মাঝে মাঝে ভাবছিলেন বটে, কিন্তু যথারীতি গানও

গাইছিলেন নৌকোয় বসে। তারপর গ্রামের ঘাটে এসে নৌকো থেকে নেবে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছলেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। সেই দু-প্রহর রাতে বাড়িতে আলো জ্বলছে। আর সকলেই তখনও জেগে।

সত্যেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি, এত রাত্রেও আপনারা ঘুমোননি? আমি ভাবছিলাম, দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে আপনাদের তুলতে হবে।

—না। আমরা সব জেগেই আছি। এখন এস, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। খেতে বসবে চল, না হলে খাবার জুড়িয়ে যাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ আরও আশ্চর্য হলেন।—এত রাতেও খাবার গরম তৈরি আছে?

—আমরা ঘণ্টা খানেক আগে থেকে তোমার গান শুনেছিলাম। তখনই রান্নার যোগাড় করা হয়। আমরাও সেই জন্যেই জেগে আছি, যাতে তুমি আসামাত্র সব দেওয়া যায়।

জামাতা তখন ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন।

এমনি সব ঘটনা তাঁর সঙ্গীতজীবনকে ঘিরে আছে।

আসরে তিনি সাধারণত হিন্দুস্থানী গান গাইলেও, বাংলা টপ্পা গানও শোনাতেন অনুরুদ্ধ হলে। কলকাতার কয়েকটি আসরেও তাঁর গুণপনার পরিচয় শ্রোতারা পেয়েছেন। দেশে থাকতেই ভালবাসতেন আর সেখানে গান গেয়েই একরকম কাটিয়ে যান জীবন। গলা যেমন দরাজ ছিল, তেমনি অফুরন্ত দম। যে কোনো আসরে ৪/৫ ঘণ্টা এক দমে অক্লেশে গেয়ে যেতে পারতেন। বাড়িতে তো কথাই নেই। যে রাত্রে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয় হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে, সেদিনও সন্ধ্যার পর বসে চার ঘণ্টারও বেশি গান গেয়েছিলেন এবং তাও মৃত্যুর মাত্র আড়াই ঘণ্টা আগে। মালিপোতার বাড়ির পূজার দালানে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত সচরাচর যেমন গাইতেন, সেদিনও তেমনি গেয়েছিলেন—তবে কেউ জানত না যে সেই তাঁর শেষ গান।

তিনি মালিপোতার আদি বাড়িতেই থাকতেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বেশির ভাগ বাস করেন রানাঘাটের বাসা বাড়িতে, মিড্‌ল রোডে। সেজন্যে নগেন্দ্রনাথ রানাঘাট নিবাসী বলেই সকলের সুপরিচিত হন এবং তাঁর সঙ্গীতসাধনা ও শিষ্য গঠনের ফলে রানাঘাটও সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে সেকালে বিখ্যাত

হয়। রানাঘাটে খেয়াল ও টপ্পা চর্চায় যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রধানত শিল্পী তথা আচার্য নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে।

বৃহৎ শিষ্য-সমাজ নিয়ে পরিণত বয়সে নগেন্দ্রনাথ রানাঘাটে স্বয়ং একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের তুল্য হয়েছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে কেন্দ্র করে 'নগেন্দ্র সঙ্গীত পরিষদ্' নামে একটি সঙ্গীত সম্মিলনী স্থাপন করেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ। সে পরিষদ্ উচ্চশ্রেণীর আসরে আসরে প্রাণবন্ত হত। তিনি জীবিত থাকতে পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন ওস্তাদ বাদল খাঁ ওস্তাদ রমজান খাঁ, ধ্রুপদাচার্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরবাহার-শিল্পী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, সঙ্গীতরত্ন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গুণী।

এসব নগেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবনের শেষ পর্বের কথা। প্রায় অন্তিমকাল পর্যন্ত নিজে সঙ্গীতচর্চা ও ছাত্রদের সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে তাঁর কোনো ছেদ পড়েনি। সঙ্গীতের পরিবেশের মধ্যে তিনি থাকতে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি তা সৃষ্টি করে নেবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর। সেই জন্যে নিজের সমগ্র পরিবারকে পরিণত করেছিলেন সঙ্গীতসেবী মণ্ডলীতে।

পুত্র সন্তান ছিল না, তাই ভ্রাতুষ্পুত্রদের ও দৌহিত্রকে পুত্রস্নেহে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়ে গেছেন। সঙ্গীত তাঁর সমগ্র সত্তা কিরকম অধিকার করে রেখেছিল, তার পরিচয় ফুটে উঠতে ছোটখাট ব্যাপারেও। বাড়ির শিশুদের আদর করতেন, তাও তাঁর নিজস্ব সুরে ও ভঙ্গীতে। দুই বলিষ্ঠ হাতে নিয়ে শিশুদের লোফালুফি করতেন তবলার বোলের তালে তালে : তেরেকেটে ধেন ধেনা ধেন ধেনে ধা, তেরেকেটে তেন্ তেনা তেন্ ধেনে ধা ইত্যাদি।

শেষ জীবনে দু'টি শোক পেলেন এবং তা-ই তাঁর মৃত্যুর কারণ হল। কিন্তু সে শোকও পুরো ব্যক্তিগত নয়, সঙ্গীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। প্রিয় দৌহিত্র সৌরেশকে পরম স্নেহে উদীয়মান গায়ক করে গড়ে তুলছিলেন। তার অকাল-মৃত্যুতে পেলেন কঠিন আঘাত। বলেছিলেন—বুকের একটা ফুসফুস গেল। তার কিছুদিনের মধ্যেই প্রিয়তম শিষ্য ও শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক পদ্মবাবু মাত্র ৪২ বছর বয়সে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে প্রাণ হারালেন।

পদ্মবাবুকে যখন আচার্যের বাড়ির সামনে দিয়ে শেষ যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হল, দোতলার জানলায় গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে দেখলেন তিনি। তারপর

বললেন—আর একটা ফুসফুসও গেল। এবার আমিও যাব।

সেই রাত থেকেই শয্যা নিলেন নগেন্দ্রনাথ। তারপর ঠিক এক সপ্তা পরে অনন্ত সুরলোকে প্রয়াণ করলেন।...

তাঁর মহাযাত্রাও আচার্যের উপযুক্ত হয়েছিল এবং তা বলবার মতোন। মৃত্যুর পরেই মুখে মুখে রানাঘাটে রটে যায় যে, শিষ্যের শোকে ভটচায্ মশায় পরলোকে চলে গেলেন। ব্যাপারটা অনেকের কাছেই অতি আশ্চর্য বোধ হল। নগেন্দ্রনাথের শিষ্য-সেবকের সংখ্যাও কম নয় রানাঘাটে। তাঁর মৃত্যু সংবাদে অনেকেই উপস্থিত হলেন তাঁর বাড়িতে, শ্মশান যাত্রার জন্যে। /

রানাঘাটের সঙ্গীতপ্রিয় মহলে হাহাকার পড়ে গেছে। এক সপ্তাহ আগে পদ্মবাবু আর আজ গেলেন নগেন্দ্রনাথ। তাও আবার একই দিনে। সর্বমান্য আচার্যের যোগ্য শেষ যাত্রার আয়োজন করা হল।

চার ক্রোশেরও বেশি দূরে গৌরনগর শ্মশান, গঙ্গার ধারে। চূর্নি নদীর ওপর দিয়ে জলপথে যেতে হবে চাকদা। সেখানকারই শ্মশানের নাম গৌর-নগর। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে শিষ্য, অনুরাগীরাও অনেকে যাবেন। যেতে অনেকটা সময় লাগবে, তবু খবর পেয়ে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা।

তারপর বড বড কয়েকখানি নৌকো ভর্তি করে সকলে নগেন্দ্রনাথের দেহ নিয়ে যাত্রা করলেন চূর্নিতে।

শিষ্য সেবকদের মধ্যে স্থির হয়, সমস্ত পথটা গান করতে হবে। সারা জীবন সঙ্গীতচর্চাই ছিল যাঁর প্রাণের আরাম, সঙ্গীতের সাধনা ভিন্ন যাঁর অন্য কোনো লক্ষ্য কোনোদিন ছিল না, শিষ্যদের যিনি প্রাণ ঢেলে দান করে গেছেন এই বিদ্যা, তাঁর অন্তিমযাত্রা কি সাধারণ কোনো মানুষের মতোন হতে পারে, তাঁর এত শিষ্য থাকতে ?

আচার্যের নশ্বর শরীর ঘিরে নৌকোয় আছেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই।

নৌকো চলবার সঙ্গে গানও আরম্ভ হল। প্রথম দু-একজন গাইবার পরই ধরলেন ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ।

গাইতে লাগলেন একটার পর একটা ভট্টাচার্য মশায়েরই গাওয়া সব গান। আর সে কি গান সত্যেন্দ্রনাথের ! দরাজ, ভরাট গলার কথা শুধু নয়। এমন মরমী আবেগে তিনি গেয়ে বললেন যে তাঁর এক একটি গান শেষ হবার পর অন্য কেউ গান ধরার কথা চিন্তাও করলেন না। এমন কি দত্ত মশায়ও না।

সে এক অপূর্ব পরিমণ্ডল সৃষ্টি হল সঙ্গীতের। তাঁর কম্বু কণ্ঠে নদী আর আকাশ ভরে উঠেছে। নৌকো যেখানে দিয়ে চলেছে তার দুধারে গানে আকৃষ্ট হয়ে এসেছে জনতা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছে সেই গান—যতক্ষণ শোনা যায় মুক্ত আকাশের হাওয়ায়। সুরের যেন এক অতীন্দ্রিয় স্পর্শ!

অনেক দিনের রুদ্ধ আবেগ আজ সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গানের সুরে ফুটে উঠল। তার কারণ এই—দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ জ্যেঠামশায়কে সঙ্কোচে কখনো সামনে বসে গান শোনাতে পারেননি। তাঁর অজ্ঞান্তে নগেন্দ্রনাথ দু-একবার তাঁর গান শুনে যদিও মন্তব্য করেন 'সত্য এত সুন্দর গায়?' তবু সঙ্কোচ কাটেনি। অতি সমীহ করবার জন্যে গান শিখতে পর্যন্ত পারতেন না জ্যেঠামশায়ের কাছে! গানের ঘরের বাইরে দালানে থেকে, পাশের ঘরে বসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন জ্যেঠামশায়ের গান শুনেছেন। ক্বচিৎ শিখেছেন এক-আধটি গান কিংবা কোনো গানের অংশ। নিয়মিত শিখেছেন নগেন্দ্রনাথের হাতে গড়া প্রমথনাথ আর পদ্মবাবুর কাছে। ইচ্ছা হত, নগেন্দ্রনাথ তাঁর গান শোনেন, কিন্তু তাঁকে রীতিমতো শোনাবার সঙ্কোচ কিছুতেই কাটাতে পারেননি।

সেই আক্ষেপ আজ মিটিল অনন্ত পথের যাত্রীর পাশে বসে গানের পর গান শুনিয়ে। যেন তাঁর অন্তরাত্মা বলে উঠেছিল—আপনাকে কোনোদিন সামনে বসে শোনাবার সুযোগ পাইনি। আজ শেষ গান শোনাব।

গৌরনগর পর্যন্ত সমস্ত পথ এমনি আকুল হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ গান গেয়ে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে শুনলেন সকলে।

যাত্রাশেষে তাঁর গানও শেষ হল।

দত্ত মশায় তখন তাঁকে বললেন—আজ তোমার গান শুনে মনে হল, এতকাল আমরা তাঁকে বোধ হয় তৃপ্তি দিতে পারিনি, এক পদ্ম ছাড়া। আজ পদ্মর অভাব তুমি মেটালে। আজকের গান কান্নার গান। এ ভাব তোমার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। এমন গান আজ আমরা কেউ গাইতে পারতুম না।...

॥ নৃত্যের ছন্দে বিকশিত শতদল ॥

আজ থেকে একশ বছর আগেকার কথা। তখনকার দরবারী মজলিসের এক আশ্চর্য ঘটনা—সঙ্গীতের আসরে নৃত্যের অপরূপ ছন্দ-সৃষ্টির অভিজ্ঞতা।

নটী এসেছিলেন দিল্লী থেকে, বর্ধমান-রাজ মহাতপচাঁদের দরবারে। পশ্চিমের নর্তকী এ আসরে নতুন নয়। অনেক নাচের মজলিস এখানে হয়ে গেছে। কমনীয় তনুলতার বিচিত্র ভঙ্গে কত ছন্দিত হিল্লোল; কত মুখ-বিলাস; আঁখির ভাষায়, ভ্রূ-ভঙ্গিতে, কর-মুদ্রায় কত লাস্যময় ভাব প্রদর্শন; চরণাঘাতে কত জটিল তাললয়ের কারুকর্ম।

কিন্তু এ যেন এক অজানা অসম্ভবের সাধনা। নটীর নৃত্যধারায় আসরের সকলে যখন মুগ্ধ, তখন ছন্দ-সৃষ্টি হয়ে চলেছে অভাবিত পথে, আর-এক রীতিতে। চরণের চকিত বিক্ষেপে এমন বিভ্রম জাগাতে এখানে আর ক'জন আগে দেখেছে?

বাঈজী নাচের অনেক আগেই চাঞ্চল্য এনেছিলেন দরবারে। যেমন করে তিনি আসর সাজাবার ফরমায়েশ করেছিলেন, তাও মহাতপচাঁদ ও অনেকের কাছেই নতুন ঠেকেছিল।

বাঈজী যখন বলে পাঠালেন, 'আসর সাজিয়ে রাখতে হবে কিংখাবের চাদরের নীচে……'

কিন্তু সেসব বর্ণনা আরম্ভ করবার আগে আরও কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া দরকার তা হলে গল্পের সঙ্গে সেকালের সঙ্গীত-জগতেরও কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক কথা জানা যাবে। সেজন্যে শুধু মহাতপচাঁদের নয়, তাঁর দরবারী গায়ক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় আর করুণাময়ী দেবীর প্রসঙ্গও আসবে। তখনকার বাংলার একজন উৎকৃষ্ট গীতরচয়িতা আর বিখ্যাত গায়ক রমাপতি। আর সে-যুগের বর্ধমান রাজ-দরবারের পরিবেশ।

মহাতপচাঁদের কথায় প্রতাপচাঁদের নামও এসে যায়। প্রতাপচাঁদ কিংবা 'জাল প্রতাপচাঁদ'। কারণ তিনি যদি বর্ধমান রাজ্যের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় না নিতেন আর ভাবী গদীদার হয়ে থাকতেন, তা হলে মহারাজা তেজচাঁদ দত্তক নিতেন না মহাতপচাঁদকে। প্রতাপচাঁদের যদি 'মৃত্যু' কিংবা নিরুদ্দেশ না ঘটত, কিংবা তার পনর বছর পরে সেই মামলার রায় যদি অন্যরকম হত, তা হলে বর্ধমানেও কেউ মহাতপচাঁদকে [illegible]ন করে চিনতে পারত না।

সেসব অবশ্য এই বাঈজীর নাচের আসরের অনেক বছর আগেকার কথা।

তখন মহারাজা তেজচাঁদের আমল। আর কুমার হলেন প্রতাপচাঁদ। সেই প্রতাপচাঁদের ৩০ বছর বয়সে 'মৃত্যু' হ'ল, কিংবা তিনি 'নিরুদ্দেশ' হলেন। সে এক রহস্যময় ব্যাপার এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার কিছু আভাস

দিয়েছেন তাঁর সুখপাঠ্য 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থে। তার ১৫ বছর পরে বর্ধমানে ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যার ফলে প্রথমে বর্ধমানে, তারপর সারা দেশে রীতিমতো আলোড়নের সৃষ্টি হল। বর্ধমানের কেউ কেউ দেখতে পেলে—প্রতাপচাঁদ আবার ফিরে এসেছেন! তেজচাঁদ তার আগেই মহাতপচাঁদকে দত্তক নিয়েছিলেন রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে, যদিও তখনও তিনি সাবালক হননি। এখন এই আগন্তুককে নিয়ে চমকপ্রদ মকদ্দমা আরম্ভ হল, প্রায় একশ' বছর পরের বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যসীর মামলার মতোন। দু'টি মামলাই প্রায় এক ধরনের এবং দেশে একই রকমের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল এই দু'টি মামলা উপলক্ষ্যে। প্রভেদ হল ফলাফলে। ভাওয়াল সন্ন্যাসী আইনত জয়ী হয়ে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার স্বীকৃত হন, কিন্তু বর্ধমান মকদ্দমার নায়ক 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রতিপন্ন হলেন আইনের চোখে। তবে সে প্রতাপচাঁদ আসল কি নকল এ বিষয়ে তখনকার বিষ্ণুপুরের রাজা আর বর্ধমানের নানা লোকের মনোভাব কি ছিল, প্রতাপচাঁদের দুই রানীর অন্যরকম সাক্ষ্য দেবার কারণ কি হতে পারে, 'জাল প্রতাপচাঁদে'র বিপক্ষে কোনো প্রবল স্বার্থ সক্রিয় ছিল কি না—ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এ কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন। সে বৃত্তান্ত আমাদের প্রসঙ্গে অবান্তর। এ মামলার উল্লেখ শুধু এইজন্যে করা করা হল যে, 'জাল প্রতাপচাঁদে'র ঘটনার আট বছর পরে মহাতপচাঁদ বর্ধমান রাজ্য লাভ করলেন।

সে যা হোক, মহাতপচাঁদ নির্গুণ ধনী ছিলেন না, নানা সদ্‌গুণে সংস্কৃতিবান ছিলেন তিনি। শুধু বিদ্যোৎসাহী বা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক নন, বাংলাভাষায় অনেক গানও তিনি রচনা করেন। বাংলা দেশে বর্ধমান রাজবংশের আদি-পুরুষ সঙ্গম রায় পাঞ্জাব থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন বটে, কিন্তু পুরুষানুক্রমে বাংলায় বাস করে তাঁরা পরে অনেকখানি বাঙালীর মতোন হয়ে যান, বাংলাভাষাকেও নেন আপন করে। মহাতপচাঁদও বাংলাভাষাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতেন। সাহিত্য আর বিদ্যাচর্চা তাঁর এত প্রিয় ছিল যে তিনি ব্যাসদেবের সম্পূর্ণ মহাভারত বাংলায় অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মতোন। এই মহৎ কাজের জন্যে বিরাট আয়োজন ও প্রচুর অর্থব্যয় করেন মহাতপচাঁদ। দরবারের সভাপণ্ডিত তারকানাথ তর্করত্নকে তত্ত্বাবধায়ক করে পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ

অনুবাদ তিনি করিয়েছিলেন। তবে এই মহাগ্রন্থ সব খণ্ড প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেননি, পর্বে পর্বে অনূদিত এই মহাভারত প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় মহাতপচাঁদের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে, ১৮৮৪ খ্রীঃ।

তাঁর বাংলা গান রচনার কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর গান অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বাংলা গানের আসরে। স্বরচিত গানের দুটি বইও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

বাংলা গানের যত সংকলনগ্রন্থ আছে তার মধ্যে মহাতপচাঁদের গান স্থান পেয়েছে। যেমন, 'বাঙালীর গান,' 'সঙ্গীতকোষ', 'প্রীতিগীতি,' 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' ইত্যাদি। তাঁর গানের সম্পর্কে 'প্রীতিগীতি' সম্পাদক লিখেছেন, 'মহারাজাধিরাজ মহাতপচন্দ্রের রচিত সুমধুর গানগুলি এখনও খুব প্রচলিত।' একথা বলা হয় তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পরে।

মহাতপচাঁদের দরবার ছিল জ্ঞানী-গুণীদের মিলনসভা। সঙ্গীতজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে নানা বিদ্বান ব্যক্তিরা তখনকার বর্ধমানের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। মহাতপচাঁদের দরবারে এক উজ্জ্বল রত্ন হলেন রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। রমাপতি যেমন উচ্চশ্রেণীর গায়ক, তেমনি গীতরচয়িতা। যে নৃত্যের আসরের উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে, সেখানে রমাপতির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সঙ্গীতজ্ঞরূপে নয়, দরবারী আসরের আদবকায়দা, রীতিনীতি জানা রইস্ লোক হিসেবে তাঁর ওপরে মহাতপচাঁদ কতখানি আস্থা রাখতেন, তা জানা যাবে সে আসরের বিবরণ থেকে।

রমাপতির সঙ্গীতজীবনে অনেক কথা আছে যা' জানবার মতোন। তার কিছু কিছু উল্লেখ করবার আগে তাঁর লেখা গানের বিষয়ে একটি গল্প বলে নেওয়া যাক।

বর্ধমান রাজসভায় থাকবার সময় রমাপতি বেশির ভাগ স্বরচিত গানই গাইতেন, সেজন্য মহাতপচাঁদ তাঁর অনেক গান ভাল করে জানতেন। অনেক সময় তাঁর ফরমাশেও গান রচনা করতেন রমাপতি। তাঁর গান সে সময় এত জনপ্রিয় হয় যে, কখনো কখনো অন্য গায়কেরা তাঁর রচিত গান নিজের বলে আসরে গেয়ে দিতেন। এমনি এক ঘটনা বর্ধমানেই ঘটেছিল একদিন।

বর্ধমানে রাজবাড়িতে সেদিন গান শোনাতে এসেছিলেন সেকালের বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা ও গায়ক গোবিন্দ অধিকারী। তাঁর 'কৃষ্ণ বিদায়' যাত্রা-গান সে সময় সারা বাংলায় অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। 'কৃষ্ণ বিদায়' পালায়

তিনি স্বয়ং দূতী সেজে গান গেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন শ্রোতাদের। যাত্রা-গানের আসর থেকে তাঁর এত উপার্জন হত যে, তিনি একাধিক জমিদারী কিনে ফেলেছিলেন।

সেই গোবিন্দ অধিকারী মহাতপচাঁদের আসরে সেদিন গাইতে আরম্ভ করলেন 'কাল রূপে গেল সকল' গানখানি। অতি চমৎকার গান, কিন্তু এটি অধিকারী মশায়ের রচনা নয়। ভক্তাবলী রাগে কাওয়ালী তালে রমাপতি গানটি গঠিত করেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ অধিকারী গানটিতে নিজের ভনিতা দিয়ে গাইতে লাগলেন আসর মাৎ করে—

কাল রূপে গেল সকল,
হরিল কুলমান বঙ্কিম নয়নে,
বাঁশীর গানে হইল প্রাণ আকুল।
চরণে চরণ অঙ্গ হেলাইয়া বামে,
প্রতি অঙ্গে মোহিত করিছে কামে,
ইচ্ছা হয় ত্রিভঙ্গ ললিত ধামে
বান্ধা থাকি চিরকাল ॥
আ মরি কিবা পীত বসন,
হয়েছে অঙ্গের শোভা মনোলোভা,
তার আবরণে নব ঘনে যেন তড়িৎ আভা ;
এ রূপে কুল বাঁচাব কিরূপে,
মজিলে মন পড়িব বিরূপে।...
মিলাইলে বিধি নিরবধি পাইব শ্যামনিধি,
কুলেতে কি কাজ তব হইয়া গো কুলবতী,
যদি হন্ অনুকূল এ ব্রজপতি মিলে দ্রুতগতি,
ভনয়ে রমাপতি যাবে না কুল গোকুল।

আগাগোড়া গানখানি গোবিন্দ অধিকারী গেয়ে গেলেন, শুধু 'ভনয়ে রমাপতি'র বদলে নিজের ভনিতা যোগ করে', যেন এ গান তাঁরই রচিত।

কিন্তু মহাতপচাঁদের বিলক্ষণ জানা ছিল, গানটি কার রচনা। রমাপতিও তখন সে আসরে তাঁর কাছেই বসেছিলেন, অধিকারী মশায় হয়ত তা লক্ষ্য করেননি।

মহাতপচাঁদ গোবিন্দ অধিকারীর চাতুরি বুঝতে পেরে গান শেষ হতেই

তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অধিকারী মশায়, এই গানটি আজ তিন-চার বছর ধরে আমার এই সভায় চলে আসছে। আমি অনেকবার ও গান শুনেছি। এটি কে বেঁধেছেন বলুন তো ?'

গোবিন্দ অধিকারী সচেতন হয়ে উঠে বুঝতে পারলেন, মহারাজ ব্যাপারটি ধরে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রমাপতির দিকে দৃষ্টি পড়ল তাঁর, আগে তাঁর বিষয়ে অতটা খেয়াল করেননি। বুদ্ধিমান লোক, তাই চট্ করে স্থির করে নিলেন ত্রুটি স্বীকার ছাড়া গত্যন্তর নেই। এবং তা' করলেন নাটকীয় ভঙ্গিতে। রমাপতির সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আবার গানখানি গোড়া থেকে গাইলেন, রমাপতির ভনিতা দিয়ে।

এবারের গান শেষ হতে মহাতপচাঁদ গোবিন্দ অধিকারীকে আন্তরিক সাধুবাদ জানালেন। সেই সঙ্গে পুরস্কৃত বোধ করলেন রমাপতিও।

রমাপতির গানে যে তাঁর নামের ভনিতা থাকত সেকথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন। রমাপতি কলকাতাতেও অনেকদিন বাস করে এখানকার সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত হয়েছিলেন গায়ক ও গীতরচয়িতা বলে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও তিনি কিছুদিন ছিলেন এবং সম্ভবত আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। যখন তিনি ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন, তখনকার কথা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে এইরকম পাওয়া যায়—'তখন বড় বড় গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হইত। জ্যোতিবাবুর তিনজনকে স্পষ্ট মনে আছে : রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদু ভট্ট। রমাপতি নিজে একজন ভাল গায়ক তো ছিলেনই, উপরন্তু তিনি নিজেও অনেক ভাল গান রচনা করিয়াছিলেন ; তাঁহার গানের শেষে "রমাপতি ভণে" বলিয়া ভণিতা থাকিত।'

বাংলার রাগ-সঙ্গীতচর্চায় রমাপতির নাম আরো এক কারণে স্মরণীয়। তা হল তানসেন প্রমুখ ধ্রুপদ-রচয়িতাদের হিন্দীগানের আদর্শে ও অনুকরণে বাংলায় গান রচনা করে পুস্তক প্রণয়ন। তাঁর সেই 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' বইটি (১৮৬৩ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে কলকাতায় প্রকাশিত) নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বলে এখানে তার একটু পরিচয় দেওয়া হল। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, টপ্পা ইত্যাদি রীতির গান অবলম্বনে অবিকল মূল রাগ তাল ও ছন্দে বাংলা গান রচনা করে রমাপতি সন্নিবিষ্ট করেন এই গ্রন্থে। এর নামকরণও লক্ষণীয়। বাংলা রাগ-

সঙ্গীতের মূল আদর্শ যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, নামকরণের মধ্যে যেন রচয়িতা এই কথাই বলেছেন।

গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক ভূমিকায় রমাপতি লিখেছেন, 'নানাস্থানীয় বহুবিধ গুণিগণের নিকট হইতে বহু পর্যটন ও বহু পরিশ্রমে বহুকালাবধি স্বীয় ব্যবসায়িক বিদ্যার অতিরিক্ত সঙ্গীতবিদ্যা কিঞ্চিৎ উপার্জন করিয়াছি, তন্মধ্যে, নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য গান সকল ভাঙ্গিয়া তদনুরূপ বঙ্গভাষায় নানাপ্রকার অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয় সাকারবাদী ইত্যাদি যথোচিত ভাবে বিরচিত ও তদ্ব্যতীত ভবানীর আগমন্যাদি, রাস ও ঝুলন প্রভৃতি পর্বের সাময়িক বর্ণন এবং টপ্পা ও গজল ইত্যাদি উত্তম উত্তম মন্তব্য সুরে নানাপ্রকার প্রবন্ধে প্রণীত করা হইয়াছে'... ইত্যাদি। এই ভূমিকার পরে লেখক একটি করে মূল হিন্দী (ব্রজভাষা) গান এবং তার সঙ্গে তারই অনুকরণে রচিত বাংলা গান দিয়েছেন। কোনো কোনো মূল গানের আদর্শে রচনা করেছেন তিন-চারটি গানও।

গানগুলির মধ্যে প্রথমে আছে তানসেনের একটি ধ্রুপদ। সেই গান ও তার অনুকরণে রমাপতি রচিত গানটি এখানে উদ্‌ধৃত করে দেওয়া হল :

রাগ ভৈরোঁ—তাল চৌতাল

লম্বোদর গজ আনন গিরিজাসুত গণেশ,
এক রদন প্রসন্ন বদন অরুণ বেশ ॥
নর নারীগণ গন্ধর্ব কিন্নর যশ
তোম্বর মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু আরত পূজয়ত মহেশ।
অষ্ট সিদ্ধ নব নিধ মুষক বাহন,
বিদ্যাবরেকো সুমেরু ত শীষ ॥
তানসেনকো অস্তুতি করতঃ ভজো
রম্ভারূপ ত্রিরূপ রূপ স্বরূপ আদেশ ॥

ঐ সুরের অবিকল গান—

নিরাকার জগতাধার
বিধাতা জগৎপাতা গতি মুক্তিদাতা
নিত্য নিয়ন্তা নিরাকার ॥
সর্বব্যাপী জনবন্দিত নিশ্চল অদ্বিতীয়
নির্মল সর্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম সারাৎসার।

বইখানিতে এমনি অনেক হিন্দী গান ও তাদের অনুকরণে রচিত বাংলা গানের সঙ্গে রমাপতির স্বরচিত গীতাবলীও আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে যেমন দেখা গেছে, রমাপতি গীতরচয়িতা রূপে সুপরিচিত ছিলেন বাংলা দেশে। তাঁর রচিত বাংলা ও হিন্দী গান শুধু তাঁর সমকালে নয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও বিশেষ আদরের বস্তু ছিল বাংলার সঙ্গীতের আসরে। বাংলা গানের নানা সংকলন-গ্রন্থেও সেজন্যে তাঁর গান অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

গান রচনার সঙ্গে রমাপতি ছিলেন একজন শিক্ষিত-পটু গায়ক। সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা যেন সহজাত ছিল। পিতা গঙ্গাবিষ্ণু ছিলেন খ্যাতিমান পাখোয়াজী, ধ্রুপদী এবং গীত-রচয়িতা। পিতামহ রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সুগায়ক ও ভক্তিগীতির রচয়িতা রূপে প্রসিদ্ধি ছিল।

এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার হলেন মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা-নিবাসী। বাংলা দেশের যে ক'টি অঞ্চল সেকালে সঙ্গীতচর্চার জন্যে খ্যাতিলাভ করে, চন্দ্রকোণা তার মধ্যে একটি। সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই সঙ্গীত-কেন্দ্রের আর একজন স্বনামধন্য সন্তান।

রমাপতির পিতৃ-পিতামহের সময় থেকে তাঁদের পরিবারে যে সঙ্গীতের আবহ ছিল, তিনি আশৈশব তার মধ্যেই মানুষ হন। তাঁর প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষাও আরম্ভ হয় বালক বয়সে এবং পিতারই কাছে। পিতা গঙ্গাবিষ্ণু উত্তর ভারতের নানা জায়গায় হিন্দুস্থানী গুণীদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করে চন্দ্রকোণায় ফিরে আসেন এবং সঙ্গীতজগতে আত্মনিয়োগ করেন। আগে তিনি ছিলেন কাঁথির নিমক-মহলের দেওয়ান, কিন্তু সঙ্গীত তাঁর সমগ্র সত্তা এমনভাবে অধিকার করে যে তিনি নিমক মহলের দেওয়ানী ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীতকেই জীবনের অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন। ধ্রুপদ সাধনার সঙ্গে তিনি যেমন পাখোয়াজের চর্চা তেমনি গীত রচনাও করতেন।

রমাপতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। সঙ্গীতপ্রতিভা যে সহজাত ছিল, একথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর ছেলেবেলায় তিনি কিভাবে পিতার কাছে প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন তা' বলতে গেলে গল্পের মতোন শোনাবে, কিন্তু ঘটনাটি সত্যি।

তাঁর (রমাপতির) তখন সাত, আট বছর বয়স। সেদিন বিকালে

গঙ্গাবিষ্ণু রেওয়াজে বসেছিলেন এবং একটি কঠিন রাগের আলাপ করছিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ঠিক যেমনটি চান তেমনটি করে যেন গাইতে পারছিলেন না তিনি। রাগ ভুল হচ্ছিল না বটে, কিন্তু গেয়ে যেন পুরো তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। খানিকক্ষণ এইভাবে রাগালাপ করবার পর তিনি তানপুরা রেখে উঠে গেলেন সন্ধ্যাহ্নিক করতে।

একটু পরে আহ্নিক করতে বসেছেন, এমন সময় হঠাৎ শুনলেন কে তাঁর সেই সুর অবিকল নকল করে গাইতে আরম্ভ করেছে। আর শুনে আশ্চর্য হলেন যে, এই গায়কের সুর অনেকটাই তাঁর মতোন হয়েছে, যেমন তিনি গাইছিলেন কিছুক্ষণ আগে। ভাবলেন, কোনো শিষ্য হয়ত এসে আগে শেখানো রাগটি এখন গাইছে। রমাপতির কথা তাঁর মনে স্থান পায়নি, কারণ তাকে কখনও গান গাইতে তিনি শোনেননি।

তাই পুজোপাঠ শেষ করে বাইরের ঘরের সামনে এসে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। দরজার আড়াল থেকে দেখলেন, কঠিন রাগের আলাপ করছে রমাপতি।

বিস্মিত আনন্দে তিনি ঘরের মধ্যে এলেন। তাঁকে দেখে ভয়ে রমাপতি তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে যাচ্ছিল, গঙ্গাবিষ্ণু তাকে ধরে ফেললেন। আদর করে অভয় দিয়ে আবার গাইতে বসালেন তাকে।

তারপর থেকে রমাপতিকে তিনি নিজে রীতিমতো সঙ্গীতশিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। এমনিভাবে পিতার স্নেহে-যত্নে রমাপতির সঙ্গীতচর্চা এগিয়ে চলল। পাঁচ-ছ বছর ধরে তাঁকে নিজের সঞ্চিত বিদ্যা দান করতে লাগলেন গঙ্গাবিষ্ণু।

রমাপতির যখন ১৩।১৪ বছর বয়স, তখন পশ্চিম অঞ্চল থেকে দু'জন ওস্তাদ এসে তাঁদের বাড়িতে অনেকদিন থেকে যান। তাঁরা হলেন মহম্মদ বক্স ও আসমৎ উল্লা। এই দুই ওস্তাদের কাছে রমাপতি নিয়মিতভাবে পাঁচবছর গান শিখলেন।

তা ছাড়া, আরও অনেক বড় বড় গায়ক তাঁদের বাড়ি মাঝে মাঝে আসতেন, পাখোয়াজী গঙ্গাবিষ্ণুর সঙ্গতে গাইবার জন্যে। চন্দ্রকোণার এই দেওয়ান বাড়িতে নিয়মিত ধ্রুপদের আসর বসত আর বাইরে থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের কাছেও রমাপতি এই বয়স থেকেই কিছু না কিছু শিখে নিতেন। মেধাবী, মধুকণ্ঠ বলে তিনি গায়কদের প্রিয়পাত্র হতেন আর

সুবিধা হত তাঁদের কাছে সঙ্গীতের পাঠ নেবার। এইভাবে ওস্তাদ বৈদ্যনাথ দুবে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রভৃতির কাছেও রমাপতি কিছু কিছু গান শিখেছিলেন।

নিয়মিত সঙ্গীতচর্চার সময় থেকে প্রথম যৌবনকালেই তিনি গান রচনাও আরম্ভ করেছিলেন জানা যায়। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। পরে বর্ধমান দরবারে থাকবার সময়ে তাঁর এই গুণটি বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে। মহারাজ মহাতপচাঁদ তাঁকে যে-কোনো বিষয় নিয়ে গান বাঁধতে ফরমায়েশ করতেন এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তা করে দিতেন। গান রচনার অভ্যাসও তাঁর কম বয়েস থেকেই প্রকাশ পায়। এবিষয়ে পিতারও দৃষ্টান্ত ছিল, তা ছাড়া সেকালের অনেক বাঙালী গায়কই ছিলেন গান-রচয়িতা। গান রচনার বিষয়ে রমাপতির এমন ক্ষমতা ছিল যে, প্রথম জীবনে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে চাকরি করতে গিয়ে উড়িয়া ভাষা শেখেন আর আর উড়িয়া ভাষাতেও উচ্চাঙ্গের গান রচনা করেন।

ময়ূরভঞ্জের কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে রমাপতি নিজেদের বাড়ির বৈঠকখানায় গানের একটি আখড়া বসালেন। এখানে সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন শিষ্যদের। গায়ক হিসেবে তখন তাঁর নাম বেশ ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্রমে বর্ধমান রাজের কানেও তাঁর নামডাকের কথা পৌঁছল। রমাপতি কাজ পেলেন বর্ধমানের রাজ-সেরেস্তায়। সে কাজ একটা উপলক্ষ্য। আসলে সঙ্গীত-গুণের জন্যেই তাঁর সেখানে কাজ হল। শোনা যায়, মহাতপচাঁদ তাঁকে হাতি পাঠিয়ে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে আনাবার ব্যবস্থা করেন বর্ধমানে।

বর্ধমানের কাজে যোগ দেবার আগে রমাপতি বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর পত্নী করুণাময়ী ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। করুণাময়ীর মাতুল ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং তাঁর কাছে করুণাময়ী বিদ্যাশিক্ষা করেন। মাতুল করুণাময়ীর বিদ্যানুরাগ, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির জন্যে তাঁকে বলতেন 'সরস্বতী'। তাঁর কাছে করুণাময়ী সংস্কৃত ও বাংলা ভালভাবে শিখেছিলেন। বিদুষী করুণাময়ীর রীতিমতো রচনাশক্তি ছিল, সংস্কৃত ও বাংলা দু'টি ভাষাতেই কাব্য রচনা করতেন তিনি।

উপরন্তু করুণাময়ী সঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন, যে-গুণ সেকালে ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে প্রায় ছিল না, বলা যায়। তিনি অনেক গান লিখেছিলেন—তাঁর কয়েকটি গান 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' পুস্তকেও আছে—এবং গানও গাইতেন, অবশ্য

প্রকাশ্যে নয়, বাড়ির মধ্যে। এদিক থেকে তাঁরা ছিলেন আদর্শ সঙ্গীতজ্ঞ দম্পতি। স্বামী-স্ত্রীর এমন একত্র সঙ্গীতচর্চার দৃষ্টান্ত সেযুগে আর বিশেষ পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে তিনি আদর্শ গৃহিণীও ছিলেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো থেকে আরম্ভ করে সাংসারিক কাজকর্ম যেমন করতেন, তেমনি টোট্‌কা চিকিৎসা ইত্যাদিও জানতেন বিলক্ষণ। তাঁর সঙ্গীতচর্চার মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল। কারণ তিনি শুধু গায়িকা ছিলেন না, সেতার যন্ত্রেও তাঁর হাত ছিল। তা' ছাড়া, এখন শুনলে অদ্ভুত মনে হবে, তিনি ঘরে পাখোয়াজও বাজাতেন স্বামীর গানের সঙ্গে। অন্য কোনো বাঙালী মহিলার বিষয়ে এসব কথা শোনা যায় না।

তাঁরা, স্বামী-স্ত্রী, যে অনেক সময় একসঙ্গে সঙ্গীতচর্চা করতেন, গান রচনার মধ্যে দিয়েও তা প্রকাশ পেত। গান লেখার বিষয়ে যেমন সহযোগিতা তেমনি ভাবের আদান-প্রদানও ঘটত দুজনের! কোনো সময় হয়ত রমাপতির লেখা গানের বিপরীত ভাব নিয়ে গান রচনা করতেন করুণাময়ী। রমাপতি মানব-জীবনের অনিত্যতা নিয়ে গান লিখে শোনালেন। তাঁর উত্তর-স্বরূপ করুণাময়ীর গান হল—সন্তান-জন্ম উপলক্ষ্যে।

তাঁদের দুজনের এমনিভাবে গান রচনার একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হল। রমাপতি লিখলেন :

বেহাগ—একতালা

সখি শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।
শর্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
ঐ দেখ সখি আভাহীন তারা,
নীলকান্ত-মণি হল জ্যোতিঃহারা,
তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল॥
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ক-কিরণ,
উষার প্রভায় হল সংকীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃ সমীরণ,
কুসুমেরি হার শুখাল—
শিখী সুখে রব করিছে শাখায়,

পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়,
পতির বিচ্ছেদে উন্মাদিনী প্রায়,
কুমুদিনী হাস্য-বদন লুকাল ॥
বিহঙ্গমগণ করে উদ্বোধন,
বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ বেদন বুঝি
বিধি ঘটাল—
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়,
এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়,
দেখ বৃক্ষচয় হল অশ্রুময়,
শর্বরী সুখবিলাস ফুরাল ॥

তখন করুণাময়ী রাধার এই তীব্র বিরহে যেন কাতর হয়ে মিলনের গান রচনা করে গাইলেন, ওই বেহাগ রাগে একতালায় :

সখি শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পূরিল মধু ঝঙ্কারে,
কোকিলের সুরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্নে নাচিছে বামাঙ্গ,
সুন্দর করিছে অপাঙ্গ অঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে মাতিল ॥
মলয় অনিল প্রলয় রহিত,
বিহরে বিরহে প্রণয় সহিত,
সহসা হইতে অহিত রহিত,
তারে কে শিখাল,—
এই হতেছিল চাতকের ধ্বনি,
জলদে জলদে বলিয়া অমনি,
আজি বুঝি তারা
দুঃখের রজনী সজনী পোহাইল ॥
ফলিল তাহার আশা তরুবর,
হেরিয়ে নবীন নীল জলধর,

আশাংশু চকোর, সুধাংশু কিঙ্কর,
বিধিকৃত জালে বিধুরে পাইল।
ব্যথিতা করুণা সকরুণে কয়,
নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তাই দুঃখান্তে সুখের উদয়,
বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাইল॥

এই দু'টি গানে কবি ও গীতশিল্পী দম্পতি একসূত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা জানানো দরকার যে, করুণাময়ী রচিত এই গানটি 'সঙ্গীত কোষ,' 'গীত-রত্নাবলী' ইত্যাদি সংকলন-গ্রন্থে ভুল করে মুদ্রিত হয়েছে রমাপতির রচনা বলে। কিন্তু এটি যে করুণাময়ীর সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় গানের ভনিতা লক্ষ্য করলে—'ব্যথিতা করুণা সকরুণে কয়···

করুণাময়ীর কথা এই পর্যন্ত রেখে, রমাপতির বর্ধমানের প্রসঙ্গ এবার আরম্ভ করা যাক।

রাজ-সেরেস্তায় কাজ দিলেও রমাপতিকে সঙ্গীতে গুণপনার জন্যেই মহাতপচাঁদ আসলে নিযুক্ত করেছিলেন। তাই রমাপতির প্রধান কাজ হল, মহারাজকে সঙ্গদান। তাঁকে নিত্য নতুন গান শোনানো। দরবারে গানের মজলিসে রমাপতি হলেন মধ্যমণি। মহাতপচাঁদের অতি প্রিয় পাত্র, প্রধান পার্ষদ।

এখানে প্রথমে তাঁর দিন বেশ শান্তিতে কাটতে লাগল। নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীতচর্চা ও গান রচনা করতে লাগলেন তিনি দিনের পর দিন। আর মহারাজার ইচ্ছায় অনেক সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন পার্শ্বচর হয়ে। প্রায় প্রতিদিনই তিনি নতুন নতুন গান রচনা করে শুনিয়ে মহারাজের চিত্ত বিনোদন করতেন।

কিন্তু 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ'। রাজ আশ্রয়ে বেশ কিছুদিন আরামে বাস করবার পর রমাপতি বিপাকে পড়লেন। মহারাজার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে গেল একদিন, তাঁর ওপর হঠাৎ বিরূপ হলেন মহাতপচাঁদ। সে-সব কথা বিস্তারিত বলবার দরকার নেই। শুধু এটুকু উল্লেখ করা চলে যে, রমাপতি মহারাজের চাটুকার ছিলেন না এবং তেজস্বী স্বভাবের জন্যেই তিনি মহারাজের বিরাগভাজন হলেন। কয়েকজন তোষামোদীর প্ররোচনায় রমাপতিকে তাঁর অপ্রিয় হতে হল অকারণে।

তাঁর আত্মসম্মানবোধ অতি প্রখর ছিল। তাই নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তিনি মহারাজাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করলেন না। রাজসভা ত্যাগ করে চলে এলেন। মহাতপচাঁদ তাঁকে থাকবার জন্যেও অনুরোধ করলেন না, সেরেস্তার চাকরিটিও গেল রমাপতির। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে তিনি চন্দ্রকোণায় রয়ে গেলেন সঙ্গীতচর্চায় মগ্ন হয়ে।

এইভাবে কিছুদিন কাটল।

তারপর ঘটনাচক্র আবার ঘুরে গেল অন্য দিকে। এমন একটি অভাবিত অবস্থার সৃষ্টি হল যে, মহাতপচাঁদ আবার রমাপতিকে দরবারে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন।

উপলক্ষ্য সেই দিল্লীর বাঈজী।

ভাল মুজরো দেওয়া হবে বলে বাঈজীকে আনানো হয়েছে দিল্লী থেকে। দরবারের মজলিসে তাঁর নাচ হবে। আয়োজন সব প্রস্তুত, নাচের দিন স্থির হয়েছে। কিন্তু আসর সাজাবার জন্যে বাঈজী এমন ফরমায়েশ করেছেন যে, মহারাজা তার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছেন না। দরবারের অন্যান্য পার্ষদদের কাছে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউই সাহায্য করতে পারেননি তাঁকে। কারণ, এমন কথা কেউ আগে শোনেননি।

বাঈজী বলে পাঠিয়েছেন, 'আসর সাজাতে হবে কিংখাবের চাদরের নীচে ময়দা দিয়ে।'

মহারাজা বিব্রত বোধ করলেন আর তাঁর পার্শ্বচররাও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ময়দার ওপর কি[illegible]াব বিছিয়ে দেওয়া হবে—এ কথায় মানে কি? নাচের আসরে ময়দার প্রস্তাব কেন? এমন কথা তো কখনও শোনা যায়নি! এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তাঁরা স্থির কর.ত পারলেন না।

মহারাজা অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। ময়দার রহস্যের মীমাংসা কেউ করে দিলেন না তাঁকে। একবার ভাবলেন, কারণটা বোঝা না গেলেও ময়দার ওপর কিংখাবের চাদর দেওয়া হোক। তারপর যা হয় হবে। কিন্তু তাতেও মুশকিল হল এই যে ময়দা, মাখা না শুকনো, কি থাকবে বাঈজীর আসরে? যদি ভুল করে দেওয়া হয়, তা হলেও বাঈজীর কাছে অপ্রস্তুত হতে হবে।

এইসব বিষয়ে অচিরেই স্থির করা দরকার, না হলে পশ্চিমের এই বাঈজীর চোখে দরবারের মর্যাদা থাকবে না। আর বাঈজীকে এ বিষয়ে

জিজ্ঞাসা করাও রাজবাড়ির পক্ষে অপমানকর, কারণ তাহলে নটীর ধারণা হবে যে, এ দরবার উচ্চাঙ্গের আসরের রীতিনীতি জানে না।

এমনি সঙ্কটের অবস্থায় মহারাজার মনে পড়ল রমাপতিকে। মনে হল, রমাপতির দ্বারা হয়ত এ সমস্যার সমাধান হতে পারে, কারণ তাঁর পশ্চিমী নাচের আসরের কায়দ-কানুন জানা আছে।

কিন্তু রমাপতি যখন দরবার থেকে বিদায় নিয়ে যান তখন তাঁকে থাকতে বলেননি, অন্য পার্ষদদের প্ররোচনায় তখন তাঁর ওপর বিরূপ হয়েছিলেন, এসব কথা মনে করে প্রথমে তাঁকে আমন্ত্রণ করতে সঙ্কোচ হল মহাতপচাঁদের। শেষ পর্যন্ত নিজের মর্যাদা বাঁচাবার আশায় রমাপতিকে খবর পাঠাতেই হল।

রমাপতি কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন না। সেবার চাটুকারদের কথায় তাঁর ওপর বিরূপ হয়েছিলেন, এ অভিমান তাঁর এখনও যায়নি। তাই তিনি মহারাজার লোককে ফিরিয়ে দিলেন, অনিচ্ছা জানিয়ে। কিন্তু মহাতপচাঁদ বার বার লোক পাঠাতে লাগলেন।

অবশেষে রমাপতি আর তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। দরবারে এলেন এবং শুনলেন আসর সাজাবার কথা।

সব শুনে মহাতপচাঁদকে তিনি বললেন, 'আসরে কিংখাবের নীচে শুকনো ময়দা দিয়ে মেঝে ভরাতে হবে।'

মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু এই শুকনো ময়দা কি জন্যে ?

রমাপতি জানালেন, 'নাচের শেষে তা বোঝা যাবে।'

উত্তরটা ঠিক মনঃপূত হল না মহাতপচাঁদের। রমাপতির কথার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারলেন না। সাত-পাঁচ ভেবে তিনি হুকুম দিলেন—জলসা-ঘরের অর্ধেক কিংখাবের নীচে শুকনো ময়দা আর বাকি অর্ধেকের নীচে মাখা-ময়দা দেওয়া হোক।

সেই ভাবে নাচের আসর তৈরি হল।

যথাসময়ে সাজানো আসরে নটী এলেন নৃত্য প্রদর্শন করতে। দরবারী শিষ্টাচার ইত্যাদির আদব-কায়দা যথারীতি পালিত হবার পর নর্তকী উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু নৃত্য আরম্ভ করবার আগে কিংখাবে পা টিপে টিপে দেখে নিলেন তার নীচে ময়দা কি রকম দেওয়া আছে। বুঝতে পারলেন যে, অর্ধেক জায়গায় আছে মাখা ময়দা আর অর্ধেক জায়গায় শুকনো ময়দা।

তারপর বাঈজী নাচ আরম্ভ করলেন শুকনো ময়দার ওপরকার কিংখাবের দিকে। আসরের আর একদিকে তাঁর পা একবারও পড়ল না।

মজলিসের সকলে মুগ্ধ চোখে নর্তকীর নৃত্য-ছন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। এ নৃত্যকলার প্রধান আশ্রয় হল তাল। তবলার নিপুণ সঙ্গতে অজস্র বোলের সমাবেশে তা যেমন বিধৃত, তেমনি নটীর সুপটু চরণাঘাতে ঘুঙুরের ধ্বনিতে ছন্দিত। সেই সঙ্গে দেহবল্লরীর নানা ভঙ্গীমায় বিভিন্ন অঙ্গহার। চক্ষুর সঞ্চালনে, ভ্রূভঙ্গে, মুখাবয়বে কত ভাবের প্রকাশ।

তনু-সৌন্দর্যে, সঙ্গীতের সহযোগে, ছন্দে ভাবে লাস্যে আসর উদ্বেলিত করে এক সময়ে নর্তন শেষ হল। দ্রুত আন্দোলিত দেহ-লতা স্থির অচঞ্চল করে নর্তকী এসে দাঁড়ালেন মহারাজার সামনে, কুর্নিস করে।

মহাতপচাঁদ প্রশংসা করলেন নৃত্যের। কিন্তু বাঈজীর কাছে তা' মামুলি মনে হল। তিনি যেন নিরাশ হলেন।

মহারাজকে সেলাম জানিয়ে বিরস মুখে তবল্‌চীর পাশে এসে বাঈজী জনান্তিকে বললেন, 'এখানে দেখছি সমঝ্‌দার নেই।'

রমাপতি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন মহাতপচাঁদের পাশে। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'মহারাজ, কিংখাব তুলে ফেল্‌বার হুকুম দিন।'

তাঁর কথা মতোন কিংখাব উঠিয়ে দিতেই আসরের সবাই সচকিত হয়ে দেখলেন—নটীর চরণাঘাতের ছন্দে শুভ্র চূর্ণের ওপর ফুটে উঠেছে শতদল পদ্মের নক্‌শা!

এতক্ষণে মহাতপচাঁদ ও তাঁর সভাসদদের হৃদয়ঙ্গম হল, শুকনো ময়দার প্রয়োজন কি জন্যে। সভার সকলে তখন শতমুখে নর্তকীর পটুত্বের সুখ্যাতি করতে লাগলেন।

মহারাজা রমাপতিকেও বিশেষ করে সাধুবাদ জানালেন তারপর। রমাপতির জন্যেই আজ তাঁর দরবারের সম্মান রক্ষা হল একথা তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না। এ দিনের পর থেকে তাঁদের অনেকদিনের মনোমালিন্য দূর হয়ে আবার ফিরে এল সেই হৃদ্যতার ভাব।

এখন এই যে নটীর কুশলতার কথা বলা হল—নৃত্যের তালে শতদলের চিত্ররচনা করা, তা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। এ ধরনের নাচের বিবরণ আরও পাওয়া যায়, এর দু-একটি এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মনোরম স্মৃতিকথা 'জোড়াসাঁকোর

ধারে'-র একস্থানে বলেছেন, 'দোতলায় বাবা-মশায়ের বৈঠকখানায়ও হোলির উৎসব হত। সেখানে যাবার হুকুম ছিল না। উঁকিঝুঁকি মারতাম এদিক-ওদিক থেকে। আধ হাত উঁচু আবীরের ফরাশ। তার উপরে পাতলা কাপড় বিছানো। তলা থেকে লাল আভা ফুটে বের হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব এসেছেন অনেক—অক্ষয়বাবু তানপুরা হাতে বসে, শ্যামসুন্দরও আছেন। ঘরে ফুলের ছড়াছড়ি। বাবা-মশায়ের সামনে গোলাপজলের পিচ্‌কারি, কাচের গড়গড়া, তাতে গোলাপজলের গোলাপের পাপড়ি মেশানো, নলে টান দিলেই জলে পাপড়িগুলো ওঠানামা করে। সেবার এক নাচিয়ে এল। ঘরের মাঝখানে নন্দ ফরাস এনে রাখলে মস্ত বড় একটি আলোর ডুমটি। নাচিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে গেল। নাচ শেষ হল; পায়ের তলায় একটি আলপনার পদ্ম আঁকা। নাচের তালে তালে পায়ের আঙুল দিয়ে চাদরের নীচের আবীর সরিয়ে সরিয়ে পায়ে পায়ে আল্‌পনা কেটে দিলে। অদ্ভুত সে নাচ।'

অমনি আর একটি বিবরণ দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের কন্যা উমা দেবী তাঁর 'বাবার কথা' নামে বইটিতে: 'বাঈজীকে নাচতে বলা হল। বাঈজী বললে, তার পায়ের তলায় একটা সাদা চাদর পেতে দিতে। তাই দেওয়া হল। আরম্ভ হল সে নাচ···। তবলার তালে তালে পা সরতে লাগল বাঈজীর। কি তার পায়ের ছন্দ আর গতি। পায়ের তলায় ফুটে উঠ্‌ল একটি পদ্মফুল। নাচ শেষ হল আসর সুদ্ধ লোক অবাক্ হয়ে দেখলে তার পায়ের তলায় ফুটে-ওঠা সেই পদ্ম। মহারাজা (নাটোর) মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তার নাচে···'।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বারাণসীর বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র ॥

১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাস। পশ্চিম অঞ্চলে তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মথুরবাবুর তীর্থে যাবার কথা শুনে তিনিও সঙ্গী হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন নিত্যসহচর, সেবক ভাগিনেয় হৃদয়নাথ, তাঁর 'হৃদু'।

পশ্চিমের পথে তাঁরা প্রথম তীর্থ করলেন বৈদ্যনাথ-ধামে। তারপর বারাণসীতে এলেন।

এ যাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হল যোগীবর তৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে, গঙ্গার

ধারে। মৌনী মহাযোগীকে প্রশ্ন করলেন—ঈশ্বর এক, না বহু?

তাপসের কাছে ইঙ্গিতে উত্তর পেলেন।...

বারাণসী থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সদলে প্রয়াগ দর্শনে গেলেন। তারপর মথুরা। শেষে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে পনের দিন রইলেন। তারপর সেখান থেকে আবার এলেন কাশীতে। ভারতীয় সঙ্গীতেরও এক প্রধান তীর্থ বারাণসীতে।

সঙ্গীত-তীর্থ কাশীর সঙ্গে সঙ্গীত-প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবার বিচিত্র যোগাযোগ ঘটল। সঙ্গীতক্ষেত্রের এক সাধকের সঙ্গে পরিচয় হল যুগাবতারের। রামকৃষ্ণদেবের জীবনে সঙ্গীতপ্রীতি এবং সঙ্গীতের সঙ্গে একাত্মতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বারাণসীর এই ঘটনাটি তার এক স্মরণীয় নিদর্শন। আর অনন্যও বটে। কারণ এ সঙ্গীত শুধু সুরেই সম্পূর্ণ। কথা বা কাব্যের কোনো বক্তব্য এখানে নেই—এক হিসাবে বিশুদ্ধ সঙ্গীত।

কথার ভাব কিংবা আধ্যাত্মিক আবেদন যার প্রাণ সেই সঙ্গীত যে পরমহংসদেবের কত প্রিয়, তা তাঁর জীবনী-পাঠকদের অজানা নেই। 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীতে তাঁর গানের প্রসঙ্গ অজস্র পাওয়া যায়। কত অধ্যাত্ম-বিষয়ে গান তিনি গাইতেন—কীর্তন. বাউল, শ্যামাসঙ্গীত, দেহতত্ত্ব, ভজন, রামপ্রসাদী। ভাবে বিভোর হয়ে গাইতেন যেমন,শুনতেও তেমনি ভালবাসতেন।

সঙ্গীত ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের এক পরম অঙ্গ। সঙ্গীতের আবেদনে তাঁর সমগ্র সত্তা এমনভাবে সাড়া দিত যে, সঙ্গীত-কারের ওপর তিনি গভীর আকর্ষণ বোধ করতেন। উৎকৃষ্ট গায়কের সঙ্গীত-গুণের জন্যে তাঁকে পরমা শক্তির এক বিশিষ্ট আধার জ্ঞান করতেন তিনি।

তাঁর প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দের দিকে এই গুণের জন্যই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠের মর্মস্পর্শী সঙ্গীত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণের এক আরাম ছিল, বলা যায়! গুরু-শিষ্যের যতদিনের দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বেশি ভাগেই আছে সঙ্গীত। সঙ্গীত যেন তাঁদের আধ্যাত্মিক সম্মিলনের সেতু রচনা করেছিল। নরেন্দ্রের গানে পরমহংসদেবের ভাবস্থ হবার কত দৃষ্টান্ত তাঁর লীলা-প্রসঙ্গের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ এত বেশি পাওয়া যায় যে, 'সঙ্গীত

সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' বইখানিতে তা একটি পৃথক অধ্যায়ে দিতে হয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে' নামে।

সেসব বৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায়, গান তাঁর অতীন্দ্রিয়লোকে যাত্রার বাহন স্বরূপ। গান গাওয়া কিংবা ভাল গান শোনা, এই দুই-ই ছিল তাই একই প্রক্রিয়ার এপিঠ-ওপিঠ, রূপভেদ মাত্র।

শুধু গান নয়, সঙ্গীতের অন্যান্য বিভাগও তাঁর কাছে আকর্ষণের বস্তু ছিল। কারণ যন্ত্রসঙ্গীতের সুরেও সেই অনন্ত অরূপের লীলা। ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করেই ইন্দ্রিয়ের অতীত ভাবের আস্বাদন। এখানে এমনি একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেওয়া হবে।

কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীত-প্রীতির একটি সুন্দর উদাহরণ। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আবেদনও বলা যায়। এই তীর্থযাত্রায় বারাণসীর একদিনের ঘটনা।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে থাকবার সময় একদিন বললেন, 'আমি বীণা শুনব।'

শুধু তিনি যে নিজে গান গাইতে কিংবা গান শুনতে ভালবাসতেন, তা নয়। কথাহীন সুরও ভালবাসতেন। তাই শুনতে চাইলেন বীণাবাদন। শুদ্ধ সুরের লহরী।

কাশী শুধু শিবের ক্ষেত্র নয়, সঙ্গীতেরও একটি অতি প্রাচীন ক্ষেত্র। কাশী তীর্থ যেমন প্রাচীন, তার সঙ্গীতচর্চাও তেমনি। সুদূর অতীত থেকে ভারতের যে কটি সঙ্গীতকেন্দ্র আছে তার মধ্যে কাশী একটি বিশিষ্ট। আর এখানকার সঙ্গীতের ধারায় এক প্রধান অঙ্গ হল বীণার সাধনা। সমগ্র উত্তর ভারতে সুপ্রাচীন যুগ থেকে বীণা-বাদনের এমন ঐতিহ্য আর বেশি সঙ্গীত-কেন্দ্রে দেখা যায় না।

সে সময়ের বারাণসীর সঙ্গীত ক্ষেত্রের আকাশে-বাতাসে বীণার মধুর ধ্বনি ভেসে বেড়াত। অনেক বীণ্‌কার ছিলেন তখনও। হয়ত সেকথা পরমহংসদেব শুনেছিলেন। তাই তাঁর বীণা শোনবার বড় ইচ্ছা হল।

মহেশচন্দ্র সরকারের বীণা বাজাবার খ্যাতি সে-সময় কাশীর সীমানা পার হয়ে অনেক দূর ছড়িয়েছে। বাঙালী-টোলার দিকে মদনপুরা মহল্লায় মহেশচন্দ্র সরকার। অতি গুণী বীণ্‌কার তিনি, সঙ্গীতের একজন সত্যিকার সাধক বলে সকলে তাঁর নাম জানে।

মদনপুরার এই সরকার মহাশয়রা কাশীর এক বনেদী বাঙালী পরিবার।

তখন তাঁদের তিন পুরুষ ধরে কাশীতে বাস চলছে। মহেশচন্দ্রের পিতামহ বলরাম সরকারের আমল থেকে তাঁদের বারাণসীতে বাসের পত্তন।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন বলরাম সরকার। পাটনার ইংরেজ-কুঠীর দেওয়ানী পেয়ে পাটনায় চলে আসেন। পরিবারের অনেকে থেকে যান কলকাতায়, কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে বাস করতে আসেন পাটনায়।

এখানে অনেকদিন দেওয়ানীর কাজ করে অর্থ আর প্রতিষ্ঠা অর্জন করে বলরামের ইচ্ছা হল শেষজীবন কাশীবাস করতে। কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে তিনি কাশীধামে এলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রইলেন কলকাতায়।

বলরাম সরকার যখন বারাণসীতে বাসের পত্তন করলেন, তা শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গের প্রায় ৬০ বছর আগেকার কথা। সেই প্রথম থেকেই সরকারদের মদনপুরায় নিবাস। বলরাম কাশীধামে এসেই এই মহল্লায় বিষয় সম্পত্তি কেনেন, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে বসবাস আরম্ভ করেন।

রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র মহেশচন্দ্রের জন্ম কাশীতে। খিদিরপুরের ভূ-কৈলাস-রাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বারাণসীতে যে স্কুল স্থাপন করেছিলেন, সেখানেই মহেশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু লেখাপড়ার চেয়ে সঙ্গীতের ওপর তাঁর বেশি আকর্ষণ দেখা যায় বালক বয়স থেকেই। তাঁর পিতাও সঙ্গীতচর্চা করতেন, সেতার বাজাতেন। সেজন্যে মহেশচন্দ্রের অনুরাগ দেখে তার অল্প বয়সেই সেতার শেখাতে আরম্ভ করেন বাড়িতে।

মহেশচন্দ্রের সেতার শিক্ষা যেমন ভালভাবে এগিয়ে যেতে লাগল, লেখাপড়া তেমন অগ্রসর হল না। ক্রমে সঙ্গীতচর্চাই প্রায় অধিকার করে বসল সেই তরুণের মন-প্রাণ। পিতা তখন তাঁকে বড় ওস্তাদের কাছে রীতিমতো শেখাবার ব্যবস্থা করলেন।

তখন কাশীর এক বিখ্যাত সেতারী ও বীণ্‌কার ছিলেন গণেশ বাজপেয়ীজী। তাঁর কাছে মহেশচন্দ্র তালিম নিতে আরম্ভ করলেন—প্রথমে সেতার ও পরে বীণায়। শেষে সেতার ছেড়ে দিয়ে বীণা যন্ত্রে নিরলস সাধনায় মগ্ন হলেন।

তাঁর যথার্থ পরিচয় হ'ল বীণ্‌কার-রূপে। তখনকার ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কলাবতদের সঙ্গে এক আসরে বসে বীণাতেই তিনি সঙ্গীত পরিবেশন

করতেন। উত্তর ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বীণ্‌কার হিসাবে সঙ্গীত-সমাজে স্বীকৃত হন মহেশচন্দ্র।

তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার কথায় আরো একটু যোগ করে দেবার আছে। গণেশ বাজপেয়ী-জী তাঁর প্রধান সঙ্গীত গুরু হলেও আরো দু-একজনের কাছে কিছু কিছু শিখেছিলেন বা উপকৃত হন সঙ্গীত বিষয়ে। যেমন, তানসেনের পুত্রবংশীয় বলে সুপরিচিত, রবাববাদক ও বীণ্‌কার সাদিক আলী খাঁ। সমসাময়িক সঙ্গীত-জগতের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ সাদিক আলী খাঁও কাশীনিবাসী ছিলেন। তাঁর এবং তাঁদের বংশীর নিসার আলী খাঁ (সুরশৃঙ্গার-বাদক) প্রভৃতির সঙ্গে করেও সঙ্গীতবিষয়ে লাভবান হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র।

অত বড় গুণী হয়েও কিন্তু তিনি সে-যুগের বেশির ভাগ বাঙালী সঙ্গীতাচার্যদের মতন শৌখীন অর্থাৎ অপেশাদার ছিলেন। সঙ্গীতের বেসাতি করেননি কখনো। বরং সঙ্গীতের শখ মেটাতে মুক্তহস্তে খরচ করে যেতেন। সঙ্গীত ক্ষেত্রে যখন একজন আচার্যস্থানীয় বলে মান্য হতেন, তখনো নিজেকে সঙ্গীতের এক সেবকই জ্ঞান করতেন তিনি। তাই সেবার ভাব ও শখ চরিতার্থ করতে অকাতরে ব্যয় করতেন।

ব্যক্তি-জীবনেও শৌখীন ছিলেন খুব। তাঁর সুশ্রী এবং ব্যায়ামে সুগঠিত দেহটিকে উৎকৃষ্ট পোশাকে, প্রসাধনে সযত্নে রাখতেন। এত দামী আতর ব্যবহার করতেন যে, মদনপুরার গলি দিয়ে হেঁটে যাবার খানিকক্ষণ পরেও জায়গাটি ভরপুর থেকে যেত সুগন্ধে।

আর তাঁর বীণা-চর্চা ছিল একদিকে যেমন সাধনা, অন্যদিকে তেমনি মানস-বিলাস। অনেক বীণ্‌কারের কথাই তো শোনা যায়, কিন্তু মহেশচন্দ্রের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এবিষয়ে আর কোথাও আছে কি?

নিয়মিত মাস মাহিনায় তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত কারিগর নিযুক্ত রেখে দিতেন বীণাযন্ত্র তৈরী করে দেবার জন্যে। শুধু তাই নয়, বীণার উৎকৃষ্ট দণ্ড পাবার জন্যে তিনি সুদূর চীন, জাপানে পর্যন্ত লোক পাঠাতেন, ভাল বংশখণ্ড, কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করতে। এত অর্থব্যয় করে বীণা তৈরী করাবার পরও বীণা পছন্দ না হলে তা আর বাড়িতে রাখতেন না।

বীণা সাধনই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। ছ'টি বিভিন্ন আধারের বীণাযন্ত্র তিনি প্রস্তুত করিয়েছিলেন বহু ব্যয়ে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাজাবার জন্যে। তাঁর

এই ছ'টি বীণা হ'ল—লাউ, শ্বেতচন্দন, গম্ভার, পিতল, তামা এবং মিশ্র অর্থাৎ কাঠ ও ধাতুর মিশ্রণে তৈরি।

এই বীণাগুলিকে তিনি প্রাণের প্রিয় সন্তানদের তুল্য যত্নে রেখে দিতেন। প্রতি যন্ত্রের জন্যে থাকত পৃথক শয্যা আর পালঙ্ক। সেই পালঙ্কে আবার ধ্যানের মন্ত্র লেখা দেখা যেত।

দিবারাত্রির ছ'টি বিভিন্ন সময়ে মহেশচন্দ্র এক একটি বীণা বাজাতেন যথাবিহিত পূজা-পাঠের পরে। সকালে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় এবং প্রথম মধ্য ও শেষ রাত্রে তিনি এক একটি বীণার পূজা করতেন। তার পর ধ্যানস্তুতির শেষে বাজাতে বস্‌তেন যন্ত্র। এমনিভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিনি বীণার সাধনা করে চলেন। এই তাঁর দ্বিতীয় সত্তা।

ক্রমে বীণ্‌কার বলে তাঁর এমন সুনাম ছড়িয়ে পড়ে যে, কোনো সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি কাশীতে উপস্থিত হলে তিনি মহেশচন্দ্রের বীণা শোনবার জন্যে ব্যগ্র হতেন।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বীণা শুনতে চাইলেন, তখন হৃদয়নাথ, মথুরবাবু প্রভৃতি জানতে পারলেন মহেশচন্দ্রের নাম। তাঁরা স্থির করলেন, মহেশচন্দ্রের বীণাবাদন পরমহংসদেবকে শোনাতে হবে।

মথুরবাবুর ইচ্ছা ছিল, বীণ্‌কার তাঁর বাড়িতে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে বীণা শোনাবেন। অন্য আর পাঁচজন কলাবতের মতোন মহেশচন্দ্র সম্পর্কে ভেবে-ছিলেন মথুরবাবু। বাড়িতে আনিয়ে ফরমায়েশ করে যাঁদের গান-বাজনা ইচ্ছা মতোন শোনা যায়।

কিন্তু মহেশচন্দ্র সে ধাতুর ছিলেন না। তিনি যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে কোথাও বিশেষ যেতেন না কাউকে বীণা শোনাতে। নিজের বাড়িতে নিজের সময়ে নিজের মেজাজ মতোন বাজাতেন। যিনি সাত্যিকার আগ্রহী, তাঁকে শোনাতেন। যেমন অর্থের প্রতি দৃকপাত করতেন না, তেমনি নাম-যশের দিকেও লক্ষ্য ছিল না আদৌ। যত বড় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই হোন কারুর উপরোধে নিজের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হতেন না।

তাঁর কাছে কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন কাশীর পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ও মধুরকণ্ঠ ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' পুস্তিকায় মহেশচন্দ্র সম্পর্কে অনেক কথার মধ্যে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তা থেকে সঙ্গীত-সাধক মহেশচন্দ্রের চরিত্র বিষয়ে ধারণা করা যায়।

ঘটনাটি এই যে, কাশী-নরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিং একবার সরকার মহাশয়ের বীণা শোনবার জন্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন রামনগর রাজ-বাড়িতে। কিন্তু মহেশচন্দ্র মহারাজার প্রাসাদে উপস্থিত হননি। কারণ তাঁর মতে, যথারীতি সম্পন্ন হয়নি দেবী সরস্বতীর আবাহন।

হরিনারায়ণের বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, সরকার মহাশয়ের মদনপুরার বাড়ি সদাই সঙ্গীতের উৎসরে মুখরিত থাকত।

তাঁর সঙ্গীতজীবনের এ সমস্ত কথা অবশ্য মথুরবাবু বা শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন না। তাই তাঁকে বাড়িতে আনিয়ে বীণা শোনবার কথা ভেবেছিলেন মথুরবাবু।

মহেশচন্দ্রকে অবশ্য বাজাতে আসবার অনুরোধ করা হয়নি! পরমহংস-দেব তাতে আপত্তি করেছিলেন। তিনি অন্য দিক থেকে বিবেচনা করে দেখেছিলেন, তাঁর নিজের মতোন করে। অত বড় সাধক বলেই আর এক ভাবের সাধকের মর্ম বুঝেছিলেন। মহেশচন্দ্রকে তিনি সঙ্গীতের সাধক বলেই জ্ঞান করলেন—এতবড় বীণ্‌কার যিনি, নিশ্চয় তিনি তাঁর নিজের ভাবে সাধক। তাঁকে বীণা শোনাতে আসবার জন্যে ফরমায়েশ করা উচিত নয়!

সেবক হৃদয়কে নিয়ে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মহেশচন্দ্রের বাড়িতে এলেন। সুখের বিষয় যে বীণ্‌কার তখন বৈঠকখানাতে ছিলেন সঙ্গীতের পরিবেশে। দক্ষিণেশ্বরের এই অনন্য সাধকের মাহাত্ম্যের বিষয় তিনি তখনো কিছুই জানতেন না। কারণ পরমহংসদেবের পরিচয় সেসময় বাইরে বিশেষ প্রচার হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন অনাড়ম্বরভাবে মহেশচন্দ্রের বাড়িতে এলেন, তেমনি বিনা ভূমিকায় তাঁকে জানালেন, 'বীণা শুন্‌ব বলে আমি এসেছি।'

তাঁকে বীণা শোনাবার অনুরোধ মহেশচন্দ্র তখনি রক্ষা করলেন। এই অপরিচিত শ্রোতাটি সম্বন্ধে কিছু না জেনেও তাঁর আন্তরিক সারল্য ও মাধুর্য-মণ্ডিত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হলেন বীণ্‌কার। শিল্পীর সহজাত অনুভবে তিনি বুঝতে পারলেন, এ ব্যক্তি হৃদয়বান সুর-ভক্ত। এ বোধ না জন্মালে তিনি সঙ্গীতের প্রেরণা পেতেন না এবং সঙ্গীতের প্রেরণা লাভ না করলে কিছুতেই কারুর জন্যে যন্ত্রে হাত দিতেন না।

সানন্দে বীণায় তার বেঁধে নিয়ে মহেশচন্দ্র রাগালাপ করতে বসলেন।

বীণার প্রথম ঝঙ্কারেই বীণ্‌কার সুরসৃষ্টির এমন আবেশ সৃজন করলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের কানে সে সুর প্রবেশ করবামাত্র ভাবস্থ হলেন তিনি।

মহেশচন্দ্র তখন তন্ময় হয়ে বাজাতে আরম্ভ করেছেন। ইতোমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধচেতনায় জাগরিত হয়ে আচ্ছন্ন কণ্ঠে তাঁর ইষ্ট দেবীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'মা গো, আমার জ্ঞান হারিয়ে দিস্‌নি। এ বীণা যেন আমি শুনতে পাই।'

ত্যরপর তিনি সম্বিৎ বজায় রেখে বীণাবাদন উপভোগ করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠলেন যন্ত্রসঙ্গীতের সুরে একাত্ম হয়ে। সেই মহনীয় শ্রোতা ও বরণীয় বাদক ক্রমে সেই সুরের উৎস-ধারায় একমুখী হয়ে গেলেন।

এমনিভাবে তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হল যখন বীণাতে শেষ ঝঙ্কার দিলেন মহেশচন্দ্র। তিনি বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ তদ্‌গতচিত্তে বীণা শুনলেন যে অতিথি, তিনি কোনো সাধারণ শ্রোতা নন। সুরে পরম পরিতৃপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি সাদরে মিষ্টিমুখ করালেন।

তারপর বীণকারের কাছে বিদায় নিলেন পরমহংসদেব। কিন্তু পরে যে ক'দিন কাশীতে ছিলেন, মহেশচন্দ্র প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মথুরবাবুর বাড়িতে।

॥ বিদেশিনীর অভিনন্দন ॥

১৯১১ সাল। একটি স্নিগ্ধ শ[illegible]র অপরাহ্ণ বেলা।

গঙ্গার পশ্চিম ধারে বিশ্ববিখ্যাত বেলুড় মঠ। তারই এক পুণ্য প্রাঙ্গণে এই সভার আয়োজন হয়েছে।

একটি বিশেষ সভা। কোনো সাধারণ বক্তৃতার সভা নয়। তার মধ্যে একটি প্রধান অংশ আছে সঙ্গীতের। তা ছাড়া স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি আর কিছু অনুষ্ঠান।

বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ সভাটির ব্যবস্থা করেছেন বিশেষ করে মাদাম কাল্‌ভের সম্মানে।

মাদাম কাল্‌ভে। নামটি তখন আমাদের দেশে তেমন পরিচিত নয়। অন্তত এখানকার সঙ্গীতজ্ঞ মহলে। মাদাম কাল্‌ভের সে সময় এদেশে পরিচিতি প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা যাঁরা জানতেন তাঁদের মধ্যেই সীমবদ্ধ ছিল। মাদাম কাল্‌ভেকে তখন ভারতবর্ষে

যাঁরা জেনেছিলেন, তাঁরা স্বামীজীর একজন ভক্ত শিষ্যা বলেই বেশী জানেন। স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' ইত্যাদি রচনার মাধ্যমেও অনেকে জানতে পারেন মাদাম কাল্‌ভের নাম।

তিনি ছিলেন সেকালের ইউরোপের একজন শ্রেষ্ঠা এবং স্বনামধন্য গায়িকা। শুধু ইউরোপে নয়, আমেরিকা মহাদেশেও তাঁর তুল্য প্রসিদ্ধি অন্য কোনো সঙ্গীতজ্ঞা তখন অর্জন করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ড ভ্রমণকালে স্বামীজী যেমন অনেক মনীষী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, তেমনি ললিতকলার কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীরও। শেষোক্ত শ্রেণীর এমনি দু'জন হলেন মাদাম কাল্‌ভে ও শারা বার্নহার্ড। সমসাময়িক সঙ্গীত ও অভিনয় জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার দুই আধার।

মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভের সঙ্গীত-প্রতিভা সম্বন্ধে স্বামীজীর অতি উচ্চ ধারণা ছিল। স্বামীজী স্বয়ং সুগায়ক ছিলেন এবং সঙ্গীতের তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, সেজন্যে এ বিষয়ে তাঁর মতামত নির্ভরযোগ্য।

শ্রীমতী কাল্‌ভেকে তিনি সেকালের পাশ্চাত্য জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠা অপেরা গায়িকা বলে যেখানে উল্লেখ করেছেন, তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ (১১শ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ১০৬-৯) থেকে সে প্রসঙ্গটি এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। এখানে, ইউরোপ ভ্রমণকালে কনস্টান্টিনোপল থেকে তাঁর স্বলিখিত বৃত্তান্তে স্বামীজী বলেছেন—

"সঙ্গের সঙ্গী তিনজন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। তোমাদের আমেরিক পরিচিতা মিস্ ম্যাকলাউড, ফরাসী পুরুষবন্ধু মশিয়ে জুল বোওয়া, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদমোয়াজেল কাল্‌ভে।...আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ টাকা, চার লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় খালি গান গেয়ে। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় পূর্ব হতে। পাশ্চাত্ত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম শারা বার্নহার্ড আর সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা কাল্‌ভে—দু'জনেই ফরাসী, দু'জনেই ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান ও অভিনয় আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন।...

মাদমোয়াজেল কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন,—ইজিপ্ত,

প্রভৃতি নাতি-শীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় তাঁর জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন।—রাজা, বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম মেল্‌বা, মাদাম এমা এমস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকল আছেন; জঁাদরেল কি, প্লঁাসাঁ প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কসকল আছেন—এঁরা সকলেই দুই-তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন।—কিন্তু কাল্‌ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্তব্য থেকে মাদাম কাল্‌ভের প্রতিভা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়।

তাঁর ও স্বামীজীর বিষয়ে আরও জানবার কথা এই যে, তিনি স্বামীজীর আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি শুধু শ্রদ্ধাপরায়ণা ছিলেন না (কাল্‌ভের 'My Life' পুস্তকে যার পরিচয় পাওয়া যায়), স্বামীজীর সুকণ্ঠের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।

একথা অনেকেই জানেন যে, বিশ্ববিশ্রুত মনীষী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ রমা রলাঁ তাঁর রচিত স্বামীজীর জীবনী-গ্রন্থে বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রলাঁ স্বয়ং স্বামীজীর গান শোনেননি। মাদাম কাল্‌ভে স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের বিষয়ে রলাঁকে জানিয়েছিলেন এবং সেই [illegible]তিতে আস্থা স্থাপন করে রলাঁ লেখেন—

"...and from the moment he began to speak, the splendid music of his rich deep voice* enthralled the vast audience of

* He had a beautiful voice like a violencell. (so Miss Josephine Macleod told me), grave without violent contrasts, but with deep vibrations that filld hall and hearts. Once his audience was held he could make it sink to an intense piano piercing two hearers to the soul. Emma Calve, who knew him, described it as "an admirable baritone, having the vibrations of a Chinese gong." (*The Life of Vivekanauda & Unversal Gospel*, p, 5—By Romain Rolland).

American Anglo-Saxons, previously prejudiced against him on account of his colour…'

স্বামীজীর যে কণ্ঠের বর্ণনা রমা রলাঁ মাদাম কাল্‌ভের মুখে শুনে এইভাবে করেছেন, তা' আমাদের দেশের সাঙ্গীতিক পরিভাষায় এককথায় বলা চলে—জোয়ারিদার গলা। কাল্‌ভে গায়িকা ছিলেন বলেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন স্বামীজীর কণ্ঠের এই বৈশিষ্ট্য।

মাদামের নিজের কণ্ঠস্বরও বিশেষ ঐশ্বর্যময়ী ছিল। তাঁর কণ্ঠ-সম্পদের আর একটি দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা এই জানা যায় যে, সুদীর্ঘ সঙ্গীত-জীবনের মধ্যে কাল্‌ভের কণ্ঠস্বর কখনও কোনো পীড়ায় আক্রান্ত হয়নি। কণ্ঠশিল্পীর পক্ষে এ বড় কম ভাগ্যের কথা নয়। অতি অল্প গায়ক-গায়িকাই এ বিষয়ে নিরবিচ্ছিন্ন সুখী। মাদাম কাল্‌ভে তাঁর উক্ত আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে নিজের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

'During the forty years of my musical career, I have been entirely free from illness that affect the voice of a singer."

তাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত এই আত্মজীবনী পুস্তকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন রোসামণ্ড গিল্‌ডার।

('*My Life*' by Emma Calve' Translated by Rosamond Gilder.)

ইংরেজী অনুবাদক রোসামণ্ড গিল্‌ডার বইখানির প্রথমে কবি রিচার্ড ওয়াটসন গিল্‌ডার রচিত কাল্‌ভে সম্বন্ধে দু'ছত্র কবিতা উদ্‌ধৃত করেছেন। এই লাইন দু'টি থেকে ধারণা করা যায়, মাদাম কাল্‌ভে ইউরোপের সঙ্গীতসমাজে কি বিপুল গৌরবের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতকৃতি কি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিল।

"Sweetness & strength, high tragedy and mirth,"
And but one Calve on the singing earth."

পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গীত-জগতে যাঁর এমন সম্মানের স্থান সেই মাদাম এম্মা কাল্‌ভে সেবার এলেন কলকাতায়। সে ১৯১১ সালের কথা।

এখানে তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠান করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে আসেননি। এ যাত্রা দেশ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন মাদমোয়াজেল। শুধু কলকাতা নয়,

ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি দর্শনীয় জায়গায় তিনি উপস্থিত হন। আত্ম-জীবনীতে (২০২ পৃষ্ঠা) তিনি এ সম্পর্কে লেখেন—

'I···proceeded on a long tour through India visiting Madras, Calcutta, Darjeeling, Delhi, Agra, Bombay'

কাল্‌ভে গানের অনুষ্ঠান ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভারতবর্ষে আগমনও তেমনি পর্যটনের অঙ্গ। তবে সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ বিবেকানন্দ স্বামীর স্বদেশ বলে যে তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেনি, তা বলা যায় না। স্বামীজীর প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্থ যেভাবে আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেছেন, তাতে এ কথাই মনে হয়।

স্বামীজীর 'অলৌকিক' শক্তির সহায়তায় একবার নিজের জীবনের এক সঙ্কটময় অবস্থা থেকে উত্তরণের কাহিনী কাল্‌ভে যে ভাবে পুস্তকখানিতে বর্ণনা করেছেন, তাতে স্বামীজীর জন্মভূমিতে একবার উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষ বেলুড় মঠে। স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতি-মণ্ডিত, তাঁর সমাধির ধারকভূমি এবং তাঁর কর্মসাধনার কেন্দ্রীয় পীঠস্থান বিশ্ববিখ্যাত বেলুড় মঠ।···

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্নাসীর দেহত্যাগের প্রায় আট বছর পরের কথা। কিন্তু তখনো তাঁর অপূর্ব প্রেরণায় মঠের সমগ্র পরিমণ্ডল যেন প্রাণবন্ত ও জাজ্বল্যমান হয়ে আছে।

স্বামীজীর বিদেশীয় ভক্তসমাজের মধ্যে একজন অতি বিশিষ্টরূপে কাল্‌ভের নাম তখন মঠের কতৃপক্ষের সুপরিচিত। সম্মানিত অতিথিকে তাই উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শনের জন্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। এবং তাঁর সঙ্গীতগুণের কথা বিবেচনা করে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থাও।

সঙ্গীতের জন্যে বিশেষ করে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন অমৃতলাল দত্ত, সঙ্গীত-সমাজে হাবু দত্ত নামে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি স্বামীজীর জ্ঞাতি-ভ্রাতা এবং পরমহংসদেবের ভক্তরূপেও শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত সমাজে সকলের সুপরিচিত।

স্বামীজীর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ এবং হাবু দত্তের পিতামহ কৃষ্ণপ্রসাদ ছিলেন দুই সহোদর। হাবু দত্ত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শিমুলিয়ার দত্ত বংশের পারিবারিক গৃহ ৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে অবাল্য বাস করেছেন। প্রথম জীবনে দু'জনের একসঙ্গে সঙ্গীতচর্চা যেমন হয়েছে, তেমনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে যাতায়াতও। পরে অবশ্য দুজনের জীবনধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বয়ে গেছে। কিন্তু সে সব পরে কথা, পরের কিছু কিছু উল্লেখ করা হবে।

এখন বেলুড় মঠে সেই অপরাহ্নের প্রসঙ্গ। সেদিন মাদাম কাল্ভের সামনে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে হাবু দত্তকে আনা হয়েছিল শুধু এই কারণে নয় যে তিনি স্বামীজীর আত্মীয়। প্রধান কারণ, তিনি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী, সেজন্যে বিদেশিনী সঙ্গীতসাধিকাকে ভারতীয় সঙ্গীত শোনাবার একজন সুযোগ্য পাত্র।

দত্ত মশায় সেদিন মাদামকে রাগসঙ্গীত শোনাবার জন্য এসরাজ যন্ত্রটি এনেছিলেন। কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রেই তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল এবং একাধিক যন্ত্রে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের রীতিমতো সাধনা করেছিলেন। যেমন ক্ল্যারিওনেট, বীণা, সুরবাহার ও এসরাজ।

উপরন্তু তিনি ছিলেন ধ্রুপদীও। তাঁর শিষ্যদের অন্যতম হরিহর রায় তাঁর কাছে ধ্রুপদের শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং উত্তরজীবনে 'গীত সঞ্চয়ন' নামে যে ধ্রুপদ গানগুলির স্বরলিপি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কোনো কোনো গান (যেমন তানসেন রচিত 'তুঁহি ভজো ভজো' নামে চৌতালের ইমন কল্যাণটি) তিনি হাবু দত্তের কাছে শিক্ষা-সূত্রে লাভ করেন। তবে দত্ত মশায় প্রধানত যন্ত্র-সঙ্গীতের শিল্পী ছিলেন এবং সেইভাবেই সুপরিচিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতাদের মহলে। বিশেষ ক্ল্যারিওনেট বাদক-রূপে।...

অমৃতলাল সেদিন কাল্ভেকে শোনাবার জন্যে কেন যে এসরাজ যন্ত্রটি নির্বাচন করেছিলেন, তার কারণ অনুমান করা হয়। এসরাজ ভারতীয় যন্ত্র বলেই সম্ভবত এটির কথা তাঁর মনে আসে ইউরোপের শিল্পীর সামনে বাজাবার জন্যে। নচেৎ তাঁর পক্ষে ক্ল্যারিওনেট নিয়ে সে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

ক্ল্যারিওনেট-বাদকরূপে সেকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি, তার পরিচয় পরে যথাস্থানে দেওয়া হবে। সেদিন ক্ল্যারিওনেট নিয়ে বসলে তিনি কাল্ভেকে অবশ্যই সুরমুগ্ধ করতে পারতেন, তবু তিনি সাহায্য নেননি এই বিলাতি যন্ত্রটির। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীর কাছে মাদাম যেমন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তেমনি যথার্থ ভারতীয় সঙ্গীতের পরিচয় তিনি ভারতীয় যন্ত্রের মাধ্যমে লাভ করুন, এমন কথা হয়ত দত্ত মশায়ের মনে ছিল।

আর তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, বলা যায়। কারণ মাদাম কাল্‌ভে সেদিনকার অনুষ্ঠান থেকে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা নিয়ে যান। এবং এই ছোট্ট সভাটির কথা অনেকদিন পর্যন্ত জাগরূক ছিল তাঁর স্মৃতিতে।

তাই দেখা যায়, ঘটনাটির বহু বছর পরে, যখন তাঁর অসাধারণ সাফল্য-মণ্ডিত সঙ্গীতজীবনের পরিণতিতে আত্মজীবনী রচনা করতে বসেন তখনও সুদূর বেলুড় মঠের সেই অপরাহ্নটির কথা তিনি ভোলেননি। শিল্পীর নাম তখন বিস্মৃত হয়েছেন, কি শুনেছেন তার আনুপূর্বিক বিবরণও আর লেখবার মতোন স্মরণে নেই, মনে মুদ্রিত হয়ে আছে শুধু সেই অনুষ্ঠানের সামগ্রিক আবেদন।

এসরাজ যন্ত্রটির নাম তাঁর জানা থাকবার কথা নয়, মনের মধ্যে রয়েছে তারের যন্ত্রের সেই অ-দৃষ্টপূর্ব এবং অভিনব অবয়ব, যাতে অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল। আর সেই সঙ্গীত, সেখানকার স্তোত্রপাঠ সব মিলিয়ে এবং তাদের প্রভাবে সৃষ্ট হয় যে অপরূপ পুণ্য পরিবেশ, তাই তাঁর মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত থাকে অম্লান স্মৃতিতে।

মাদাম কালভে তাঁর '*My Life*' বইখানিতে সেদিনের কথায় লেখেন—'At our feet the mighty Ganges flowed, Musicians played to us on strange instruments; weird, plaintive chants that touched the very heart···The afternoon passed in a peaceful, contemplative calm.'···

সেদিনকার সভায় হাবু দত্ত যতক্ষণ এসরাজে রাগালাপ করেছিলেন, কাল্‌ভে বসে শুনেছিলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। সত্যকার শিল্পী দত্ত মশায়ের সুরসৃষ্টিতে তিনি যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁকে দেখে উপস্থিত সকলেই অনুভব করেন। এক দেশের সঙ্গীত আর এক দেশের সঙ্গীতশিল্পীর প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে। অপরিচিত ভাষার কাব্যে গ্রথিত সঙ্গীত হলে হয়ত বিদেশিনীর অনুসরণ করতে অসুবিধা ঘটত। কিন্তু ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করে দূর দেশকে নিকটতর করবার একটি বিশেষ সুবিধা আছে যন্ত্রসঙ্গীতের। এবং তা-ই সেদিন কার্যকর হয়েছিল।

এই ঘটনার আগেকার অনেক আসরেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গীত-জগৎ পরস্পরের কাছাকাছি এসে রসাস্বাদনের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। যেমন, ১৮৮৪ সালে কলকাতায় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সেতার ডুএট শোনেন ইউরোপের King of Violin, প্রফেসর রেমিনী। তারপর ১৮৯৭ সালে ইংলণ্ডে রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উৎসবে সরদী এনায়েৎ হোসেন ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সামনে (আতা হোসেনের তবলা সহযোগিতায়) সরদ বাজান। তার তিন বছর পরে ১৯০০ খ্রীঃ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ব্যবস্থাপনায় প্যারিস প্রদর্শনীতে সরদী ভ্রাতৃদ্বয় কেরামতুল্লা ও কৌকব খাঁর সরদ বাদন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই দেখা গেছে, ইউরোপের শ্রোতৃমণ্ডলী যন্ত্রের মধ্যস্থতায় ভারতীয় সঙ্গীতের গুণ গ্রহণ করেছেন। হাবু দত্তের এসরাজ বাদন প্রসঙ্গে মাদাম কাল্‌ভের প্রশংসা তারই আর এক দৃষ্টান্ত।

বাজনা শেষ হতে মাদাম সেদিন বাদককে যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন এবং এই ধরনের মন্তব্য করেন যে, সুরের ক্ষেত্রে তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হল।

এই অভিনন্দন সাধারণ ভদ্রতাসূচক নয়, একথা সমবেত ব্যক্তিরা অনুভব করেছিলেন। এ অভিনন্দন সঙ্গীত বিষয়ে অনভিজ্ঞ কোনো বিদেশী পর্যটকেরও নয়। সে যুগের ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠা অপেরা-গায়িকার অভিনন্দন।

মাদাম কাল্‌ভে হাবু দত্তের এসরাজ বাদন শুনে যেভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর প্রশংসা সেদিন করেন, তাতে সে সভার বিবরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তত আমাদের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে এ একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিনের কোনো উল্লেখ তখনকার পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না। সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এমনই উপেক্ষিত থাকত সেকালে। তাই সমসাময়িক কোনো মুদ্রিত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল না।

ঘটনাটির বিষয়ে জানা গেছে রামকৃষ্ণ মিশনের এক বিশিষ্ট কর্মী ও সন্ন্যাসী স্বামী শ্যামানন্দের সৌজন্যে। স্বামী শ্যামানন্দ সে সভায় উপস্থিত থেকে ঘটনাবলীর সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছিলেন এবং হাবু দত্তকেও ঘনিষ্ঠভাবে সে যুগে জানতেন। তা ছাড়া, তিনি কিছু কিছু সঙ্গীতচর্চাও করতেন তাঁর সেই তরুণ বয়সে। পরে তিনি (স্বামী শ্যামানন্দ) সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যে জীবন উৎসর্গ করেন। পরবর্তীকালে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক হন এবং অসাধারণ গঠন-নৈপুণ্যে রেঙ্গুন

শহরের বিরাট্ সেবাসদন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে সন্ন্যাসীজীবন সার্থক করে তোলেন।

শেষ বয়সে স্মৃতিচারণের সময়ে তিনি বর্ণনা করতেন মাদাম কাল্‌ভেকে হাবু দত্তের এসরাজ শোনাবার প্রসঙ্গ এবং দত্ত মশায়ের সঙ্গীতজীবনের আরও নানা বিচিত্র কথা। তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু পরে বিবৃত করা হবে।

হাবু দত্তের সেইসব খণ্ড কাহিনী বিশেষ মাদাম কাল্‌ভের প্রসঙ্গ শুনে মনে প্রথমেই একটি প্রশ্ন জাগে। তা হল, সাগর-পারের এত বড় শিল্পী যাঁকে অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, স্বদেশে তিনি কি লাভ করেছিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে যা জানা যায় তা বিশেষ সুখের স্মৃতির বা দেশের গুণ-চেতনার আশাপ্রদ পরিচায়ক নয়। নচেৎ হাবু দত্ত কেন এমন খেদোক্তি করতেন 'আমাদের মতোন পরাধীন দেশে যেন কেউ সঙ্গীত-চর্চাকে পেশা না করে। এদেশে গান-বাজনা শিখে জীবন কাটাতে গেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। আর স্বাধীন দেশে? সেখানে গাইয়ে বাজিয়েরা কি সম্মানের সঙ্গে রোজগার করে! তাদের জীবন নষ্ট হয় না!'

সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি কিংবা প্রতিষ্ঠা যে ছিল না, তা নয়। সে সব যথেষ্টই ছিল। তিনি ছিলেন সঙ্গীত-ব্যবসায়ী অর্থাৎ পেশাদার। অথচ সেকালে সঙ্গীত-চর্চা পেশা হিসেবে উপযুক্ত অর্থকরী ছিল না।

সুতরাং অনেক গুণীর মতোন দত্ত মশায়কেও বরণ করতে হয়েছিল দারিদ্র্য এবং তার আনুষঙ্গিক নানা দুঃখকষ্ট, অসম্মান, অমর্যাদা। সেজন্যেই তাঁর কথাবার্তায় অমন আক্ষেপ আর অভিমান প্রকাশ পেত। আহত বোধ করত তাঁর স্পর্শকাতর শিল্পীমন। যদিও তাঁর সঙ্গীত জীবনের অধিকাংশ কাল অভাবের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে এবং সেজন্যে বহু বেদনা সহ্য করতে হয়েছে, তবু অবশ্য তাঁর শিল্পী-সত্তার প্রকাশ ব্যাহত হয়নি।

একজন যথার্থ গুণী বলে সঙ্গীতজ্ঞ মহলে তাঁর সম্মান ছিল যথেষ্ট। আর যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি অতি বিশিষ্ট স্থান। বাঁশীর মোহিনী সুরে তিনি সাধারণ ও বিদগ্ধ সব রকমের শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। এবং তা অশিক্ষিত পটুত্ব নয়। প্রায় কিশোর বয়স থেকে তিনি রীতিমতো সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং একাধিক প্রথম শ্রেণীর কলাবতের শিক্ষাধীনে তাঁর সঙ্গীত জীবন গঠিত হয়। আগেই বলা হয়েছে, ধ্রুপদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট

এসরাজ ও বীণাযন্ত্রে তিনি সঙ্গীতের সাধনা করেছিলেন। তবে বোধ হয় তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল ক্ল্যারিওনেট।

এই বিলাতী যন্ত্রটির একক বাদন তখন আমাদের রাগসঙ্গীত ক্ষেত্রে প্রায় দুর্লভ ছিল। ক্ল্যারিওনেট শিল্পীরূপে সেজন্যে একরকম অনন্য ছিলেন হাবু দত্ত। ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ পদ্ধতির সূক্ষ্ম, মনোমুগ্ধকর প্রকাশ তাঁর বাঁশীতে শোনা যেত। অপরূপ সুমিষ্ট আর কারুকর্মময় ছিল তাঁর বাঁশীতে ফুৎকার। সেই সঙ্গে রাগের যথাযথ রূপায়ণের জন্যে ওস্তাদরাও তাঁকে বিশেষ পছন্দ ও প্রশংসা করতেন।

তাই একাধিক ভারত-বিখ্যাত গুণী তাঁকে উপযুক্ত আধার দেখে যত্ন করে শিখিয়েছিলেন। আর স্বনামধন্য উজীর খাঁর তুল্য ওস্তাদের (যাঁর শিষ্য হতে পারাই ছিল শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতি সৌভাগ্যের কথা) তিনি ছিলেন এক প্রিয় শিষ্য। তাঁকে উজীর খাঁ শুধু কলকাতায় তালিম দেননি, সঙ্গে করে রামপুরেও নিয়ে যান এবং সেখানে রামপুর নবাবের ঐকতান বাদন গঠন করবার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত করেন।

তাঁর ওই যে বাঁশী বাজাবার কথা হচ্ছিল—ক্ল্যারিওনেট-রাগ সঙ্গীতের সব সূক্ষ্ম জিনিস মিড়ের নানারকম খোচ্-খাঁচ বাঁশীতে তাঁর মতোন করে ফুটিয়ে তোলা তখন আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেজন্যই বিশেষজ্ঞ মহলে ছিল তাঁর কদর।

বীণা আর এসরাজে তিনি ওস্তাদদের তালিম নেন বটে, কিন্তু বাঁশীতেই সমস্ত তুলতেন। তাঁর মতোন (বাঁশীতে) মিষ্টি ফুঁ সেকালে আর কারুর ছিল না, এমনি একটা প্রবাদ আছে। থিয়েটারে যে সময়টা ছিলেন তাঁর সেই মিষ্টি বাঁশীর সুর দর্শকদের কাছে ছিল এক প্রধান আকর্ষণ। সেসব কথা পরে আসবে।

হাবু দত্তের সঙ্গীত-জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যদিও সে তিনটি বিভাগ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। প্রথমত, পদ্ধতিগত শিক্ষা ও সাধনায় তিনি ছিলেন রাগসঙ্গীতের কৃতবিদ্য গুণী। যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীরূপে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় ক্ল্যারিওনেট, বীণা ও এসরাজ বাদকরূপে।

দ্বিতীয়ত, পেশার প্রয়োজনে তাঁকে হতে হয় ঐকতান বাদনের সংগঠক ও পরিচালক। এ বিষয়েও তাঁর যশ কম ছিল না। শুধু কলকাতায় নয়, প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকেন্দ্র রামপুরে নবাবের ব্যাণ্ড পার্টি গঠন করে তিনি সেখানকার

গুণীজনের সমাদর লাভ করেছিলেন, কারণ তাঁর ঐক্যতানে গৎগুলি হত যথাযথ রাগের ভিত্তিতে গড়া। রাগসঙ্গীতে ঐক্যতান বাদনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণ করবার যোগ্য। কলকাতার পেশাদার থিয়েটারে যখন তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তখন সেখানেও এবিষয়ে মুন্সীয়ানার পরিচয় দেন।

তৃতীয়ত, এ ক্ষেত্রেও উপার্জনের তাগিদে, মঞ্চ-নাটকের সুর সংযোজকরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। কিন্তু এখানেও তাঁর কৃতিত্ব অল্প নয়। কারণ সে যুগের বাংলার রঙ্গমঞ্চ, বিশেষ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের পরিচালনাধীন থিয়েটারগুলি সঙ্গীত বিষয়ে রীতিমতো সমৃদ্ধ ছিল রাগসঙ্গীতের ঐশ্বর্যে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের গানে যাঁরা সুরযোজনা করতেন তাঁরা প্রায় সকলেই সৃজনশীল সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলেন। যেমন, বেণীমাধব অধিকারী (বেণী ওস্তাদ নামে সুপরিচিত), দেবকণ্ঠ বাগচী, রামতারণ সান্যাল (গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য), শশিভূষণ কর্মকার, জানকীনাথ বসু প্রভৃতি। সেকালের বাংলার নাট্যজগতে সঙ্গীতের যে একটি গৌরবোজ্জ্বল স্থান ছিল, সেকথা বলা বাহুল্য।

অমৃতলাল দত্তের নাম এই তালিকায় একটি স্মরণীয় সংযোজন। তিনি গিরিশচন্দ্রের দু'খানি নাটকের গানে সুর দেন বলে জানা যায়।

ক্লাসিক থিয়েটারে নাট্যাচার্যের 'অশ্রুধারা' (১৯০১) নাটিকার পরিচয় প্রসঙ্গে 'গিরিশচন্দ্র' জীবনীগ্রন্থের লেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'ইহার গীতগুলি সুপ্রসিদ্ধ অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) কর্তৃক সুরলয়ে সুগঠিম হইয়াছিল' (৪৬৪ পৃষ্ঠা)। নাটিকাটির অভিনেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুসুমকুমারী, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

তার তিন-চার বছর পরে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'হর-গৌরী' নামে সুর-সমৃদ্ধির জন্যে বিখ্যাত গীতিনাট্যখানির গানগুলির সুরযোজক ও শিক্ষক ছিলেন অমৃতলাল।

নাটকের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে তারাসুন্দরী, তারকনাথ পালিত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথনাথ পাল, কিরণবালা প্রভৃতি ছিলেন। এর গানগুলি বিশেষ মেনকার গীত ক'খানিতে দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত।

মিনার্ভা থিয়েটারে সেই অভিনয়ের বহুদিন পরে মনোমোহন থিয়েটারে এই গীতিনাট্যখানি আবার নতুন করে অভিনয় আরম্ভ হয় ও দর্শকদের আকৃষ্ট

করে রাখে অনেক রাত্রি ধরে। হাবু দত্তের সুরে গঠিত গানগুলিই ছিল 'হর-গৌরী'র প্রধান আকর্ষণ।...

প্রসঙ্গত, উত্তর বাংলার রামপুর-বোয়ালিয়া বা রাজশাহীতে গিরিশচন্দ্রের সদলে কিছুকাল অভিনয় করার প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গিরিশচন্দ্র পুস্তকে অমৃতলালের কথা যে উল্লেখ করেছেন তা' এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল (৪৩২-৩৪ পৃষ্ঠা) :

'সুপ্রসিদ্ধ ক্লারিওনেট বাদক এবং সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) মহাশয়, রাজসাহী-তালন্দের জমিদার স্বর্গীয় ললিতমোহন মৈত্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ এবং যত্নে তাঁহার রামপুর-বোয়ালিয়ার প্রাসাদতুল্য ভবনে মধ্যে মধ্যে গিয়া অবস্থান করিতেন। ললিতমোহনবাবু যেরূপ গীতবাদ্যপ্রিয়, সেইরূপ নাট্যানুরাগী ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালার ন্যায় রামপুর-বোয়ালিয়ায় একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ রূপ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন।

'গিরিশচন্দ্র যে বৎসর (১৩০৪, ফাল্গুন) স্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করেন, সে বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। প্লেগের আতঙ্কে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় কলিকাতা বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হয়...এই সময়ে ললিতমোহনবাবু সুযোগ বুঝিয়া হাবুবাবুর সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালা হইতে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহপূর্বক রামপুর-বোয়ালিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

'হাবুবাবু স্বয়ং গুণী ছিলেন, তাহার উপর গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ স্বামার পরম আত্মীয় বলিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ললিতবাবুর আগ্রহাতিশয্যে হাবুবাবু আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে রামপুর বোয়ালিয়ায় লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "ললিতবাবু আপনার সম্মান ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানে সম্মত এবং এ সময়ে আপনার কলিকাতা পরিত্যাগও বাঞ্ছনীয়।"

'স্টার থিয়েটারের সহিত গিরিশচন্দ্র তখন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, কলিকাতাতে এই হুলুস্থুল ব্যাপার, গিরিশচন্দ্র অগত্যা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তিন সহস্র মুদ্রা 'বোনাস' স্বরূপ পাইয়া রামপুর-বোয়ালিয়ায় গমন করিলেন। স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ

ঘোষ (দানিবাবু), ভূষণকুমারী, সুশীলাবালা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও যথাযোগ্য বেতন এবং অল্পাধিক 'বোনাস' পাইয়া ইতিপূর্বে রামপুর-বোয়ালিয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন।

'ললিতমোহনবাবু উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রঙ্গালয়-নির্মাণকার্য শেষ করিয়া আনিলেন। এদিকে গিরিশচন্দ্র দল সুগঠিত করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয়ার্থে প্রস্তুত করিলেন। থিয়েটারের নামকরণ হইল—মার্ভাল (Marval) থিয়েটার।"

'প্রথম রাত্রে "বিল্বমঙ্গল" নাটক অভিনীত হয়।…খ্যাতনামা অভিনেত্রীগণ সম্মিলনে অভিনয়ও যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল—দর্শকদের ভিড়ও সেইরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। পরম আগ্রহে বহুদূর হইতে বহু গ্রামের দর্শকগণ আসিতে থাকে—সমস্ত দেশে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়।

'অল্পদিন অভিনয়ের পর ললিতমোহনবাবুর অভিভাবকগণ বুঝিলেন যে ক্ষুদ্র শহরে টিকিট বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়া দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া থিয়েটার বন্ধ করিয়া দেন। এদিকে কলিকাতায় তখন প্লেগের আতঙ্ক অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রদায় নির্ভয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সহৃদয় ললিতমোহনবাবুর যত্ন এবং সদ্ব্যবহারে সম্প্রদায় পরম আনন্দে তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।"

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হাবু দত্তের গুণগ্রাহী উক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয় সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন হাবুবাবুকে সমাদর করতেন। পরে মৈত্র মহাশয় সুবিখ্যাত সরদ বাদক আমীর খাঁকে নিযুক্ত রাখেন তাঁর সঙ্গীত-সভায়। (ললিতবাবুর পৌত্র এবং আমীর খাঁর শিষ্য সরদ বাদক রাধিকামোহন মৈত্র এখনকার সঙ্গীতসমাজে সুপরিচিত।)

হাবু দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গে আর একটি সংবাদ আছে। শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন থেকে বিপুল গৌরবে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় পদার্পণ করলে তাঁকে শিয়ালদা স্টেশনে সম্বর্ধনা করা হয়। সেই সভায় গীত গিরিশচন্দ্র রচিত গানখানিতে সুর-সংযোগ করেছিলেন অমৃতলাল।…

তাঁর সঙ্গীত-জীবনের যে তিনটি বিভাগ বা পর্বের কথা আগে বলা হয়েছিল তার প্রথমটি অর্থাৎ তাঁর রাগ সঙ্গীত-চর্চার পরিচয় এবারে দেওয়া যাক। প্রথমে রীতিমতো শিক্ষার কথা। একাধিক প্রথম শ্রেণীর কলাবতের কাছে

পদ্ধতিগত সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

শিমুলিয়ার দত্ত-বংশীয়দের যে ৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের বাড়িতে তিনি শিশুকাল থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত বাস করেন, 'সেই গৃহের সঙ্গীত চর্চার জন্যেওখ্যাতি ছিল। এখানে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) পিতা, সঙ্গীতপ্রেমী বিশ্বনাথ দত্ত প্রতি শনিবার ও রবিবারে সঙ্গীতের আসর বসাতেন কলাবতদের নিয়ে।

বিশ্বনাথ দত্ত প্রথম জীবনে ওস্তাদদের শিক্ষাধীনে স্বয়ং সঙ্গীতচর্চা করতেন এবং মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে আইনজীবীরূপে অবস্থান করবার সময়ে পুত্রকে প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা দেন। পরে কলকাতায় বাস কারবার সময়ে ওস্তাদের অধীনে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষার রীতিমতো ব্যবস্থা করেন বিশ্বনাথ। সেই সময় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অমৃতলালেরও সঙ্গীতশিক্ষার আনুকূল্য করেন।

বিশ্বনাথ অমৃতলালের সঙ্গীত-বিষয়ে প্রবণতা ও শক্তি লক্ষ্য করে পুত্র নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই যে শিক্ষকের কাছে দু'জনের সঙ্গীতশিক্ষার বন্দোবস্ত করলেন, তাঁর নাম বেণীমাধব অধিকারী।

বেণীমাধব বা বেণী ওস্তাদ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কলাবত আহম্মদ খাঁর শিষ্য। অমৃতলাল ও নরেন্দ্রনাথ একসঙ্গে বেণী ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। শিক্ষকের বেতন এবং সঙ্গীত-চর্চার আনুষঙ্গীক যন্ত্রাদিও দুই শিক্ষার্থীকে দেন বিশ্বনাথ।

বেণী ওস্তাদের কাছে অমৃতলাল ও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষার এইভাবে সূচনা হলেও পরে ভিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়। অমৃতলালের প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করে যন্ত্রসঙ্গীতে এবং নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ-সঙ্গীতে। তা ছাড়া, নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের সঙ্গে স্কুল জীবনের বিদ্যা সমাপ্ত করে কলেজে প্রবেশ করেন ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর জীবন সন্ন্যাসের পথে যাত্রা করে।

কিন্তু অমৃতলাল একান্তভাবে সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেন স্কুলের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই এবং পরেও সঙ্গীত চর্চাই হয় তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। যে যন্ত্র-সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভা প্রকাশ পায়, তার চর্চাও তরুণ-বয়স থেকেই তিনি আরম্ভ করেন। এ বিষয়েও বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন তাঁর সহায়ক। অমৃতলালের প্রথম এসরাজ যন্ত্র তিনিই কিনে দিয়ে তাঁর সঙ্গীত চর্চার পথ সুগম করে দেন।

বেণী ওস্তাদের কাছে কিছুকাল শিক্ষালাভের পরে এসরাজের বিখ্যাত গুণী কানাইয়ালাল ঢেঁড়ীর শিষ্য হলেন অমৃতলাল। কানাইয়ালাল ঢেঁড়ী গয়া-

নিবাসী হলেও কলকাতায় অনেক বছর তাঁর শিমুলিয়ার বাসগৃহে ছিলেন। সেসময় ঢেঁড়ীজীর কাছে কলকাতার আরো যাঁরা এসরাজ শিক্ষার সুযোগ পান তাঁদের মধ্যে উত্তরকালের বিখ্যাত এসরাজ-গুণী কালিদাস পাল এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির (দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র) অরুণেন্দ্রনাথ, (সত্যেন্দ্র-নাথের পুত্র) সুরেন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালের শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নামও উল্লেখ্য।

কানাইয়ালালের কাছে হাবু দত্ত ভালভাবে তালিম পেয়ে সঙ্গীতজীবনে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়ে যান। ক্ল্যারিওনেট বাদনও তিনি এসময়ে আরম্ভ করেছিলেন এবং রাগ-সঙ্গীতের চর্চা করতেন এই বিলাতী বাঁশীতে।

অমৃতলালের তৃতীয় ওস্তাদ হলেন রামপুর ঘরানার স্বনামধন্য উজীর খাঁ। যুক্তপ্রদেশের রামপুর রাজ্য থেকে উজীর খাঁ উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় এসে বছর দুয়েক বাস করেন। সে সময় তাঁর যে কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয় এখানে, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমৃতলাল।

উজীর খাঁর তখনকার অন্যান্য বাঙালী শিষ্যদের মধ্যে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। আলাউদ্দীন খাঁ তখন উজীর খাঁর তালিম পাননি, তিনি তা' লাভ করেন আরও বিশ বছরেরও পরে, রামপুর রাজ্যে।

উজীর খাঁর কাছে শিক্ষার সময় অমৃতলাল বীণা যন্ত্রে সাধনাও আরম্ভ করেছিলেন। উজীর খাঁর ঘরানা প্রধানত বীণায় রাগালাপ ও ধ্রুপদ সঙ্গীতের। তবে তিনি আসরে যন্ত্র-বাদকরূপেই গুণপনা প্রদর্শন করে গেছেন।

এখানে অবস্থানের সময় খাঁ সাহেব বাঙলা দেশের ক'টি বিশিষ্ট গৃহে যেমন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-সভায়, গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায় ভবনের আসরে—তাঁদের ঘরের রাগপদ্ধতি বাজিয়েছেন সুর-শৃঙ্গার যন্ত্রে।

হাবু দত্ত তাঁর কাছে রাগসঙ্গীতের যে তালিম পেয়েছেন তা বীণায় চর্চা করতেন এবং তাঁর ধ্রুপদ গানের উৎসও এখানে। তা ছাড়া তাঁর ক্ল্যারিও-নেটে তিনি রাগ সঙ্গীতের যে ঐশ্বর্য প্রকাশ করতেন তাও সেযুগে অভিনব ছিল। এবং শোনা যায়, উজীর খাঁও সেজন্যে তারিফ করতেন তাঁকে। বাঁশীতে সঙ্গীতকৃতির জন্যে তিনি উজীর খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

উজীর খাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া সম্বন্ধে এখানে একটি কথা উল্লেখ করে রাখা ভাল। তাঁর শিষ্য বা ছাত্র হওয়া এক দুর্লভ ঘটনা বলা

চলে। কারণ খাঁ সাহেবের শিষ্য গঠন ব্যাপারে অতিশয় পরিমিতি বোধ ছিল। সাধারণ কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে তাঁর কাছে আমল পাওয়াই ছিল কঠিন। অভিজাত পরিবার অর্থাৎ আশানুরূপ সম্মানমূল্য দানে সমর্থ কিংবা অসামান্য প্রতিভাধর ভিন্ন যে কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে রাগবিদ্যা লাভের যোগ্য বিবেচিত হতেন না। সেকালের সঙ্গীত ব্যবসায়ীদের পক্ষে, বিশেষ ভারতবিশ্রুত ঘরানাদারদের পক্ষে এই রকম মনোভাব নতুন ছিল না, তবে উজীর খাঁর ক্ষেত্রে উন্নাসিকতা ছিল নাকি আরও বেশি। যার আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর কাছে শিক্ষালাভের প্রত্যাশায় আলাউদ্দীন খাঁর দীর্ঘদিনের ধর্ণায়।

এইসব কারণে কলকাতায় উজীর খাঁর ছাত্র ছিলেন তিনজন মাত্র। তাঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রতিভাধর হলেও একটি ব্যক্তিগত কারণে উজীর খাঁর শিক্ষার সুযোগ পান। অন্য দুজনই— পঞ্চেৎগড় জমিদার পরিবারের যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র এবং অমৃতলাল—বিশিষ্ট বংশের ধারকও ছিলেন সঙ্গীত-প্রতিভার সঙ্গে। উজীর খাঁর শিষ্য হবার মধ্যেই যে যোগ্যতার স্বীকৃতি আছে তা জানাবার জন্যে বিষয়টির উল্লেখ করতে হল।

উজীর খাঁ পরে আবার যখন রামপুর রাজ্যে ফিরে যান কলকাতা ত্যাগ করে, তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন দুজন বাঙালী শিষ্যকে। তাঁরা হলেন—হাবু দত্ত ও যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র। তাঁর এই দুই প্রিয় শিষ্য ওস্তাদের সঙ্গে রামপুরে গিয়ে সেখানে কয়েক বছর থাকেন। যাদবেন্দ্র ছিলেন হাবু দত্তের চেয়ে ৫।৮ বছরের বয়োকনিষ্ঠ।

অমৃতলাল এবং যাদবেন্দ্র একই সঙ্গে রামপুরে বাস করতে যান বটে, কিন্তু দুজনে দুরকম ভাবে সেখানে গিয়েছিলেন। যাদবেন্দ্র উজীর খাঁর কাছে আরও শিক্ষার উদ্দেশ্যে ওস্তাদের ইচ্ছায় রামপুর প্রবাসী হন। কিন্তু হাবু দত্তকে উজীর খাঁ নিয়ে যান শিক্ষা ভিন্ন আরও একটি কারণে। তিনি শিষ্যের শুধু ক্ল্যারিওনেট ও বীণা বাদনের গুণগ্রাহী ছিলেন না, তাঁর ঐকতান বাদন সংগঠনের প্রতিভাও লক্ষ্য করেছিলেন। তাই খাঁ সাহেব তাঁকে নিয়ে যান নবাব দরবারে নিযুক্ত করে দেবার জন্যে।

উজীর খাঁর ব্যবস্থাপনায় হাবু দত্ত রামপুর নবাবের দরবারী ঐকতান বাদনের ভার পেলেন। সেখানে ঐকতান বাদ্যের দল গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দেন হাবু দত্ত কয়েক বছর ধরে। এই সময়ে তিনি

শুধু ঐকতান বাদন নিয়েই কালাতিপাত করেননি, উজীর খাঁর কাছে শিক্ষাও পেয়ে আসেন।

তিনি সেখানে ঐকতান বাদন সংগঠনে এবং তাঁর সুর-সৃষ্টিতে একটি আদর্শ স্থাপন করেন যা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল পরবর্তীকালে। এবং সংশ্লিষ্ট মহলের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো কোনো ব্যক্তির মতে, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ উত্তর জীবনে যে 'মাইহার স্টেট ব্যাণ্ড' গঠন করেন তাতে হাবু দত্তের ঐকতান বাদনের কিছু প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

কারণ, যে রামপুর দরবারের ও সেখানকার থিয়েটার পার্টির ব্যাণ্ড হাবু দত্ত কয়েক বছর যাবৎ সংগঠিত ও পরিচালিত করেন, তিনি কলকাতায় ফিরে আসবার কয়েক বছর পরে আলাউদ্দীন খাঁ সেই একই চাকরি করেন নবাব দরবারে। অর্থাৎ উজীর খাঁর কাছে রামপুরে শিক্ষা আরম্ভ করবার পর আলাউদ্দীন খাঁ নবাবের ব্যাণ্ড পার্টির পরিচালক নিযুক্ত হন এবং রামপুরে কয়েক বছর ধরে আলাউদ্দীন খাঁ নবাবের থিয়েটারের 'ব্যাণ্ড মাস্টার' ছিলেন।

রামপুরে তাঁর এই ঐকতান বাদনের দল গঠন তাঁর পরবর্তীকালের বিখ্যাত মাইহার স্টেট ব্যাণ্ডের পূর্বসূরী।

এখন কথা হল এই যে, রামপুরে আলাউদ্দীন খাঁর অব্যবহিত পূর্বে হাবু দত্ত যে ঐকতান বাদনের ধারা প্রবর্তন করেন তার সমস্ত সুরসংযোজন রাগ-সঙ্গতের কাঠামোতে গঠিত। তা কয়েক বছর ধরে রামপুরে সম্মেলক যন্ত্র-সঙ্গীতে একটি আদর্শ বা ডৌল প্রদর্শন করেছে। তাঁর কোনো কোনো যন্ত্রী হয়ত আলাউদ্দীনের দলেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পুরাতন ও নতুনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। হাবু দত্তের রচিত কিছু কিছু গৎ বা সুর রচনাও হয়ত ভেসে আসতে পারে এই যুগে।

এত রকমের সম্পর্ক ও প্রভাব মুক্ত হয়ে নিরঙ্কুশ ভাবে কি হঠাৎ দেখা দিতে পারে আলাউদ্দীন খাঁর রামপুরের ব্যাণ্ড পার্টি কিংবা তার পরিশীলিত রূপ মাইহার স্টেট ব্যাণ্ড? বিশেষ, রামপুর 'সের আগে কলকাতায় হাবু দত্তেরই সাগরেদ হয়ে আলাউদ্দীন যখন বেশ কিছুকাল যন্ত্রসঙ্গীতের রেওয়াজ করেন? কলকাতায় হাবু দত্তের পরিচালিত থিয়েটারের ঐকতান বাদনের সঙ্গেও তো আলাউদ্দীন গোড়া থেকেই পরিচিত ছিলেন।

হাবু দত্ত ও আলাউদ্দীন খাঁর ঐকতান বাদনের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের

মতন এই প্রসঙ্গ কেন এসে গেল, তা বোঝা যাবে নিবন্ধের শেষে—ওস্তাদ আলাউদ্দীনের যন্ত্র-সঙ্গীতশিক্ষা ও স্মৃতিচারণের কথায়। এখানে তার ভূমিকা করা রইল।

রামপুর রাজ্যে হাবু দত্তের অবস্থানের মোদ্দা কথা এই, তিনি নবাবের ব্যাণ্ড পার্টি পরিচালনার চাকরি ভিন্ন উজীর খাঁর শিক্ষাও পেয়েছিলেন—একথা বলতেন স্বামী শ্যামানন্দ, যিনি প্রথম জীবনে হাবু দত্তের সঙ্গীত-শিষ্য এবং পরবর্তীকালে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে বিখ্যাত হন।...

কয়েক বছর রামপুরে বাস করে কলকাতায় ফিরে আসবার পর উপার্জনের তাগিদে হাবু দত্তকে থিয়েটারের আশ্রয় নিতে হল। এই পর্বে ঐক্যতান বাদন পরিচালনা, নাটকের গানের সুর রচনা ও পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গীত শিক্ষা দান এবং নেপথ্যে ক্ল্যারিওনেট বাদন সবই করেছেন প্রয়োজন অনুসারে। এ সময় রাগ-সঙ্গীতের আসর থেকে সম্পূর্ণ বিদায় না নিলেও থিয়েটারই তাঁর কর্মক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায়।

তবে তিনি যেসব গানের সুর কিংবা ঐকতান বাদন ও বাঁশীর গৎ রচনা করতেন তা' বিচ্যুত হত না রাগ-সঙ্গীতের কাঠামো থেকে। বেশিরভাগ তিনি ছিলেন ক্লাসিক ও মিনার্ভা থিয়েটারে—নাটকে সুর সংযোজনা করতেন, বাঁশীও বাজাতেন।

যত নাটকের গানে সুর দিতেন সবগুলির নাম জানা যায়নি, সেকালের দর্শকরাও অনেক সময় জানতেন না সঙ্গীত-পরিচালক কে। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, অভিনেতা-অভিনেত্রী ভিন্ন নাটকের অন্যান্য শিল্পী ও কর্মীদের নাম অপ্রকাশিতই থেকে যেত।

সে যুগের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ সঙ্গীত-পরিচালকের নাম তালিকাবদ্ধ করবার প্রয়োজন অনুভব করতেন না। তাই এবিষয়ে অন্যান্য গুণীদের সঙ্গে হাবু দত্তের অনেক অবদানও বিলীন হয়ে গেছে বাতাসে!

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' নামক মূল্যবান পুস্তকে তাঁদের কয়েকজনের নাম গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির প্রসঙ্গে মুদ্রিত করেছিলেন বলে কয়েকটি মাত্র নাটকের সুরসংযোজকদের কথা জানা গেছে! গিরিশ-চন্দ্রের অন্যান্য নাটকের গানের এবং অন্যান্য নাট্যকারদের গানের সুর-দাতাদের নাম বেশির ভাগই অজ্ঞাত। সেজন্যে হাবু দত্তেরও থিয়েটার-জগতে অনেক সুর সৃষ্টির পরিচয় বিলুপ্ত।

যেমন একটি কথা এ বিষয়ে জানা যায়। সিটি থিয়েটারের (মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে, রাজকৃষ্ণ রায়ের স্বত্বাধীনে বীণা থিয়েটার নামে এটি বেশী পরিচিত হয়) উদ্বোধন হয় 'হরিলীলা' নামক একটি গীতিনাট্য পরিবেশন করে।

এই গীতিনাট্যের রচয়িতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র এবং নাটিকার সমস্ত গানে সুরসংযোজনা করেন অমৃতলাল। কিন্তু সঙ্গীত-পরিচালক বা সুরসংযোজক-রূপে কোথাও তাঁর নাম প্রকাশিত হয়নি। অথচ 'হরিলীলা'র জনপ্রিয়তা হয়েছিল প্রধানত তার গীতাবলী ও তাদের সুরের জন্যে।

এই গীতিনাট্যটি এত জনপ্রিয় হয় যে, আরও অনেক জায়গায় অভিনীত হয়ে সে যুগে প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করে। এমন কি দূর রামপুরেও 'হরিলীলা' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অমৃতলাল সেখানে বাস করবার সময়ে।...

হাবু দত্তের শিষ্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার আগে তাঁর ব্যক্তি জীবনের একটি বিষয় এখানে বলে রাখা যায়, যদিও তার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক নেই। তিনি প্রথম জীবনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যেতেন, এ কথা আগে বলা হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি পরে আর সে যোগাযোগ রাখেননি বটে—সঙ্গীত-চর্চার ভিন্ন খাতে তাঁর জীবন-ধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্যে—তবু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির একটি দিক তাঁর জীবনে বরাবরই ছিল এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ভক্তরূপে গণনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁর স্মৃতিতে যে বার্ষিক রামকৃষ্ণ উৎসবের অনুষ্ঠান হত, হাবু দত্ত তার অন্যতম উদ্‌যোক্তা ছিলেন। জন্মাষ্টমীর দিন এই রামকৃষ্ণ উৎসব হত তাঁর বিশিষ্ট গৃহী শিষ্য রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে।

উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল রামচন্দ্র দত্তের শিমুলিয়ার মধু রায় লেনের বাড়ি থেকে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের একটি শোভাযাত্রা। এবং হাবু দত্ত ক্ল্যারিয়নেট বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রাটির পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব করে সমগ্র পথ পরিক্রমা করতেন। এই শোভাযাত্রা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হত তাঁর ক্ল্যারিওনেট বাদনের জন্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট হাবু দত্তের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা স্বামীজীর সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত কথিত বিবরণ তাঁর 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' (প্রথম খণ্ড, ৯-১০ পৃষ্ঠা) থেকে এখানে উদ্‌ধৃত করে দেওয়া হল :—'নরেন্দ্রনাথের মনে হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তো আর দেহ

রাখিবেন না। তবে এই সময়ে যাহাকে সম্মুখে পাইব তাহাকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করাইয়া মুক্তিলাভ করাইব। তিনি তাঁহার খুড়তুতো ভাই শ্রীঅমৃতলাল দত্তকে (সুপ্রসিদ্ধ বাদ্যাচার্য হাবু দত্ত) সঙ্গে লইয়া গেলেন।··· লোকটিকে লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপনীত হইলেন এবং জোর করিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন যেন তিনি ইহাকে স্পর্শ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ করিতে অনিচ্ছুক। তিনি বারংবার কহিতে লাগিলেন, "আমি মরতে বসেছি, এখন আর কাকেও ছুঁয়ে দিতে পারব না।" নরেন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। অবশেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হইলেন। লোকটি মেঝেতে বসিয়া রহিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাহার বক্ষস্থলে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। তখনই সেই লোকটা একেবারে সমাধি স্থির, নিস্পন্দ, পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিল। প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক সময় এইরূপে রহিলে নরেন্দ্রনাথের মনে ভয় হইল। পাছে মাথার শির ছিঁড়িয়া যায় এইজন্য অনেক করিয়া তাহার চৈতন্য আনাইয়া নীচেকার বাগানে লইয়া গিয়া বলিলেন···। সেই লোকটি তখন অর্ধনিদ্রিতবৎ অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি খুব নেশায় বুঁদ ছিলুম—ঐ বুঁদ নেশাটা চাই।" তদবধি সেই লোকটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিপূজা না করিয়া কখনও অন্নগ্রহণ করিতেন না।'···

এই ঘটনার সময়ে হাবু দত্তের বয়স ছিল ২৭।২৮ বছর।···

তাঁর ব্যক্তি জীবনের আরো কিছু বিবরণ এখানে দিয়ে দেওয়া যায় উপসংহারের আগে। তাঁর জীবন যে দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল, সে কথা প্রথমদিকে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন উৎকৃষ্ট যন্ত্রীরূপে প্রসিদ্ধ হলেও উপার্জন উপযুক্ত ছিল না নানা কারণে। দত্ত পরিবারের আর্থিক বিপর্যয় ঘটায় যৌবনকাল থেকে তাঁকে সঙ্গীত-চর্চাকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করতে হয়।

অবিবাহিত ছিলেন, তাই পারিবারিক বন্ধন বিশেষ ছিল না। জীবনটা কাটিয়ে দেন নিজের খেয়াল অনুযায়ী। নিজের গড়া পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একরকম সমাজছাড়া বসবাস। শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায় মানুষটির বেশভূষাও ছিল সাদাসিধে।

গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের এই বনেদী বংশ তখন নানা রকমে বিধ্বস্ত হয়েছিল। মধ্য বয়সে হাবু দত্তকে বিদায় নিতে হয় বিভক্ত-হওয়া এই বাড়ি থেকে। তারপর নানা জায়গায় তাঁর অসংলগ্ন, বিশৃঙ্খল জীবন দেখতে দেখতে কেটে যায়।

গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট থেকে প্রথমে বাস করতে আসেন মানিকতলা স্ট্রীটে। সেখানে এক বছর থাকেন। তারপর যান মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে। সেখানেও বছর খানেক কাটে। তারপর শেঠের বাগান অঞ্চলের একটি বাড়িতে কিছুদিন। শেষ বাস আহিরিটোলায়।

জনাইয়ের মুখুজ্যে পরিবারের এক সরিকের আহিরিটোলার বসত-বাড়ি। এখানে এই পরিবারের এক ব্যক্তির আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে হাবু দত্তের অন্তিম জীবন অতিবাহিত হয়। এ বাড়ির সামনের দিকের একটি ঘরে যেদিন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে, তখন তিনি একেবারে নিঃস্ব।

কিন্তু সঙ্গীত-জগতে তিনি কি কিছু রেখে যাননি যার জন্যে তাঁর নামকে কেউ স্মরণ করে ?

সঙ্গীতশিল্পীদের বিবরণ তো সেকালে কিছুই রক্ষা করা হত না, তাই পরবর্তীকালে তাঁদের সম্বন্ধে যত কথা জানবার তার অনেকখানিই জানতে পারা যায় না। সেই বিস্মৃতির পরপার থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর শিষ্য গঠনের বিষয়ে। তাঁর শিষ্যদের কথা উল্লেখ করবার প্রসঙ্গে তাঁর বিষয়ে আর একটি কথা বলা যায়। তিনি ক্ল্যারিওনেট, বীণা, এসরাজ ও সুরবাহার বাজাতেন, আগে বলা হয়েছে। তা ছাড়া তাঁর বেহালা, সেতার ইত্যাদি আরও কটি যন্ত্রে চর্চা ছিল এবং নানা যন্ত্রে শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের, যিনি চেয়েছেন যে যন্ত্র শিখতে।

তাঁর কাছে সুরেন্দ্রনাথ পাল শিখেছিলেন ক্ল্যারিওনেট ও বেহালা। সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী—ক্ল্যারিওনেট। শশিভূষণ দে (ইনি অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের প্রথম সঙ্গীতগুরু খেয়াল-গায়ক শশিভূষণ দে নন; বেহালা-বাদক তারকনাথ দের ইনি পিতা)—এসরাজ, ক্ল্যারিওনেট ও বেহালা। হরিহর রায়—ধ্রুপদ গান। শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এসরাজ। নারায়ণ পাল (সেকালের খ্যাতনামা অভিনেতা মন্মথনাথ পালের ভ্রাতা) হাবু দত্তের অধীনে কয়েকটি যন্ত্রে শিক্ষালাভ করে ঐকতান বাদনে অভিজ্ঞ হন এবং পরে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দরবারী বাদক নিযুক্ত হয়ে সেই স্টেটের military band গঠন করে যশস্বী হন। হাবু দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ (তমু-বাবু)-ও এসরাজ, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্রের বাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন জ্যেষ্ঠের শিক্ষায়। তা ছাড়া, হরি গুপ্ত, চুনীলাল মিত্র (মোহনলাল মিত্রের পুত্র) প্রভৃতিও তাঁর ছাত্র।

ছাত্রদের কথায় হাবু দত্তের একটি মন্তব্যের কথা জানা যায়। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেন—'সুর শেখানো যায়। তালও শেখানো যায়। কিন্তু লয় বহু দিনের অভ্যাসে তবে ছাত্র নিজে আয়ত্ত করতে পারে। লয় কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না।'

হাবু দত্তের ছাত্রদের মধ্যে উত্তর-জীবনে সবচেয়ে বিখ্যাত হন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ। শীতল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই সময়ে তিনি হাবু দত্তের কাছে বিভিন্ন যন্ত্রে শিক্ষা করেছিলেন। শুধু যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা নয়, অন্য বিষয়েও তিনি দত্ত মশায়ের কাছে উপকৃত।

মফস্বলে যাত্রার দলে শীতলবাবুর সঙ্গে খাঁ সাহেবের আলাপ হবার পর দুজনে কলকাতায় আসেন ভালভাবে সঙ্গীত-শিক্ষার আশায়। প্রথমে আলাউদ্দীন খাঁ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে কণ্ঠ-সঙ্গীত শিখতেন।

চক্রবর্তী মশায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে হাবু দত্তের কাছে শিখতে আরম্ভ করেন যন্ত্র-সঙ্গীত, একাধিক যন্ত্রে। কলকাতা শহরে আলাউদ্দীন তখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, সহায় সম্বলহীন। হাবুবাবু সে সময় তাঁর শুধু সঙ্গীতগুরুই ছিলেন না, (মিনার্ভা ?) থিয়েটারে যন্ত্রবাদক হিসেবে ছাত্রের চাকরিরও ব্যবস্থা করে দেন।

হাবু দত্তের ঐকতান বানের সঙ্গেও আলাউদ্দীন খাঁ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এ সময়ে। (খাঁ সাহেবের উত্তরকালের ঐক্যতান বাদন গঠনের ওপর হাবু দত্তের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে)।

সমগ্রভাবে যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়ে আলাউদ্দীন খাঁ যে ঋণী ছিলেন দত্ত মশায়ের কাছে, এ কথা বোঝা যায়—তবে কতখানি, তা বলা সম্ভব নয়। কারণ এ বিষয়ে কোনো সমসাময়িক লিখিত বিবরণও নেই। তবে এসব সম্পর্কে একটি অপরূপ বিবৃতি আছে স্বয়ং আলাউদ্দীন খাঁর। খাঁ সাহেবের এই উক্তি থেকে দত্ত মশায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাবে কি না কিংবা তাঁর মতামত যথোচিত বা ছাত্রোচিত হয়েছে কি না এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করে সুধী পাঠক-পাঠিকাদের ওপরে সে বিচারে ভার ছেড়ে দেওয়া যাক।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ বৃদ্ধ বয়সে অভাবিত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার তুঙ্গভূমিতে আরোহণ করে তাঁর অতীতকালের সঙ্গীত-গুরুর দিকে এইভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন স্মৃতিচারণের সময় (তাঁর 'আমার কথা' পুস্তিকায় ১১ পৃষ্ঠার) :

"বিবেকানন্দের ভাই হাবু দত্ত। সিমলায় থাকেন।…হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট,

সেতার, অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের কন্সার্ট তৈরি করতেন। গেলাম তাঁর কাছে। 'কি শিখবে, গান শিখবে?' 'আজ্ঞে না যন্ত্র শিখব। বেহালা।' ইংরেজী বাণ্ড, শানাই শুনে বড় ভাল লাগত। শিখতে লাগলাম। হবু দত্তের তৈরি কন্‌সার্টের সুর—ইমন। একেকদিন চার পাঁচটা গৎ শিখি। একমাসে ওঁর খাতা শেষ করে দিলাম।"

অহমিকাময় এই বিবৃতির 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কথাটি তো আস্ত প্রমাদ। (ন্যাশনাল কিংবা গ্রেট ন্যাশনাল দু'টিই আলোচ্যকালের অনেক আগে গতায়ু)। ভারতবিখ্যাত ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত না হয় এটি তাঁর বিস্মৃতিই বলা গেল! তবে ওই—'এক মাসে ওঁর খাতা শেষ করে দিলাম' উক্তির বিষয়ে কি মন্তব্য করা যাবে? ওস্তাদজীর সেকালের সতীর্থ শীতলবাবু আজ জীবিত থাকলে বলতে পারতেন খাঁ সাহেব দত্ত মশায়ের খাতা একমাসে শেষ করেছিলেন কিংবা প্রায় দু'বছর শিখেছিলেন তাঁর কাছে।

বিগত দিন—ভূত। তাই মাঝে মাঝে ভূতের নৃত্য দেখা যায়। সেকালে একটি কথা, অন্যান্য জায়গার মত সঙ্গীত-সমাজেও চলিত ছিল—গুরুর ঋণ পরিশোধ করা যায় না। কিন্তু একালে দেখা যাচ্ছে যে তা শোধ করা যায় সুদে-আসলে!

॥ পিছন থেকে সঙ্গত ॥

এ যেন একটা উদ্ভট কথা। পিছন থেকে স ঙ্গত হয় নাকি? সঙ্গত হবে সামনা-সামনি কিংবা পাশাপাশি বসে।

রাগ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সঙ্গতের রীতিমত গুরুত্ব। সঙ্গতকারের মর্যাদাও তেমনি। তাঁকে না হলে আসর জমে না, চলেও না। অসম্পূর্ণ থেকে যায় সঙ্গীত পরিবেশন।

সঙ্গীতের যেখান থেকে তালের অংশ আ..ভ, তখন থেকে সঙ্গত অঙ্গাঙ্গী। মূল সঙ্গীতের ধারাকে ছন্দের কারুকর্মে সুসমঞ্জস করে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে সহায়তা করেন সঙ্গতকার।

গায়ক বা যন্ত্রীর সঙ্গে তাল রক্ষা করা সঙ্গতের মুখ্য কায। কিন্তু তা-ই সব নয়। ছন্দ সৃষ্টির অপরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে সঙ্গতকার আর এক

অভিনব সৌন্দর্যের সন্ধান দেন। তাল লয় ছন্দের সৃজনলীলায় গায়ক বা যন্ত্রী এবং সঙ্গতিয়া পরস্পরের পরিপূরক। দুয়ে মিলে সম্পূর্ণতা। দুজনে দুদিক থেকে সার্থক করেন সঙ্গীতক্রিয়া। একজন যখন রাগের রূপ বিস্তার করে চলেন সেই সুর-বিহারের সময়ে সঙ্গতকার শুধু তাল রক্ষা করেন, অন্তঃসলিলা লয়ের ধারা বজায় রাখেন।

কিন্তু মূল সঙ্গীতে তান তোড়ার সঙ্গতে সঙ্গতকারও সৃজনশীল শিল্পী। নব নব ছন্দ প্রকরণে তখন সঙ্গত যন্ত্র মুখর হয়ে ওঠে। দুজনে তখন সৃষ্টিকর্মে অন্তরঙ্গ, একাত্ম। সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে পারস্পরিক ভাব বিনিময় চলতে থাকে। সুর ও ছন্দের সুললিত সমন্বয়। দুই শিল্পীর মুখ চোখ, দীপ্ত অবয়বে তখন অন্তরের সৃষ্টি ধারার যোগাযোগ। পরস্পরের মনের মুকুর। মূল সঙ্গীতকার আর সঙ্গতকার কেউ কারুর অন্তরালে থাকতে পারেন না। ভাব সম্মিলনের অভাব ঘটে তাহলে।

কিন্তু এই বিশেষ আসরে এ নিয়মের ব্যতিক্রম। কাসিম আলীর জন্যেই এমনটা হল। তানসেনের পুত্র বংশের স্বনামধন্য রবাবী-বীন্‌কার। আসরটা অবশ্য সাধারণের জন্যে নয়। ভাওয়ালরাজার নিজস্ব আসর, তার দরবারে। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা যাঁকে নিয়ে হয় তাঁর অনেক আগেকার কথা। তখন তাঁর পিতার আমল। সে আর এক যুগ। আর এক পরিবেশ। সংস্কৃতিবান রাজেন্দ্র নারায়ণের আমলের ভাওয়াল।

সঙ্গীত ও সাহিত্যের সেবায় নিবেদিত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ভাওয়াল দরবার। গল্প আরম্ভ করবার আগে সেসব কথা বলতে হবে। কারণ এই গল্পে যেমন আছেন কাসিম আলী খাঁ, তেমনি রাজেন্দ্রনারায়ণও।

সেকালের পূর্ববঙ্গে সঙ্গীতচর্চার জগতে ভাওয়ালরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা শহর, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা আর ভাওয়ালকে নিয়ে রাগসঙ্গীতের সেই গৌরবের ক্ষেত্র। তার একদিকে স্থানীয় গুণীদের চর্চা, অন্যদিকে পশ্চিমা কলাকারদের ধারা। ত্রিপুরা আর ভাওয়াল দরবারে হিন্দুস্থানের কত গুণীই এসে এখানকার সঙ্গীত-জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন! আর সেই সঙ্গে চলেছে এইসব অঞ্চলের সঙ্গীতজ্ঞদের চর্চা। সকলের সম্মিলিত দানে পূর্ববঙ্গে রাগসঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি।

পূর্ববঙ্গের সেযুগে রাগসঙ্গীত চর্চার এইগুলিই প্রধান কেন্দ্র। তার মধ্যে ঢাকা শহর, ভাওয়াল আর ত্রিপুরার মধ্যে যোগাযোগ যেন বেশি। বিশেষ

ঢাকা শহর আর ভাওয়ালের মধ্যে। ভাওয়ালের কথা বলতে গেলে, অন্তত রাজেন্দ্রনারায়ণের আর আতা হোসেনের তবলা প্রসঙ্গে ঢাকার কথা এসে যায়। শুধু নৈকট্যের জন্যে নয়, ঢাকা শহর আর ভাওয়ালে তবলা চর্চার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ওস্তাদ আতা হোসেনকে কেন্দ্র করে এই দুই স্থানে তবলা বাদনের ধারায় যোগাযোগ ছিল।

ভাওয়াল দরবারে কাসিম আলী আর রাজেন্দ্রনারায়ণের সেই গল্পটা আরম্ভ করবার আগে ভাওয়াল আর ঢাকার সঙ্গীতক্ষেত্রে একবার পরিক্রমা করে নেওয়া যাক, তবলা পাখোয়াজ বাদনের সূত্রে।

ঢাকার সঙ্গীত-চর্চার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতন। বিশেষ সেতার, তবলা, ও পাখোয়াজ বাদনের। দেখা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতেই ঢাকা অঞ্চলের শিল্পীরা বেশি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা ভাল। ঢাকা সঙ্গীতকেন্দ্র হিসেবে খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও পূর্ববঙ্গের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকেন্দ্র ছিল না। সে বিষয়ে ত্রিপুরার গৌরবও কম নয়। এমন কি কোনো কোনো বিষয়ে হয়ত বেশিও। সঙ্গীত-চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে পূর্ববাঙলার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র বলতে ত্রিপুরার নাম অনেকের প্রথমে মনে আসে। ত্রিপুরার দরবারী সঙ্গীত চর্চায় পরিচয় সংক্ষেপে দিতে গেলেও একটি পৃথক অধ্যায়ের প্রয়োজন। এ নিবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে দু-এক জায়গায় ত্রিপুরার কথা উল্লেখ করা হবে মাত্র।

ঢাকা এবং বিশেষ করে ভ ওয়ালের প্রসঙ্গই এখানে মুখ্য।

বাঙলার যে ক'টি সঙ্গীতকেন্দ্রে সেতার-চর্চার ধারা সবচেয়ে প্রাচীন, ঢাকা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকা, করে আছে। কিন্তু সেতারবাদনও এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়।

তবলার সঙ্গেই বিষয়টির সম্পর্ক। পাখোয়াজের সঙ্গেও যে সম্পর্ক একেবারে নেই তাও নয়। কারণ পাখোয়াজের তারপরণ তবলায় বাজানো নিয়েই আলোচ্য ব্যাপার। তাই ঢাকার পাখোয়াজ বাদকেরও কিছু উল্লেখ থাকবে। তাছাড়া তবলা ও পাখোয়াজ স্বগোত্র—দু'টিই সঙ্গতের যন্ত্র। বিশেষ এমন কোনো কোনো সঙ্গতী ঢাকায় ছিলেন, যাঁরা দু'টি যন্ত্রেরই সাধক। যেমন, গৌরমোহন বসাক, প্রসন্ন বণিক প্রভৃতি।

ঢাকায় রাগসঙ্গীত চর্চার এই সব ধারার পরিচয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই পাওয়া যায়। অন্যান্য যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের মতন সেখানকার

তবলাবাদনও ওই সময় থেকে বেশ ভালভাবে হতে থাকে।

ঢাকার পাখোয়াজ-চর্চার গৌরবময় যুগও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তবলার কথা আরম্ভ করবার আগে সেখানকার গুণী পাখোয়াজীদের নাম উল্লেখ করে রাখা যাক। পরে আর পাখোয়াজের প্রসঙ্গ আসবে না।

ঢাকা অঞ্চলের গুণী পাখোয়াজ বাদকরা সকলেই বসাক পদবীধারী। যথা—উপেন্দ্রনাথ বসাক, রামকুমার বসাক, গৌরমোহন বসাক, সতীশচন্দ্র বসাক প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বোধ হয় উপেন্দ্রনাথ বসাক। গৌরমোহনও একজন নেতৃস্থানীয় পাখোয়াজ-শিল্পী হিসেবে নাম করেন। উপরন্তু তিনি তবলাবাদকও।

ঢাকার তথা সমগ্র বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাগুণী প্রসন্ন বণিক্যের প্রথম গুরু হলেন গৌরমোহন বসাক। প্রসন্নকুমার গৌরমোহনের কাছে বিশেষ করে পাখোয়াজ শিখেছিলেন এবং তবলাও। উত্তরজীবনে প্রসন্নকুমার তবলার সাধনাতেই বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং বহুবিখ্যাত তবলাবাদক-রূপে সুপরিচিত হন। যেমন প্রচুর ছিল তাঁর বোলের সংগ্রহ, তেমনি সাধা-হাতের কলা-নিপুণ বাদক ছিলেন তিনি। কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রেও তিনি অনেক সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন, জানা যায়। তবলায় তাঁর দ্বিতীয় গুরু হলেন আতা হোসেন। আতা হোসেনের পরিচয়-কথা পরে দেওয়া হবে।

প্রসন্ন বণিক্য শুধু সঙ্গতকার হিসেবে নয়, তিনি আরও স্মরণীয় থাকবেন তাঁর দু'টি বইয়ের জন্যে। তাঁর 'তবলা তরঙ্গিণী' ও 'মৃদঙ্গ-প্রবেশিকা' নামে বই দু'খানি শিক্ষার্থীদের বেশ প্রয়োজনীয় বলা যেতে পারে।

ঢাকার স্বনামধন্য সেতারী ভগবান দাসের বাজনার সঙ্গে সঙ্গতে প্রসন্নকুমারের প্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করত বলে কথিত আছে। তাঁরা দু'জন ছিলেন প্রায় সমবয়সী।

প্রসন্নকুমারের তবলায় অনেক শিষ্যও হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের ঢাকার বিখ্যাত তবলাগুণী কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (রায় বাহাদুর) প্রথম তবলা-শিক্ষকও বণিক্য মশায়। প্রসন্নকুমারের অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে রাম-গোপালপুরের হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (Musicians of India, Pt. I—পুস্তকের লেখক), আসাম গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, হেমচন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

প্রসন্নকুমার কিংবা গৌরমোহন বসাকের সঙ্গীত-চর্চার কাল যে ঢাকায় তবলাবাদনের আদিযুগ তা নয়। তাঁদের আগেকার পর্যায়ের তবলাবাদকরাও ছিলেন। কিন্তু কোন্ সময়টি যে এ অঞ্চলে তবলাবাদনের ক্ষেত্রে আদিতম যুগ এবং কে বা কারা এ বিষয়ে পথিকৃত তা সঠিক জানা যায়নি।

যখন থেকে ঢাকা শহরে তবলা চর্চার কথা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, তার প্রথম ধারায় এই ক'জন গুণীর নাম পাওয়া যায়। বর্ণনার সুবিধার জন্যে তাঁদের উল্লেখ করা যাক প্রথম পর্যায়ের বলে। কারণ তাঁদের চেয়ে পূর্ববর্তী তবলাবাদনের ধারার সন্ধান এ অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য ভাবে পাওয়া যায়নি।

এই পর্যায়ে বেশি বিখ্যাত এবং গুণী তবলাবাদক-রূপে তিনজনের নাম উল্লেখ্য। তাঁরা ভিন্ন অন্য তবলাবাদকও নিশ্চয় ছিলেন, কিন্তু তিনজনই সম-সাময়িককালের নেতৃস্থানীয় বলে স্মরণীয় আছেন। তাঁরা হলেন সাধু ওস্তাদ, সুপ্পন খাঁ এবং দ্বারকানাথ সফরদার।

ঢাকার প্রথম পর্যায়ের সবচেয়ে সুপরিচিত এই তবলিয়া ত্রয়ীর মধ্যে দ্বারকানাথ সফরদার ঢাকার সন্তান ছিলেন। কিন্তু প্রথম দু'জন, সাধু ওস্তাদ এবং সুপ্পন খাঁ সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তাঁরা বহিরাগত এবং অবাঙালী। তবে তাঁরা দু'জনই ঢাকায় তাঁদের প্রায় সমগ্র সঙ্গীত-জীবন অতিবাহিত করেন।

তিনজন গুণীর সঙ্গীত-জীবন ও বাস্তবজীবনের বিষয়েই অতি অল্প তথ্য পাওয়া যায়। তাঁদের সকলের ওস্তাদের নাম বা কোন্ অঞ্চলের বাদ্যরীতির তাঁরা ধারক কিংবা তাঁদের সঠিক জীবনকাল এসব তথ্যই অজ্ঞাত আছে।

তাঁদের মধ্যে আবার দ্বারকানাথ সফরদারের শিষ্য গঠনের কথাও কিছু জানা যায় না। তিনি উত্তম তবলাবাদক ছিলেন এই কথাই প্রচারিত আছে মাত্র।

সুপ্পন খাঁরও গুণী লোক ও ভাল বাজিয়ে বলে নাম ছিল। তাঁর পিতা মিঠন খাঁ ছিলেন খ্যাতিমান তবলাবাদক। কিন্তু সুপ্পন খাঁ নাকি পিতার কাছে শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাঁর ওস্তাদ ছিলেন হোসেন বখ্স্ ও অন্যান্য গুণী।

সুপ্পন খাঁ নাকি সঙ্গতকার হিসেবে খুব সুবিধা করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সংগ্রহ বেশ ভাল ছিল। একক বাদনে বোলগুলি বাজাতেন বেশ। লহরা বাজাবার রেওয়াজ অবশ্য সেকালে ছিল না।

তিনি কয়েকজনকে শিখিয়েছিলেন, জানা যায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বেশি তালিম পান ঢাকার একরামপুর অঞ্চল-নিবাসী ফেলু চক্রবর্তী (ঠাকুর)।

আর সবচেয়ে হাত ভাল ছিল বোধ হয় ঢাকার তাঁতিবাজার পাড়ার বাসিন্দা শশীমোহন বসাকের। দুর্গাদাস লালা এবং স্থানীয় এক জমিদার ও রইস, শৌখীন বাদক খাঁ বাহাদুর আলাউদ্দীন আহম্মদ ও সুপ্পন খাঁ আর দুই শিষ্য।

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলের ঈষৎ পশ্চিমে বাবুর বাজারের কাছে খর্বাকৃতি, শ্মশ্রুধারী সুপ্পন খাঁ বাস করে গেছেন।

সাধু ওস্তাদ নামে সুপরিচিত তবলাগুণীর সম্পূর্ণ নাম ছিল সাধুচাঁদ চন্দ।

নামটি বাঙালীর মতন শোনালেও ওস্তাদ নাকি অবাঙালী ছিলেন এবং অন্য স্থান থেকে এসে ঢাকা-বাসী হয়েছিলেন। তবলা-বাদক হিসেবে তিনি ছিলেন সঙ্গীত-ব্যবসায়ী। ঢাকা অঞ্চলের তিনি বিখ্যাত তবলাশিল্পী হন, নিজের পরিবারে তবলা-চর্চার ধারা প্রবর্তন করেন এবং অনেক শিষ্যকেও শিক্ষা দেন। তাঁর পূর্বনিবাস কিংবা তাঁর ওস্তাদের নাম পরিচয় সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই জানা যায়নি।

সাধু ওস্তাদের দুই পুত্রই—মহাতপচাঁদ চন্দ ও গোলকচাঁদ চন্দ—তবলা-বাদক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাতপচাঁদ পিতার শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠ গোলকচাঁদ শিখেছিলেন পিতার এক শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের (তাঁর ডাক-নাম পুটু) কাছে। গোলকচাঁদের এক শিষ্য ছিলেন জয়দেবপুরের ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধু ওস্তাদের বংশে এমনিভাবে তবলা-চর্চার ধারা দেখা যায়।

নিজের পরিবার ভিন্ন সাধুচাঁদ অন্যান্য শিষ্যও গঠন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান হলেন ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়-চৌধুরী। রাজেন্দ্রনারায়ণই এই আখ্যায়িকার নায়ক, তাঁর প্রসঙ্গে পরে আরও জানাবার আছে। সাধু ওস্তাদের সম্বন্ধে এবং আর এক জন তবলা-গুণীর কথা এখানে আর কিছু বলে নেওয়া যাক।

রাজেন্দ্রনারায়ণ ভিন্ন সাধু চন্দের আর একজন শৌখীন কিন্তু কৃতী শিষ্য সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী। সারদাপ্রসাদ ছিলেন ভাওয়াল পরগণারই কাসিমপুরের জমিদার এবং রাজেন্দ্রনারায়ণের চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ। সাধু ওস্তাদের কাছে তিনি রাজেন্দ্রনারায়ণের চেয়ে আগে থেকে তালিম নিতেন। সাধু ওস্তাদকে রাজেন্দ্রনারায়ণ যেমন জয়দেবপুরে, তেমনি সারদাপ্রসাদ কাসিমপুরে নিয়ে গিয়ে রাখতেন ভালভাবে শেখবার জন্যে।

সাধু চন্দ এইভাবে ঢাকা অঞ্চলের সঙ্গীতসমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হন। ঢাকা

শহরের কাহেরটুলি নামে পল্লীতে স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

ঢাকার তবলা-চর্চার প্রথম যুগের এই তিনজন সমসাময়িক গুণীর মধ্যে সাধু ওস্তাদেরই নাম-ডাক বোধ হয় সবচেয়ে বেশি ছিল এবং শিষ্যগৌরবও তাঁর সমধিক।

এই ত্রয়ীর আরও একজন সমসাময়িক কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন গৌরমোহন বসাক। আগেই বলা হয়েছে যে. পাখোয়াজ ও তবলা দুই যন্ত্রেই তিনি সঙ্গতের সাধনা করতেন। ঢাকা শহরের নবাবপুর অংশ সঙ্গীতচর্চা বিশেষ তবলাচর্চার জন্যে বিখ্যাত ছিল সেকালে। সেখানে পাড়ায় পাড়ায় সঙ্গীত-সেবক ও সঙ্গীতসাধকদের অবস্থান ছিল। গৌরমোহনও ছিলেন সেই নবাবপুরের একজন বিশিষ্ট ও সুপরিচিত বাসিন্দা।

গৌরমোহনের শিষ্যদের মধ্যে প্রসন্নকুমার বণিক্যের খ্যাতিই সবচেয়ে বেশি। আনন্দমোহন নামে গৌরমোহনের পুত্রের কথা জানা যায়, তিনিও সঙ্গীতকাররূপে নাম করেছিলেন। কিন্তু তিনি নাকি পিতার কাছে বেশি শিক্ষার সুযোগ পাননি—ঢাকা এবং কলকাতা দু'জায়গাতেই তাঁর অন্য সঙ্গীত গুরু ছিলেন।

ঢাকা অঞ্চলে তবলাবাদনের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় গুণীবৃন্দ এবং তাঁদের শিষ্যদের এই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁরা সকলে প্রায় স্থায়ীভাবেই ঢাকায় বসবাস করেন।

কিন্তু তাঁরা ছাড়াও আরও কয়েকজন ওস্তাদ ছিলেন যাঁরা মাঝে মাঝে আসতেন ঢাকায়। আসর, মজলিস উপলক্ষ্যে মুজরো নিয়ে সঙ্গত করে যেতেন। আমন্ত্রিত হতেন এখানকার কোন দরবারে। এমন কি, ঢাকার কোন কোন শিক্ষার্থী তাঁদের বারো মাসের ডেরায় গিয়ে তালিম নিতেন। আবার মাঝে মাঝে এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে অংশ নেবার ফলে স্থানীয় 'বাদকরা তাঁদের বাদনরীতির সঙ্গে পরিচিত থাকতেন। এই ভাবে ঢাকার সঙ্গীত-জগতের সঙ্গে একটা পরোক্ষ যোগাযোগ থাকত সেই সব ওস্তাদদের।

এমনি একজন গুণীর নাম আতা হোসেন। তিনি উনিশ শতকের ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ তবলিয়া ছিলেন। আসলে আগ্রার লোক, হোসেন বখ্‌সের পুত্র। কিন্তু আতা হোসেন তাঁর সঙ্গীত-জীবনের বেশির ভাগই কাটিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে, সেখানকার নবাব দরবারের বাদক নিযুক্ত থেকে।

বহু বছর আতা হোসেন অবস্থান করেছিলেন মুর্শিদাবাদে এবং বৃদ্ধ বয়সে

তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে। ঢাকার প্রসন্ন বণিক্য যে উত্তরজীবনে তাঁর শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাও মুর্শিদাবাদে। এখানে আতা হোসেনের আর একজন শিষ্যও হন। তাঁর নাম কাদের বখ্‌স এবং তিনি সুপ্রাচীন বয়সে সম্প্রতি গত হয়েছে।

কলকাতার এক কৃতী তবলাবাদক—বিশ শতকের প্রথম পাদকে বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন এবং কৌকব খাঁর বাজনার সঙ্গে সঙ্গত করতেন। তাঁর নাম অবনীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আতা হোসেনের তালিমও পেয়েছিলেন, শোনা যায়।

আতা হোসেনের জন্ম হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে। তাঁর সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, তিনি তবলাবাদকরূপে ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেখানে গুণপনার পরিচয় দিয়ে অতি সম্মানলাভ করেন। রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উৎসবের সময়ে এবং সেই উপলক্ষ্যে বিলাত যান তিনি।

মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে নিযুক্ত থাকবার সময়ে আতা হোসেন সাগর পাড়ি দেন। তখনকার প্রসিদ্ধ সরোদবাদক এনায়েৎ হোসেন খাঁর সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে নেওয়া হয় তাঁকে। সরোদী এনায়েৎ হোসেন ভাওয়াল-রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের দরবারের বাদক ছিলেন, তাঁর কথা পরে বলা হবে।

এই দুই বাদকের ইংলণ্ড যাবার কালটা হল ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ। ভারত-বর্ষের বাজিয়েদের পক্ষে সেকালে বিলাত যাওয়া এক অসাধারণ ব্যাপার ছিল। সেখানকার বাসিন্দাদেরও ভারতীয় বাদকদের বাজনা শোনা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, সন্দেহ নেই।

আতা হোসেনের সাধা হাতের অত্যন্ত দ্রুত লয়ের সঙ্গত ইংলণ্ডের আসরে অসামান্য চমক সৃষ্টি করেছিল, শোনা যায়। এই অদ্ভুত-দর্শন বাজনার বিদ্যুৎগতি সেখানকার শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দিয়েছিল। বাজনার শেষে শ্রোতাদের অনেকে উঠে এসে বাদকের হাত এবং যন্ত্রটিকে বিশেষ করে পরীক্ষা করে দেখেন, ব্যাপারটি বোঝবার জন্যে। যন্ত্রের চামড়ার 'ওপর বাদকের হাত কি করে এত অবাধে চলেছে, হাতের সঙ্গে বাজনাটা মুহুর্মুহু কি করে এমন মিলে যাচ্ছে, এ তত্ত্ব তাঁদের ধারণার অতীত। তাঁরা শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি খাটিয়ে বাদকের হাত নিয়ে হাতে ঘষে দেখলেন কিছু রাসা-য়নিক তরল দ্রব্য মাখানো আছে কিনা—যার ফলে এমন ঘন আওয়াজ

হচ্ছে। কিন্তু বাদকের হাতে তেমন কিছু লেপন করা নেই দেখে হতাশ হলেন এবং আরও বেড়ে গেল তাঁদের বিস্ময়ের মাত্রা। তা হলে কেমিক্যাল বা অন্য কোনো কিছুর সাহায্য না নিয়েই বাদক এমন আশ্চর্য দক্ষতায় বাজিয়েছেন!

এই হল রাগ সঙ্গীতে ও তার সঙ্গতে অপরিচিত তখনকার ইংলণ্ডের শ্রোতাদের আতা হোসেন খাঁর তবলা শোনার গল্প।

তবু খাঁ সাহেবের বয়স তখন অন্তত ষাট বছর। তাঁর যৌবনকালের বাজনা শুনলে বিদেশী শ্রোতাদের আবার কি ধারণা হত, কে জানে!

এ দেশেও আতা হোসেনের তৈরী হাতের বাজনার জন্যে রীতিমত খ্যাতি ছিল। তাঁর সেই বড় বড় আঙুলে তখনকার আমলের বড় মুখের তবলায় সৃষ্টি করত গম্ভীর ধ্বনির ছন্দ-বৈচিত্র্য। সেকালের সেই বড় মুখের তবলার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করবার মতন।

এখানকার বেশির ভাগ (যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহার্য) তবলার যেমন মুখ ছোট হয় এবং সেজন্যে খুব চড়া পর্দায় (তারা গ্রামের সা-তে) বাঁধা হয়, সে যুগে তার চলন ছিল না। তখনকার বড় মুখের তবলা বাঁধা হত মুদারা গ্রামের কোমল গান্ধার কিংবা বড় জোর পঞ্চমে। যেমন কণ্ঠসঙ্গীতে তেমনি যন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতাতেও। সেসব তবলায় বাদকরা হাতের তালুর কাজ অনেক বেশি দেখাতেন এবং এখনকার তুলনায় ধেরে ধেরে ইত্যাদি বোলের প্রাচুর্য ছিল।

আতা হোসেন সেকালের তবলা বাদন পদ্ধতির এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে দীর্ঘকাল অবস্থানের সময় ঢাকার সঙ্গীত-ক্ষেত্রের সঙ্গেও তাঁর সংস্রব ছিল, এসব কথা আগেই বলা হয়েছে।

আতা হোসেনকে ভাওয়াল-রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ একাধিকবার আনিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীত দরবারে! কিন্তু খাঁ সাহেবের কাছে রাজেন্দ্রনারায়ণ তালিম নেননি। তাঁর ওস্তাদ ছিলেন একমাত্র সাধু চন্দ। আতা হোসেন ভাওয়াল দরবারে সাময়িকভাবে বাজিয়ে যেতেন এবং রাজেন্দ্রনারায়ণের বাজনা শুনে তারিফ করতেন।, তাঁর বাজনার প্রশংসা করে বলতেন যে, ধনী লোকদের মধ্যে এমন বাজনা বেশি শোনেননি তিনি।

ভাওয়াল দরবার সেকালে শুধু পূর্ববঙ্গে নয় অখণ্ড বাঙলা দেশের সঙ্গীত-জগতেও একটি বিখ্যাত আসর ছিল। তবে সে কথা এখনকার সাধারণের তেমন জানিত নেই, যেমন সুপরিচিত আছে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার

বৃত্তান্ত। ভাওয়াল নামটি এখন সর্বসাধারণের মধ্যে ওই উপন্যাসোপম মামলাটির জন্যে বেশি প্রসিদ্ধ। তাই সেই সম্পর্কেই রাজেন্দ্রনারায়ণের পরিচিতি দিয়ে তাঁর ও ভাওয়াল রাজ্যের প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাক। সাম্প্রতিককালে যে রেকর্ড স্থাপনকারী মকদ্দমার জন্যে ভাওয়ালের প্রসিদ্ধি সেই সূত্রে সুপরিচিত সেখানকার মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণের পিতা হলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়।

রাজেন্দ্রনারায়ণ মাত্র বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করে যাননি। তিনি শুধু সঙ্গীত-চর্চায় অনেক সময় অতিবাহিত করতেন তা নয়, অতিশয় বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। বলতে গেলে, ভাওয়াল রাজবংশের মধ্যে বিদ্যা ও সঙ্গীতের সেবায় অন্য কেউই আত্মনিয়োগ করেন নি তাঁর মতন। ভাওয়াল রাজ্যের সুনামও যাঁদের আমলে সবচেয়ে বেশি হয়েছিল তিনি তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট।

সমৃদ্ধ ভাওয়াল জমিদারি খুব কম দিনের নয়। জয়দেব রায়চৌধুরীই তো হলেন রাজেন্দ্রনারায়ণের সাত পুরুষ আগেকার। ভাওয়াল রাজ্যের কেন্দ্র যে জয়দেবপুর গ্রাম তা তাঁরই নামানুসারে হয়েছে। জয়দেব রায়চৌধুরীর আমলের আগে গ্রামটির নাম ছিল 'পীড়াবাড়ি'। তিনিই সে নাম বদল করে নতুন নামকরণ করেছিলেন।

তাঁরও আগে ৫।৬ পুরুষের নাম পাওয়া যায়, যদিও সমৃদ্ধি ছিল না তাঁদের সকলের সময়ে। জয়দেব থেকে নিম্নতম ষষ্ঠ পুরুষ কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী জমিদারিটিকে অনেক দিক থেকেই সুশৃঙ্খল করবার প্রয়াস পান। এবং এই কাজে তিনি পরম সহায়ক লাভ করেন বিখ্যাত বাগ্মী ও সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ম্যানেজাররূপে পেয়ে।

সেকালের সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ অনেক গুণের আধার ছিলেন। বাগ্মিতার জন্যে যেমন তাঁর প্রসিদ্ধি, হয়ত তার চেয়েও বেশি 'বান্ধব' পত্রের সম্পাদকরূপে। তারপর তাঁর কর্ম ও গঠন নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হল তখনকার ভাওয়াল রাজ্যের পরিচালন ব্যবস্থা। কালীনারায়ণ সুযোগ্য ব্যক্তির হাতেই জমিদারির ভার দেন।

কালীনারায়ণের মৃত্যুর পরে তাঁর একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ যখন উত্তরাধিকারী হলেন কালীপ্রসন্ন তখনও রয়ে গেলেন ম্যানেজার। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি ভাওয়ালের ম্যানেজার ছিলেন।

ঘোষ মশায়ের প্রখর বাস্তব বুদ্ধি যেমন একদিকে জমিদারির বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি করে তেমনি তাঁর সাহিত্য-কর্মে অনুরাগ রাজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে অঞ্চলটির সাংস্কৃতিক উন্নতির সহায়ক হয়। কালীপ্রসন্ন এবং রাজেন্দ্রনারায়ণের (সরকার থেকে তিনি রাজা খেতাব পান) জন্যে জয়দেবপুরে যে 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' স্থাপিত হয়, তার প্রসিদ্ধি কম ছিল না তখনকার কালের এই সমগ্র অঞ্চলটিতে। এই সভা থেকে যেমন অনেক ভাল বই প্রকাশে সাহায্য করা হত, তেমনি অনেক লেখকও পুরস্কৃত হতেন।

শিল্প সাহিত্য কাব্য রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে সঙ্গীতের পরই প্রিয়বস্তু। পূর্ববঙ্গে সংস্কৃতচর্চার প্রধান প্রতিষ্ঠান 'সারস্বত সমাজে'র তিনি ছিলেন একজন পৃষ্ঠপোষক। এইসব সাংস্কৃতিক কাজে তাঁর দানের অন্তরালে কালী-প্রসন্নের প্রভাব কাজ করেছিল।

সাহিত্য কাব্য সংস্কৃত-চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রধান শিল্প-কর্ম ছিল সঙ্গীতচর্চা। এখানে তিনি স্বয়ং শিল্পী। শিল্পীর উৎসাহদাতা মাত্র নন। শুধু পৃষ্ঠপোষকও নন।

সঙ্গীতের সেবকরূপে রাজেন্দ্রনারায়ণের দুই পরিচয়। সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক। বাঙলার জমিদারশ্রেণী ও ধনীদের মধ্যে যে অল্প ক'জন হাতে-কলমে সঙ্গীত চর্চা করে গেছেন, ভাওয়াল-রাজ তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন।

সঙ্গীত-প্রেমী ও পৃষ্ঠপোষকরূপে রাজেন্দ্রনারায়ণের নাম সেকালের সঙ্গীত ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিল। এবং তাঁর সূত্রে দেশের পূর্ব প্রত্যন্তে হলেও ভাওয়াল দরবারের নামও।

এ দরবারে অনেক ভারত-বিখ্যাত গুণীর গান-বাজনা হয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে নানা কলাবৎ যোগ দিয়েছেন এখানকার আসরে। বেশির ভাগই তাঁদের অবস্থান অবশ্য সাময়িক। তবলা-গুণী আতা হোসেনের কথা এ প্রসঙ্গে আগে বলা হয়েছে। তা ছাড়া, পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-দরবার ত্রিপুরায় উত্তর ভারতের যত গুণী যেতেন তাঁদের অনেকেই উপস্থিত হতেন ভাওয়ালে।

বহু ওস্তাদের ত্রিপুরা দরবারে বার্ষিক বৃত্তির বরাদ্দ ছিল, অনেকে উপস্থিত মতও বিদায় নিতেন। সেই সব শিল্পীদের অধিকাংশই ভাওয়ালে আসতেন

ত্রিপুরায় আঁসা-যাওয়ার পথে। এমনিভাবে রাজেন্দ্রনারায়ণের দরবারে উচ্চশ্রেণীর গান-বাজনা হত।

তা ছাড়া তিনি কয়েকজন কলাবতকে নিযুক্ত রাখতেন নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে এবং নিজে তাঁদের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবার কারণেও। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হলেন সরদী এনায়েৎ হোসেন খাঁ এবং রবাবী-বীণ্‌কার কাসিম আলী খাঁ। সমসাময়িক ভারতবর্ষের দু'জন শ্রেষ্ঠ গুণী। একজন সরোদযন্ত্রের প্রথম যুগের অন্যতম বাদক এবং শেষোক্ত ব্যক্তি তানসেন বংশের এক উজ্জ্বল রত্ন।

সরোদী এনায়েৎ হোসেনের বাদকরূপে বিলাতে যাওয়ায় কথা আগেই বলা হয়েছে। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ সরোদ-চর্চার জন্যে তাঁর নাম আরো এই কারণে স্মরণীয় যে, তিনি এই যন্ত্রবাদনের প্রথম যুগের একজন সুবিখ্যাত বাদক।

উত্তর ভারতে সরোদ যন্ত্রের প্রথম প্রচলন হয় উনিশ শতকের মাঝা-মাঝি সময়ে বা তার কিছু পরে। সেই আদি পর্বের সরোদ-গুণীদের মধ্যে নিয়ামৎ উল্লা খাঁ (ওস্তাদ করামৎ উল্লা খাঁ ও কৌকব খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা), গোলাম আলি খাঁ (ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁর পিতামহ), মজ্‌রু খাঁ, এনায়েৎ হোসেন খাঁ প্রভৃতি গণ্য ছিলেন।

তাঁদের সকলের জীবনকালের সন্ তারিখ সঠিক জানা না গেলেও তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক, তবে পরস্পরের বয়সে তারতম্য থাকতে পারে। তাঁদের সকলেরই সঙ্গীত-জীবন উনিশ শতকের সৃষ্টি। উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে তারা সরোদযন্ত্রের সাধনা করে গেছেন এবং তাঁদের মধ্যে বাঙলাদেশে বোধ হয় সবচেয়ে বেশিদিন ছিলেন এনায়েৎ খাঁ। বাঙলাদেশে অর্থাৎ রাজেন্দ্রনারায়ণের ভাওয়াল দরবারে।

এনায়েৎ হোসেন দীর্ঘকাল ভাওয়ালে অবস্থান করলেও, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ দেশে তিনি কোনো বাঙালী শিষ্য গঠন করেননি। সে যুগের বেশির ভাগ পশ্চিমা সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর মতন তিনিও পত্তন করেছিলেন আত্মজনদের নিয়ে গঠিত একটি সঙ্গীতজ্ঞ (এক্ষেত্রে সরোদবাদক) পরিবার। নিজ বংশের ধারাতেই তাঁর বিদ্যার চর্চা রক্ষিত হয়, বংশের অতিরিক্ত কাউকে এই বিদ্যা দান করা ঘটে ওঠেনি। প্রায় সব সরোদী পরিবারের মতন এই বংশও জাতিতে পাঠান। এঁদের পূর্ব পুরুষরা কাবুল থেকে ভারতে আসেন এবং

তাঁরা ছিলেন কাবুলী-রবাব-বাদক।

এনায়েৎ হোসেনের পিতা হুসেন আলী ছিলেন কাবুলী রবাবে ভারতীয় রাগ-বাদক এবং যুক্ত প্রদেশের রোহিলখণ্ড অঞ্চলের (রামপুরের নিকটস্থ) অধিবাসী। এনায়েৎ হোসেন এই বংশে প্রথমে সরোদ যন্ত্রের চর্চা প্রবর্তন করেন। এনায়েৎ হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র পরবর্তীকালের স্বনামধন্য সরোদী ফিদা হোসেন।

এনায়েৎ হোসেনের সঙ্গীত-শিক্ষা পিতার কাছে বিশেষ হয়নি। তানসেনের পুত্রবংশীয় বাসৎ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী মহম্মদ খাঁর (বড়কু মিঞা) কাছে তিনি কিছু শিখেছিলেন, এনায়েৎ হোসেনের উত্তর-পুরুষরা একথা বলেন। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানা যায় না। তাঁর পুত্র হলেন সাফায়েৎ হোসেন খাঁ সরোদী। এবং সাফায়েৎ হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাখাওৎ হোসেন সুবিখ্যাত কৌকব খাঁর জামাতা হয়ে এই বংশকে নিয়ামৎ উল্লা খাঁর ঘরানার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তবে সেসব কথা এনায়েৎ হোসেনের পরের কালের কথা।

এনায়েৎ হোসেনকে রাজেন্দ্রনারায়ণ নিজের দরবারে নিযুক্ত রাখেন তাঁর সঙ্গে নিয়মিত তবলা সঙ্গত করবার জন্যে। এনায়েৎ হোসেনের সরোদ বাজনার সঙ্গে সঙ্গত করে রাজেন্দ্রনারায়ণ বড় আনন্দ পেতেন।

যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত করতেই ভালবাসতেন তিনি। গানের সঙ্গে কখনোই বাজাতেন না। সেই জন্যেই কোনো গায়ককে নিযুক্ত করেননি সঙ্গতের রেওয়াজের জন্যে।

তা ছাড়া তিনি বিলম্বিত লয়েও বাজাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। দ্রুতলয়ে বাজাতে স্ফূর্তি পেতেন এবং সেজন্যে যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গতেই ছিল তাঁর একান্ত আগ্রহ। আর এনায়েৎ হোসেনের দ্রুত লয়ের সরদ বাদনের সঙ্গে তিনি তা চরিতার্থ করবার সবচেয়ে সুযোগ পেতেন। সবচেয়ে বেশি বাজাতেনও এনায়েৎ হোসেনের সঙ্গে।

এনায়েৎ হোসেনও রাজেন্দ্রনারায়ণের মনের ঝোঁক বুঝে লয় খুব বাড়িয়ে বাজাতেন। লয় বাড়াতেন আর বলতেন,—বাড়ুন, বাড়ুন, রাজা, আরো বাড়ুন।

রাজেন্দ্রনারায়ণও যথাযোগ্য জলদে সঙ্গত করে যেতেন। সরোদী যত লয় বাড়াতেন, সঙ্গতকারও তত। বড় মজা পেতেন রাজা।

এমনিভাবে চলত আর জমত তাঁদের প্রায় প্রতিদিনের আসর।

কিন্তু তাঁর আর একজন নিযুক্ত কলাবৎ কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে বাজনাটা হত অন্য রকম। আর তাই নিয়েই এই গল্প। সে এক অদ্ভুত আসরের দৃষ্টান্ত। তার পরিচায়ক এই শিরোনামাটিও সেজন্যে এমন অদ্ভুত হয়েছে।

কাসিম আলীর সেই আসরের কাহিনী বলবার আগে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের কথা বলা দরকার।

রবাব ও বীণা বাদক কাসিম আলী খাঁর নাম অমর হয়ে আছে আমাদের সঙ্গীত-জগতে। তাঁর সমসাময়িক তন্ত্রকারদের মধ্যে এত বড় প্রতিভা অতি অল্প ছিলেন। তানসেনের পুত্র-বংশীয় জাফর খাঁর পৌত্র এবং কাজাম খাঁর পুত্র তিনি। ঘরানা ধ্রুপদ ও রাগালাপ এবং রবাব ও বীণা সাধনার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

সেকালের অবাঙালী এবং পেশাদার ওস্তাদদের ক্ষেত্রে যেমন হত, তাঁরও তেমনি তালিম পাওয়া আর তালিম দেওয়া সবই নিজের ঘরে।

খুব কম বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গীত-জীবন আরম্ভ হয়েছিল। পিতা কাজাম আলী ও পিতৃব্য স্বনামধন্য বীণ্‌কার সাদিক আলী খাঁর কাছে তালিম নিতে থাকেন রবাব ও বীণায়।

তারপর মেটিয়াবুরুজ দরবারে অবস্থান করবার সময়ে তাঁর খুল্ল-পিতামহ বাসৎ খাঁকে পেয়েছিলেন এবং তাঁর কাছেও যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগ পান। এইভাবে প্রথম জীবনে পশ্চিমে, বারাণসীতে (তানসেন বংশের একটি ধারার পরবর্তীকালের ভদ্রাসন) এবং পরে কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে কাসিম আলীর সঙ্গীত-জীবন গড়ে ওঠে।

বংশের ধারায় এবং চর্চা ও সাধনায় এই হ'ল কাসিম আলী খাঁর সঙ্গীত-জীবনের প্রথম পর্বের পরিচয় ও পটভূমি।

শিষ্য তাঁর বিশেষ কেউ ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর কাসিম আলী কাশী থেকে চলে আসেন কলকাতায়। প্রথমে নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারে নিযুক্ত থাকেন।

তারপর বাঙলার আরও নানা দরবারে বিভিন্ন সময়ে ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। শেষ পর্বই ভাওয়ালে কাটে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি শিষ্য গঠন করেননি কোথাও। হয়ত তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজনকে এই

সব স্থানের কোথাও পাননি বলেও তা হতে পারে। কারণ অনাত্মীয়দের শিক্ষা দেওয়া সেযুগে বিশেষ ছিল না ঘরানা ওস্তাদদের মধ্যে।

অকৃতদার কাসিম আলীর নিজের যেমন কোনো বংশ ছিল না, তেমনি দূর বাঙলা দেশের নানা জায়গায় থাকবার কালে কোনো অল্পবয়সী আত্মীয়ও থাকবার সুযোগ পাননি তাঁর কাছে। সে জন্যেও বোধ হয় তাঁর শিষ্য গড়া হয়ে ওঠেনি।

তা ছাড়া তিনি যেমন গুণী, তেমনি গর্বিতও। প্রথমে তিনি বৃত্তিভোগী বীণ্‌কার হয়ে নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারে এলেন। সেখানে নিজ বংশের প্রবীণ গুণী বাসৎ খাঁকে পেয়ে তাঁর কাছে বহু রাগ ও ধ্রুপদের ঘরানা সঞ্চয় লাভ করে সাধনা সম্পূর্ণ করতে থাকেন। তখন উদীয়মান সরোদী নিয়ামৎ উল্লা খাঁও ছিলেন সে দরবারে।

নিয়ামৎ উল্লা মেটিয়াবুরুজ দরবারে চাকরিও করতেন আবার তালিম নিতেন বাসৎ খাঁর কাছে। কাসিম আলী নিয়ামৎ উল্লার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সঙ্গীত-বিদ্যায়ও তখন প্রবীণতর। নিয়ামৎ উল্লার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও খুব ছিল মেটিয়াবুরুজে। অনেক সময়ে একই সঙ্গে থাকতেন। অবিবাহিত এবং সংসার-বিমুখ কাসিম আলীর সাংসারিক অনেক বিষয়ে তদারক করতেন, কেনা-কাটা করে দিতেন নিয়ামৎ উল্লা।

কাসিম আলী দিনের পর দিন নিয়ামৎ উল্লার সামনে রিয়াজও করে যেতেন, যা আর কারুর উপস্থিতিতে করতেন না। কারণ এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাই নিয়ামৎ উল্লার বিষয়ে ইঙ্গিত করে যদি কেউ তাঁকে বলতেন—আপনি যে নিয়ামতের সামনে এত বাজান, ও ত সব জিনিস উড়িয়ে নেবে। অর্থাৎ শুনে শিখে নেবে।

কাসিম আলী তখন নিজের অর্জিত বিদ্যা সম্পর্কে অহমিকা প্রকাশ করে উত্তর দিতেন—কত ওড়াবে, ওড়াক না। আমার এত জিনিস আছে যা কোনোদিন শেষ করতে পারবে না ও।

মেটিয়াবুরুজের পরে এক সময় কাসিম আলী পঞ্চকোট রাজ্যে ছিলেন। পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে (এখনকার পুরুলিয়া জেলায়)। সেখানে খাঁ সাহেব থাকবার সময় কাশীর ধ্রুপদ-গুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর গুণপনার পরিচয় পান এবং তাঁর 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' পুস্তিকায় তার বিবরণ প্রকাশ করেন। মুখোপাধ্যায় মশায়ের সেই লেখা থেকে জানা যায়

যে, কাসিম আলী শুধু যন্ত্রী ছিলেন না। একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ-গায়কও ছিলেন আগেকার আমলের অনেক যন্ত্রসাধকের মতন। উপরন্তু তিনি গান করতেন নিজেরই সুর-যন্ত্রের সঙ্গতে, যার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

বিষয়টি কৌতূহল-উদ্দীপক। সেজন্যে প্রয়োজনীয় অংশ 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' (১৬ পৃষ্ঠা) থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল—"প্রথমে কাশীপুরের রাজ-বাটীতে যাই। সেখানে কাসিম আলী খাঁ (রবাবী) ছিলেন। সন্ধ্যার সময় খাঁ সাহেবের সুরশৃঙ্গার বাজনা হইল। শ্রোতৃগণের মধ্যে রাজা এবং আমরাই কয়েকজন। খাঁ সাহেব এক-ঘণ্টা আলাপ করিয়া গান করেন এবং বিষ্ণুপুরের একজন মৃদঙ্গ বাজান। বীণার সঙ্গে গান বন্দে আলী খাঁর শুনিয়াছিলাম, আর এই শুনিলাম। পরে আর শুনিতে পাই নাই। পরদিন প্রত্যূষেই খাঁ সাহেব রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনিও প্রাতে আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমাদের গান হইল ও খাঁ সাহেব বীণাতে সঙ্গত করিলেন। আমরা 'নুরি মন সুমিরণ' ললিত রাগের গান করিলাম। খাঁ সাহেব বড়ই খুশী হইলেন এবং তিনিও 'সঘন বন ছায়ো' ললিতের ধ্রুপদ গান করিলেন এবং বীণাতে সঙ্গত করিলেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে খাঁ সাহেব বৈকাল বেলায় বীণায় আলাপ করিলেন ও সাময়িক রাগে গান করিলেন।"

হরিনারায়ণের এই বইখানিতে কাসিম আলী খাঁ ও যদু ভট্টের একটি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, যা ত্রিপুরার রাজ-দরবারে ঘটেছিল বলে কিংবদন্তী আছে। কিন্তু 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' পড়লে মনে হয় ঘটনাটি পঞ্চকোটের ব্যাপার।

যদু ভট্টের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই এই প্রসঙ্গ হরিনারায়ণ স্বয়ং পঞ্চকোটের রাজের মুখে শুনেছিলেন বলে তাঁর বিবৃতির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। মুখোপাধ্যায় মশায় এইভাবে ঘটনাটির কথা বলেছেন (উক্ত পুস্তিকার ১৬-১৮ পৃষ্ঠায়): 'সন্ধ্যার পর আহারান্তে রাজার সহিত রামদাসবাবুর (শ্রীরামপুরের রামদাস গোস্বামী, ধ্রুপদী রসুল বখসের শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং হরিনারায়ণের সঙ্গীতগুরু —বর্তমান লেখক) সঙ্গত সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন হইল।... যদু ভট্টজী নামে একজন গায়ক সেখানে ছিলেন; তাঁহার কণ্ঠ ভাল ছিল এবং তিনি অসাধারণ মেধাবীও ছিলেন। কিন্তু ভাল মাথা থাকিলেই যে কাহারও নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন না, ইহা হইতে পারে না। রাজা এই সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়কে একটি ঘটনা শুনাইলেন। যদু ভট্ট কোনো

সময়ে দরবারী কানাড়া গান করিতেছিলেন এবং কাসিম আলী খাঁ শুনিতে-ছিলেন। গান শেষ হইলে খাঁ সাহেব বীণাতে ঐ রাগ আলাপ করিয়া একখানি গান করিলেন, স্পষ্ট দেখা গেল, দুইজনের গানে বহু ভেদ। ভট্ট মহাশয় খাঁ সাহেবকে বলিলেন, 'আমাকে বীণা শিখান।' খাঁ সাহেব বলিলেন, নিজ বংশ (অওলাদ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও বীণা শিখাইবার আদেশ নাই। তবে তুমি সেতার কিংবা গান শিক্ষা করিতে পার।' ভট্ট মহাশয় বলিলেন, 'আমি বীণাই শিখিব।' ইঁহারা উভয়েই রাজ-দরবারে থাকিতেন। খাঁ সাহেব যখন দরবারে বাজাইতেন, তখন ভট্ট মহাশয় রাজকর্মচারিদিগের ঘরে লুকাইয়া থাকিয়া সেই বাজনা অভ্যাস করিতেন; পাঁচ-ছয় মাস এইরূপে কাটিয়া গেল; খাঁ সাহেব...মধ্যে মধ্যে রাজার বিনানুমতিতেই তাঁহার নিকট আসিতেন। কোনো সময়ে ভট্টজী সেতার বাজাইতেছিলেন এবং রাজা শুনিতে ছিলেন; এমন সময় খাঁ সাহেব হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্ট মহাশয় তন্ময় হইয়া সেই তানগুলি—যেগুলি লুকাইয়া শিখিয়াছিলেন, বাজাইলেন। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট্টজী, এই তানগুলি কোথায় শিখিলেন?' ভট্টজী বলিলেন, 'এগুলি আমাদেরই ঘরের।' খাঁ সাহেব বলিলেন, 'এ বিষ্ণুপুরের ঢঙ্ নহে, আপনি উড়াইয়া (চুরি করিয়া)লইয়াছেন।' খাঁ সাহেব এই কথা বলিয়া রাজাকে বলিলেন, 'আপনার চাকরদের জিজ্ঞাসা করুন, ভট্টজী তাহাদের ঘরে লুকাইয়া থাকেন কি না এবং আমি যখন বাজাই, তখন সেগুলি তিনি লুকাইয়া অভ্যাস করেন কি না?' অবশ্য ভট্টজী ধরা পড়িয়া গেলেন;...রাজা এইরূপ কথোপকথনের পর আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'গুরু সমীপে থাকিয়া গুরুর সেবা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর।...'

উত্তর-জীবনে কাসিম আলী খাঁ ত্রিপুরার রাজদরবারেও অবস্থান করেন। সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের শিবপুর গ্রামের বাদ্যকর বৃত্তিজীবী সদু খাঁ (ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর পিতা) কাসিম আলীর শিক্ষা পান বলে কথিত আছে। কিন্তু তা নামে মাত্র এবং সেজন্যে সদু খাঁকে কাসিম আলীর শিষ্য বলা যায় না। কারণ, সদু খাঁ ওস্তাদজীর কাছে নাকি পান ইমন ও ছায়ানটের একটি করে গৎ মাত্র—আলাপ বা রাগপদ্ধতি নয়।

ত্রিপুরার দরবার থেকে কাসিম আলী যান ভাওয়ালরাজ রাজেন্দ্র-নারায়ণের আশ্রয়ে। (এখানে তিনি এনায়েৎ হোসেন খাঁর মতন মৃত্যুকাল

পর্যন্ত ছিলেন। কাসিম আলী খাঁর হাতে যন্ত্রও ভাওয়াল-দরবারে রক্ষিত ছিল তাঁর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ।)

কাসিম আলীর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব কি রকম ছিল, তার কিছু পরিচয় এই সব খণ্ড চিত্র থেকে পাওয়া গেল। এবার কাসিম আলী খাঁ ও রাজেন্দ্র-নারায়ণ রায়ের সেই আসরের গল্প। পিছন থেকে সঙ্গত করবার সেই অদ্ভুত দৃষ্টান্তের কথা।

এ হেন কাসিম আলি খাঁ ভাওয়াল-দরবারে নিযুক্ত হয়েও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন নিজের মেজাজ, মর্জি আর আর সাঙ্গীতিক সত্তা।

শোনা গেছে যে, রবার ও বীণা যন্ত্রে তিনি বেশি সাধনা করলেও এবং সুরশৃঙ্গার ইচ্ছা মতন বাজালেও উত্তরজীবনে তাঁর বেশি ঝোঁক পড়েছিল বীণাবাদনে। যেমন প্রথম জীবনে রবাব তাঁর রাগ-চর্চার প্রিয়তর মাধ্যম ছিল।

ভাওয়াল-রাজার আসরে, ত্রিপুরার দরবারের মতন, তিনি বীণাই বাজাতেন বেশি। বীণায় রাগালাপ করে উপসংহারে তারপরণ বাজাতেন। রাগের আলাপচারির সময় সঙ্গীত চলে না, কিন্তু তারপরণে সঙ্গীতের প্রয়োজন। বীণাযন্ত্রের তারপরণে সুযোগ্য সঙ্গত হয় মৃদঙ্গে বা পাখোয়াজে। তারপরণের সঙ্গে তবলা সঙ্গতের চলন নেই।

যেমন ধ্রুপদ গানে, তেমনি বীণাব সঙ্গে সঙ্গতের অধিকারী পাখোয়াজ। এক্ষেত্রে তবলার আভিজাত্য গুণীসমাজে স্বীকৃত নয়। তারপরণের সঙ্গতে যে সব বোল পাখোয়াজে বাজে তা তবলাতেও ওঠানো যেতে পারে। তবু ব্যাপার হল ধ্বনির ধরন-ধারণ নিয়ে। তবলার নিক্কণ পাখোয়াজের মেঘ-মন্দ্র ধ্বনির তুলনায় ধ্রুপদীরা ও বীণ্‌কাররা চটুল মনে করেন। তাই পাখোয়াজের গম্ভীর নিনাদেই সঙ্গত হয়ে থাকে বীণার তারপরণ। কাসিম খাঁকে আলী খাঁও সেই রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

এদিকে রাজেন্দ্রনারায়ণের সাধ ও সাধনা তবলায়, পাখোয়াজে নয়। এ যন্ত্র তিনি কখনও বাজাননি। এবং তিনি কাসিম আলীর সঙ্গে সঙ্গত করতে চান। বিশেষ যখন খাঁ সাহেব নিযুক্তই রয়েছেন দরবারে। সুতরাং তিনি ওস্তাজীর বীণার সঙ্গে তবলা নিয়েই বাজাতে বসতেন।

এ তাঁর নিজস্ব সভা হলেও রীতিমতো আসর। তাই কাসিম আলী মনে করেন তিনি তো আর নিজের ঘরের মধ্যে বাজাচ্ছেন না। তাই রীতি-নীতি আদব-কায়দার নড়চড় বরদাস্ত হয় না তাঁর। তিনি চান তবলা

নয়, পাখোয়াজ সঙ্গত হোক তাঁর বীণার সঙ্গে।

খাঁ সাহেব তবলিয়া রাজাকে প্রথম প্রথম নিরস্ত করতে চাইতেন। তাঁর তবলা সঙ্গতের তোড়জোড় দেখে আপত্তি জানিয়ে বলতেন, 'আপনার তবলার সঙ্গত আমি মানি না।'

রাজেন্দ্রনারায়ণও ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। তিনি জানিয়ে দেন যে, বাজনা তিনি বন্ধ করবেন না! কি ক্ষতি তবলা বাজালে? পাখোয়াজের পরণই তো বাজাচ্ছেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত কাসিম আলী বলতেন, 'বেশ, বাজান আপনার যা খুশি। কিন্তু আমি আপনার দিকে মুখ করে বাজাব না। দেয়ালের দিকে ফিরে বসব আমি।'

সত্যিই তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে বাজিয়ে যেতেন বীণা। আর তাঁর পিছনে বসে রাজেন্দ্রনারায়ণ তবলায় সঙ্গত করতেন।

এমনি ভাবে চলত দিনের পর দিন অসহযোগী কাসিম আলীর বীণার তারপরণের সঙ্গে ভাওয়াল-রাজের তবলা সহযোগিতা।...

এমন পিছন থেকে নিয়মিত সঙ্গতের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

॥ ওস্তাদের মুরেঠা ॥

আসরে এ একটা দেখবার মতন রঙ্গ ছিল। এমন অনন্য সাজ। চেহারায় ও বেশভূষায় স্পষ্টতই বাঙালী। কিন্তু মাথায় পরিপাটি করে চড়িয়েছেন পশ্চিমা পাগড়ি।

যাঁরা এই মুরেঠার রহস্য জানেন না, তাঁরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন গায়কের দিকে। যাঁরা জানেন, তাঁরা আর ওই নিয়ে মাথা ঘামান না। মন দিয়ে তাঁর গান শুনতে বসেন। অতিশয় দরাজ আর সুরেলা সেই গলার গান। বিশেষ যদি তিনি শোনান চৌতালে আড়ানার সেই জমাটি গানখানি —হে যদুনাথ...।

গানটি তানসেনের রচিত ধ্রুপদ। উদাত্ত কণ্ঠে উত্তরাঙ্গ-প্রধান আড়ানার এই গান গেয়ে কত ভাল ভাল আসর যে সেকালে মাৎ করতেন, তা

তখনকার শ্রোতারা অনেকেই জানতেন।

এক একটি রাগে এক একজন গায়ক সিদ্ধ হন, অনেক সময়ে দেখা যায়। ইনিও তেমনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন আড়ানার সাধনায়। আর তানসেনের রচনা তাঁর প্রিয় ওই গানখানি অনেক আসরেই গাইতেই অনুরুদ্ধ হতেন, এমন খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

' গায়কের নাম বিনোদ গোস্বামী। ওজস্বী কণ্ঠে ধ্রুপদ গানের জন্যে তখনকার দিনে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আগেকার অনেক সঙ্গীতগুণীরই মতন তাঁর নাম একালের দরবার পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি নানা কারণে। তাই নামটি এখনকার সঙ্গীতজগতে একরকম অপরিচিত বলা যায়।

পাখোয়াজ-গুণী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যের এক অগ্রজ ছিলেন সন্তোষচন্দ্র নামে। তিনি ধ্রুপদ গায়ক। সন্তোষচন্দ্রের সঙ্গীতগুরু হলেন বিনোদ গোস্বামী। দুর্লভচন্দ্র তাই গোস্বামী মশায়ের সঙ্গীতজীবন খুব ভালভাবে জানতেন।

বিনোদ গোস্বামীর গান অনেকদিন তিনি শুনেছেন, অনেক আসরে বাজিয়েছেন তাঁর সঙ্গে। গোস্বামী মশায় যে কত বড় গুণী ছিলেন তাঁর সে বিষয়ে সাক্ষাৎ ধারণা ছিল। আর সে সব গানের রীতি-নীতি ধরন-ধারণ, গায়কের ব্যক্তিত্ব সবই তাঁর স্মৃতির পটে মুদ্রিত হয়ে ছিল বরাবরের জন্যে।

তাই বহুদিন পরেও, সে ধ্রুপদী যখন ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন এবং দুর্লভচন্দ্রও যখন প্রাচীন হয়েছেন, তখনও তিনি তাঁর গানের প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে উঠেছেন—'সে কি গলা ছিল রে! হে যদুনাথ গানটা কি চমৎকার যে গাইতেন। ওই গান তো তোরাও করিস, কিন্তু গোস্বামী মশায়ের গান মনে পড়লে মনে হয় যেন গানটাকে ভেঙ্‌চি কাটছিস। তাঁর ওই আড়ানার গানটা শুনে মোরাদ খাঁর মতন ধ্রুপদী এক আসরে কি তারিফই করেছিলেন।'

এই বলে বিনোদ গোস্বামীর সেই আসরের গল্পটা শোনাতেন। এক আসর লোকের সামনে নিজের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়ার সেই নাটকীয় ঘটনা।

সে হল বিনোদ গোস্বামীর সঙ্গীত-জীবনের প্রথম দিকের কথা। তখন তাঁর যুবক বয়স। সঙ্গীতশিক্ষার্থী। নাম-ডাক হয়নি। সঙ্গীতজ্ঞ মহলে বিশেষ কেউ চিনত না তাঁকে। কিন্তু সেই আসর থেকেই খ্যাতির সোপান বেয়ে ক্রমশঃ উঠতে থাকেন।

সে আসরের ঘটনাটা বলবার আগে তাঁর জীবনের কথা কিছু জানিয়ে রাখা যাক।

অমন গুণী গায়ক হয়েও তিনি কিন্তু সঙ্গীত-ব্যবসায়ী বা পেশাদার হননি পশ্চিমা কলাবতদের মতন। সেকালের বেশির ভাগ বাঙালী সঙ্গীত-সেবীদের মতন অপেশাদার ছিলেন।

তাঁর বৃত্তি ছিল কথকতা। ভাল কথক ছিলেন এবং তাইতেই তাঁর সাংসারিক অভাব মিটে যেত। সে-যুগের বাঙলার আসরে এমন কয়েকজন শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁরা ছিলেন একাধারে গায়ক ও কথক। তবে বিনোদ গোস্বামী ভিন্ন বেশির ভাগ গায়ক-কথকরা টপ্পা অঙ্গে গাইতেন। গোস্বামী মশায়ের মতন ধ্রুপদী অথচ কথক এমন বেশি শোনা যায় না।

যেমন রানাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ উমানাথ কথক, তাঁর পুত্র সুকণ্ঠ গায়ক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চন্দননগরের গুণী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা তাঁদের অনেক আগেকার বিখ্যাত শ্রীধর কথক প্রভৃতি সকলেই ছিলেন টপ্পা-গায়ক এবং কথক। কেউই তাঁরা ধ্রুপদ-গায়ক ছিলেন না বিনোদ গোস্বামীর মতন। (উমানাথ ও নগেন্দ্রনাথ ধ্রুপদ শিক্ষা করলেও আসরে ধ্রুপদ বিশেষ গাইতেন না।)

বিনোদ গোস্বামীর সঙ্গীতের চর্চা কম বয়স থেকেই আরম্ভ হয়। ছেলে-বেলাতেই প্রকাশ পায় যে তাঁর গানের গলা ভাল। বর্ধমান জেলার বোঁয়াই গ্রামে জন্ম। কলকাতায় পথম গান শেখেন আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে। সেই প্রথম রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা।

তারপর একনিষ্ঠভাবে সাধনা করে চলেন—সুকণ্ঠের, সুরের। পরে মুরাদ খাঁর শিষ্য হন।

মুরাদ খাঁ সেকালের এক গুণী পশ্চিমী ধ্রুপদী, বাঙলার সঙ্গীতক্ষেত্রে অনেকদিন অবস্থান করেছিলেন। তিনি কোন্ সঙ্গীতকেন্দ্র থেকে বাঙলায় আসেন তা জানা যায় না। আর মনে হয়, একাধিক মুরাদ খাঁ বা মুরাদ আলী খাঁ এসেছিলেন বাঙলা দেশে। বিখ্যাত ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ (যিনি তানসেনের পুত্র-বংশীয় হায়দর খাঁর প্রশিষ্য এবং ঘসিট খাঁর শিষ্য বলে কথিত আছে)—যাঁর শিষ্য ছিলেন যদুনাথ রায়, কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ঘোষ, আশুতোষ রায় প্রভৃতি—এবং বিনোদ গোস্বামীর এই দ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু মুরাদ খাঁ সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রীরামপুরের ধ্রুপদগুণী রামদাস গোস্বামীর প্রথম ওস্তাদও ছিলেন জনৈক মুরাদ খাঁ, তবে তাঁর একটি (নিজ গুণে উপার্জিত ?) উপাধি ছিল, 'ডাণ্ডেবাজ'। বিনোদ গোস্বামীর উক্ত দ্বিতীয় ওস্তাদ মুরাদ খাঁ এই বিচিত্র পরিচয় বহন করতেন কি না এবং রামদাস গোস্বামীর প্রথম সঙ্গীতগুরুর সঙ্গে অভিন্ন ছিলেন কিনা, সঠিক জানা যায়নি। তবে এই শেষোক্ত দুজন হতেও পারেন একই ব্যক্তি।...

সে যা হোক, মুরাদ খাঁর তালিমের পরও আরও গুরুকরণ করেছিলেন গোস্বামী মশায়। আরও দু'জন ধ্রুপদাচার্যের শিক্ষা সুদীর্ঘকাল যাবৎ গ্রহণ করেন। বলতে গেলে, প্রায় সারা জীবনই শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি।

মুরাদ খাঁর পরে প্রথম কয়েক বছর বেতিয়া ঘরানার এক নেতৃস্থানীয় গুণী শিবনারায়ণ মিশ্রের কাছে তাঁদের ঘরানা ধ্রুপদ শিখতে লাগলেন। বছরের পর বছর কলকাতায় তালিম নিলেন তাঁর কাছে।

তারপর বারাণসীর অন্য এক প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী কামতাপ্রসাদের কাছে নতুন সম্পদ আহরণ আরম্ভ করলেন। কামতাপ্রসাদও দীর্ঘকাল কলকাতায় ছিলেন এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। কামতাপ্রসাদ বিশেষ করে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গানের জন্যে খ্যাতিমান হন এবং গোস্বামী মশাই কয়েক বছর খাণ্ডারবাণী রীতিই শিক্ষা করেন তাঁর কাছে।

এমনিভাবে সুদীর্ঘকালের শিক্ষা ও সাধনায় বিনোদ গোস্বামীর সঙ্গীত-জীবন, তাঁর ধ্রুপদ গানের রীতিনীতি গড়ে ওঠে।

তাঁর যে আসরটির উল্লেখ আগে করা হয়েছে, যে আসর থেকে তিনি প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন সেটি ঘটেছিল তাঁর প্রথম ওস্তাদের কাছে শিক্ষার সময়ে। অর্থাৎ তখন তিনি মুরাদ খাঁর শিষ্য। মুরাদ খাঁর অধীনে কিছুদিন যাবৎ শিখতে আরম্ভ করেছেন।

সেই সময় তিনি একদিন কলকাতার একটি আসরে গেছেন ওস্তাদজীর সঙ্গে। নিজে গাইবার জন্যে নয়, মুরাদ খাঁর গান শোনবার জন্যে এবং তাঁর শিষ্য হিসেবেই গিয়েছিলেন। ওস্তাদ যেমন ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে যান, তানপুরা ছাড়া ইত্যাদি কাজের জন্যে।

ভাল আসর এবং ধ্রুপদের আসর। কয়েকজন বড় ধ্রুপদী, তাঁদের একাধিক ভারতবিখ্যাতও, সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। মুরাদ খাঁ ভিন্ন

আছেন রসুল বখস ধ্রুপদী (আলী বখসের ভ্রাতা এবং রামদাস গোস্বামীর ওস্তাদ) প্রভৃতি।

স্থানীয় দু-একজনের গানের পর রসুল বখস্ হঠাৎ বিনোদ গোস্বামীকে গাইতে বললেন। আগেকার আমলে এ রকম হত অনেক আসরে। তরুণ শিল্পীদের প্রবীণেরা আত্মপ্রকাশের এমন সুযোগ দিতেন।

রসুল বখসের শিষ্টাচারের আহ্বান শুনে একটু বিব্রত বোধ করলেন মুরাদ খাঁ। এত বড় বড় গায়কের সামনে এত বড় আসরে বিনোদ কি গাইতে পারবে? সে গান কি ভাল লাগবে এদের?

তাই তিনি রসুল বখসের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেবার জন্যে বললেন—ও এখন খুব বেশি শেখেনি, যা সকলকে শোনানো যায়। মাত্র কিছুদিন শিখছে।

কিন্তু তবু রসুল বখ্স উপরোধ করতে লাগলেন গাইবার জন্যে।

তখন মুরাদ খাঁ শিষ্যকে জনান্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, গাইতে সাহস হবে?

তিনি বললেন, ওস্তাদের হুকুম পেলে একবার চেষ্টা করতে পারি। ভয়ের কি আছে?

এ কথায় মুরাদ খাঁ তাঁকে অনুমতি দিলেন।

বিনোদ গোস্বামী তখন উদাত্ত কণ্ঠে আড়ানার সেই গানখানি ধরলেন—হে যদুনাথ…।

উত্তরাঙ্গে গানটি আরম্ভ করতেই সমস্ত আসর সচকিত হয়ে উঠল। সকলের অবাক্ দৃষ্টি পড়ল অপরিচিত এই যুবকটির ওপর।

বড় বড় গায়কদের পর্যন্ত আশ্চর্য করে দিয়ে তিনি গাইতে লাগনে। সপ্রতিভ ভাবে, অটুট তাল-লয়ে, 'সুরিলা' গলায়।

স্বয়ং মুরাদ খাঁ বিস্মিত হলেন সবচেয়ে বেশি। তিনি এতখানি আশা করেননি. যদিও জানতেন ছোকরার এলেম আছে।

খানিক আগেও যিনি অল্পশিক্ষিত বলে আসরে পরিচিত হয়েছিলেন এখন তাঁর শিক্ষিত-পটুত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রোতারা।

গান শেষ হতে রসুল বখ্স সবার আগে গায়ককে সাবাস দিয়ে তারিফ করলেন। অন্য সকলেও প্রশংসা করতে লাগলেন খুব।

আর মুরাদ খাঁ একটি দেখবার মতন পুরস্কার দিলেন। নিজের মাথা থেকে আগুন-রাঙা, পেঁচদার পাগড়িটি খুলে নিয়ে শিষ্যের মাথায় পরিয়ে

দিলেন সস্নেহে, সগর্বে। আর আশীর্বাদ করে বললেন, 'আজকের এই বিশেষ দিনটা মনে রেখো। আমার মুরেঠা মাথায় চড়িয়ে আসরে গাইতে যেও।'

আসরে একটি স্নিগ্ধ আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হল। ধন্য ধন্য রব শোনা গেল কোনো কোনো শ্রোতার মুখে। শিষ্যকে ওস্তাদ নিজের মাথার পাগড়ি খুলে দিয়েছেন, এমন সুন্দর দৃশ্য তাঁরা কখনও দেখেননি।

ওস্তাদের সেই স্নেহের আদেশ কোনদিন গোস্বামী মশায় অমান্য করেননি বা ভুলে যাননি। জীবনের শেষ পর্যন্ত, যতদিন যত আসরে গাইবার জন্যে উপস্থিত হয়েছেন, বরাবর দেখা গেছে তাঁর মাথায় সেই টক্‌টকে লাল মুরেঠাটি।

॥ শিল্পী বড় ॥

এ গল্পটি একেবারে অন্য রকমের। সঙ্গীত থেকে এসে পড়েছে অন্য এক বিষয়।

কত আসরে কত ধরনের সব ঘটনার কথা শোনা গেছে। মান অপমান বিবাদ বচসা দলাদলি বিতর্ক কুতর্ক অনেক কিছু। অনেক বহ্বাড়ম্বে লঘুক্রিয়া কিংবা তিল থেকে তাল।

কিন্তু এমন অদ্ভুত মন্তব্য বড় একটা শোনা যায়নি। সঙ্গীতের আসরে এমন ধর্মের গোঁড়ামির কথা। ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়াদের তো হামেশাই দেখা যায়। অনেকের অহমিকা থাকে বিশেষ একটা ধর্ম মেনে চলে বলে। সেটা যে তাদের ধর্ম তাইতেই তারা গর্বিত বোধ করে থাকে। সেই ধর্মের আওতায় থাকাটাই যেন মহা অহঙ্কারের ব্যাপার। এই ধারণা থেকে নিজেদের সম্বন্ধে একটা অকারণ শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগে। যে-যে বিষয়ে তারা চর্চা করে সেসব বিষয়ে অন্য ধর্মীয় কোনো লোক শ্রেষ্ঠ হতে পারে না এমনি একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় তাদের মনে। আর তারা তা অনেক সময়ে প্রকাশ করেও ফেলে। সাংসার যেহেতু অতি স্থূল জায়গা, সূক্ষ্ম বোধ বা বোঝার শক্তির অভাব যেখানে বেশির ভাগ লোকের, সেখানে কাষ দেয় এমনি আত্মম্ভরিতা। দাবড়ে বলার জন্যে লোকেরা সায় দিয়ে বসে—ওঃ, ব্যক্তিত্ব আছে বটে। আর কথাটাও বলেছে ঠিক।

তবে সঙ্গীত-জগতে ধর্মবোধে এই উৎকট উৎসাহ সাধারণ তো দেখা যায় না। ঘোর সাম্প্রদায়িক আকার নিয়ে প্রশ্নটি কখনো আসরে প্রকট হয়নি, এই রক্ষা। নচেৎ সুরের আসরে বিস্তর অসুরের তাণ্ডব ঘটে যেত।

অবশ্য এক পক্ষের সহনশীলতা শান্তি রক্ষার কারণ হতে পারে অনেক সময়ে। তাই অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িক মনোভাব অন্তঃসলিলার মতন হয়ত কায করে গেছে! নগ্নভাবে প্রকাশের তেমন প্রয়োজন হয়নি। তা ছাড়া বাস্তব স্বার্থ বিবেচনায় মতিগতি অনেক সময়ে সঙ্গোপনে রাখতে হয়েছে। ভিন্ন ধর্মীয়ের অধীনে এবং আনুকূল্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীবিকার সংস্থান করতে হয়। এই সব কারণ অনেক সময় প্রচ্ছন্ন রেখে দেয় প্রকৃত মনোভাব।

তবু অসতর্ক মুহূর্তে কখনো হয়ত ফুটে বেরিয়েছে আসল মন, তবে অন্যদের উদারতার জন্যে তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারেনি।

এমনি একটি আসরের গল্প আছে গত শতকের। এটির ঘটনাস্থল নাড়াজোল রাজবাড়ি।

মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল। এখানকার ভূম্যধিকারী পরিবার সঙ্গীতের বড় আনুকূল্য করতেন। বংশের অনেকে সুপরিচিত ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকরূপে। বিশেষ মহেন্দ্রলাল খাঁ, নরেন্দ্রলাল খাঁ প্রভৃতি।

তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রলাল নিজে সঙ্গীতের চর্চাও করতেন। সেতার বাজাতেন তিনি। বিষ্ণুপুরের গুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতগুরু। সেতার বাদক ও গায়ক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্রলালের নিযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

নরেন্দ্রলালের পিতা মহেন্দ্রলালের আমলের ঘটনা এটি। এখানে জানিয়ে রাখা যায় যে, মহেন্দ্রলাল খাঁ 'সঙ্গীত লহরী' নামে একটি সঙ্গীত পুস্তকেরও লেখক।

এ আসরের সালটির কথা জানা যায়নি, তবে উনিশ শতকের শেষ দিকের কথা।

সেদিনের আসরে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের মধ্যে গুণী হিসেবে দুজনের নাম আগে করতে হয়। সরদী মুরাদ আলী খাঁ এবং সেতার সুরবাহার বাদক বামাচরণ ভট্টাচার্য। একজন পেশাদার কলাবৎ এবং আর একজন শৌখীন গুণী। বামাচরণ বাবুর নাম সঙ্গীতক্ষেত্রে তেমন সুপরিচিত নয়। কারণ তিনি অপেশাদার ছিলেন। সঙ্গীত জীবনকে অর্থকরী বৃত্তি না করার ফলে

বামাচরণবাবুর মতন অনেক বাঙালী গুণীদেরই নাম-ডাক যেমন বেশী ছড়াত না তখনকার সঙ্গীত সমাজে, তেমনি এসে পৌঁছাতও না পরবর্তীকালের দরবারে।

যাই হোক, ওই দুজন শিল্পীর সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় এখানকার কালে একরকম বিস্মৃত। তাই তাঁদের পরিচিতি আগে বর্ণনা করা যাক। তারপর গল্প হবে।

সুমিষ্ট হাতের বাজনার জন্যে সেকালে সরদ-বাদক মুরাদ আলী চিহ্নিত ছিলেন সঙ্গীতের আসরে। ভারতবর্ষে যে ক'টি মুসলমান পরিবারে কাবুলি সরদ থেকে ভারতীয় সরদের চর্চা প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, মুরাদ আলীর পরিবার তার মধ্যে অন্যতম। মুরাদ আলীর পিতা গোলার আলী এই বংশে সরদের প্রথম প্রচলন করেন। সরদ যন্ত্রের যে আকার-প্রকার বর্তমানে দেখা যায় তা প্রথম প্রবর্তন হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে এবং সেই প্রথম যুগে যাঁরা এই যন্ত্রে ভারতীয় রাগ বাজাতেন, তাঁদের সকলেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন আফগানিস্তান নিবাসী ও কাবুলি সরদ (তাঁদের ভাষায় সুরুদ) বাদক। সে সময়ে, অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সঙ্গীত-ক্ষেত্রে যাঁরা প্রথম সরদ সাধনা আরম্ভ করলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন নিয়ামৎ উল্লা খাঁ। মুরাদ আলীর পিতা গোলাম আলী ছিলেন নিয়ামৎ উল্লার সমসাময়িক অন্যতম সরদ-বাদক।

রেবার রাজা, সঙ্গীত-গুণী এবং সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক বিশ্বনাথ সিং-এর দরবারে গোলাম আলী দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং মহারাজা বিশ্বনাথের কাছে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে নানাভাবে ঋণী। মহারাজা স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ায় তাঁর কাছে গোলাম আলী অনেক পরিমাণে সঙ্গীত-বিদ্যা লাভ করবার সুযোগ পান। একথা পরবর্তীকালে এই বংশীয় সরদগুণী হাফিজ আলী খাঁ উল্লেখ করতেন। উপরন্তু, রেবা রাজ্যের দরবারে থাকবার সময় মহারাজার নিযুক্ত গুণীবৃন্দ জাফর খাঁ.' প্যাঁর খাঁ প্রভৃতির সঙ্গীত-চর্চা শুনেও উপকৃত হন গোলাম আলী। এইভাবে তাঁর সঙ্গীত-জীবন গঠিত হয়।

গোলাম আলী সরদ-বাদক রূপে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেননি বটে, কিন্তু আর একটি কারণে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে সরদ-বাদনের ক্ষেত্রে। তাঁর বংশধরগণ গুণী সরদী হিসাবে বিশেষ খ্যাতিমান হয়ে উত্তর ভারতে একটি বিশিষ্ট সরদী পরিবার হয়ে উঠেন। একটিমাত্র পরিবারের অন্তর্গত

এতগুলি প্রথম শ্রেণীর সরদগুণীর দৃষ্টান্ত ভারতে আর বিশেষ দেখা যায় না।

গোলাম আলীর তিন পুত্রই সরদ-বাদক—হোসেন খাঁ, মুরাদ আলী ও নান্নে খাঁ। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হোসেন খাঁর সব চেয়ে প্রতিভাবান ছিলেন, এমন প্রসিদ্ধি আছে। হোসেন খাঁ সঙ্গীত-কৃতি পিতার তালিমের ফল নয়। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত সুরবাহার-গুণী গোলাম মহম্মদের নাড়া-বাঁধা শিষ্য। হোসেন খাঁর পুত্র আসঘর আলীও একজন উচ্চাঙ্গের যন্ত্রশিল্পী ছিলেন। দ্বারবঙ্গ-রাজের দরবারে নিযুক্ত এই গুণীর বর্ণনা করা হয়েছে 'সঙ্গীতের আসরে' বইখানির 'খাম্বাজ থেকে ভৈরবী' অধ্যায়ে।

গোলাম আলীর কনিষ্ঠ পুত্র নান্নে খাঁ ছিলেন বর্তমানের প্রবীণ-শিল্পী হাফিজ আলী খাঁর বিপিতা। হাফিজ আলী যখন তিন বছরের শিশু সে সময় তাঁর জননীর সঙ্গে নিকা হয় নান্নে খাঁর। নান্নে খাঁ তাঁর অপর দুই ভ্রাতার তুল্য প্রখ্যাত ছিলেন না।

গোলাম আলীর দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ আলী সুনাম অর্জন করেছিলেন কৃতী সরদী-রূপে। তিনি দ্বারবঙ্গের রাজ-দরবারে অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন, কখনো কখনো অন্যান্য সঙ্গীতাসরেও আমন্ত্রিত হয়ে গুণপণা প্রদর্শন করতেন। তাঁর বাজনার এক প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর অতি মিষ্টি হাত। আলাপে, বিশেষত বিলম্বিত আলাপে নিপুণতা তাঁর আর এক বিশিষ্ট কৃতিত্ব।

মুরাদ আলীর সঙ্গীত-শিক্ষা সম্বন্ধে এই জানা যায় যে, তিনি প্রথম জীবনে পিতার কাছে কিছু গৎ শিখেছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ঋণী ছিলেন অন্য ওস্তাদের কাছে। বিশেষ করে গোলাম মহম্মদ (যাঁর উল্লেখ করা হয়েছে হোসেন খাঁর শিক্ষা-প্রসঙ্গে) এবং আমীর খাঁর কথা বলতে হয় এ ক্ষেত্রে।

গোলাম মহম্মদের চেয়ে তিনি (মুরাদ আলী) আমীর খাঁর কাছে বেশি লাভবান হয়েছিলেন। এই আমীর খাঁ হলেন ওমরাও খাঁর পুত্র এবং রামপুর ঘরানার অন্যতম প্রবর্তক। রামপুরে আমীর খাঁর কাছে অনেক সময় থেকে মুরাদ আলী অনেক বিদ্যা আদায় করেছিলেন, যদিও গোলাম মহম্মদ বা আমীর খাঁ কারুরই নাড়া-বাঁধা শিষ্য ছিলেন না তিনি। এমনিভাবে সঙ্গীত সম্পদ আহরণ করে আপন প্রতিভা ও সাধনায় মুরাদ আলী তৎকালীন সঙ্গীত-জগতে সুপ্রতিষ্ঠ হন।

তিনি ছিলেন অপুত্রক। সেজন্যে আবদুল্লা খাঁকে পোষ্যপুত্র নেন। আবদুল্লা খাঁ-ই মুরাদ আলীর একমাত্র শিষ্য ও উত্তরাধিকারী। আবদুল্লা খাঁ

পরিণত বয়সে মাঝে মাঝে কলকাতায় এলেও বেশীর ভাগ দ্বারবঙ্গেই থাকতেন। তাঁর কাছে একাধিক বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞ কিছু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, জানা যায়। গুণী এস্রাজী শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে দ্বারবঙ্গে তাঁর কাছে শিখতে যেতেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর আনুকূল্যে। শেষ বয়সে আবদুল্লা খাঁ যখন্ কলকাতায় আসতেন, সে সময় তরুণ বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করতেন। তবে, বেশির ভাগ পেশাদার ওস্তাদদের মতন আবদুল্লা খাঁরও যথার্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র—বাঙলা দেশে খ্যাতনামা সরদী আমীর খাঁ।

কলকাতায় আমীর খাঁ দীর্ঘকাল বাস করেন এবং তাঁর প্রায় সমস্ত শিষ্যই বাঙালী।

এসব প্রায় হাল আমলের কথা হলেও আমীর শিষ্যদের নাম এখানে উল্লেখ করে রাখা ভাল। আমীর খাঁর বাদন রীতি গৎ তান তোড়ার যে বৈশিষ্ঠ্য ছিল তা তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের অনেকে লাভ করেন। তাঁর শিষ্যদের এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে, বাঙলাদেশে এক সময়ে কতখানি ছড়িয়েছিল আমীর খাঁর সরদ বাজনার চাল। নানা সময়ে আমীর খাঁর কাছে শেখেন আশুতোষ কুণ্ডু, বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সুবল দে, রাধিকামোহন মৈত্র প্রভৃতি।

আমীর খাঁর কোনো পুত্র ছিল না। এই দিক থেকে বলা যায়, মুরাদ আলীর সঙ্গীত বিষয়ে উত্তরাধিকার আবদুল্লা খাঁ ও আমীর খাঁর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশে এবং বাঙালীদের মধ্যে বর্তেছিল। মুরাদ আলীর সঙ্গীত-জীবনের উত্তরকালে এই এক লক্ষণীয় ফল।

এসব প্রসঙ্গের সঙ্গে অবশ্য মুরাদ আলীর সে দিনকার আসরের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

সে আসরে আর একজন যে গুণীর কথা বলা হয়েছে—বামাচরণ ভট্টাচার্য—মুরাদ আলীর মতন তাঁর কোন সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে জন্ম হয়নি। কিন্তু বাঙলায় এই বিচিত্র সঙ্গীত-প্রতিভা কোন প্রকার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের মধ্যে বাল্যকাল থেকে লালিত না হলেও, পরবর্তীকালে অসাধারণ প্রতিভায় নিজেই এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যান যন্ত্র-সঙ্গীতের একটি বংশধারা পত্তন করে।

তাঁর পুত্র ও শিষ্য জিতেন্দ্রনাথ তখনকার সর্বভারতীয় সঙ্গীত-ক্ষেত্রের

নিরিখেও একজন প্রথম শ্রেণীর সুরবাহার ও সেতার-গুণী ছিলেন। বামাচরণের সঙ্গীত-সম্পদের তিনি শুধু যোগ্য উত্তরাধীকারী ছিলেন না, আপন প্রতিভা ও সাধনায় তাকে ভাবীকালের জন্য প্রবর্ধিতও করে যান। তাঁর আলাপচারিতে মনোমুগ্ধকর সুদীর্ঘ মীড় ইত্যাদির সূক্ষ্ম কারুকর্ম এবং ছেড়, জোড় প্রভৃতি অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করত আসরে।

জিতেন্দ্রনাথের পুত্র লক্ষ্মণ অকালে মৃত্যু-কবলিত হলেও প্রতিভাবান সেতারীরূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন এবং কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন। জিতেন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মণের শিষ্যধারায় বামাচরণের যন্ত্রসঙ্গীতের ঐতিহ্য বাঙলা-দেশের সেতার সুরবাহারের চর্চায় একটি উল্লেখ্য অধ্যায় হয়ে আছে।···

জন্মসূত্রে সঙ্গীতের কোন উত্তরাধিকার বামাচরণ লাভ করেননি। তাঁদের বংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পেশাও শাস্ত্রচর্চা। পিতা রামকমল শিরোমণি পণ্ডিতী করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। চব্বিশ পরগণার বারাসাত অঞ্চলে নিবাস ছিল তাঁর। পুত্র বামাচরণকেও সেইভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রামকমল করেছিলেন। শিক্ষার্থী জীবনে বামাচরণ ব্যাকরণ শিখেছিলেন, আর দর্শন শাস্ত্রের কিছু কিছু। তারপর বেদ অধ্যয়ন করতে কাশীতে যান। পরে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে।

কিন্তু সে সবই বলা যায় তাঁর বহিরঙ্গ জীবনের কথা। বাহ্য পরিচয়। তাঁর যথার্থ স্বরূপ হল সঙ্গীতজ্ঞরূপে। সে এক অনন্য কাহিনী।

অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতের প্রতি বামাচরণ গভীর ও অন্তরঙ্গ আকর্ষণ বোধ করতেন বটে, কিন্তু তখ তার কোন প্রকাশ বাইরে ঘটেনি। রীতিমত ভাবে শিক্ষার কোন সুযোগ পাননি তিনি।

সে সুবিধা পেয়েছিলেন পরে এব তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। যজমানী বৃত্তির জন্যে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন সেকালের কয়েকটি সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতজ্ঞ জমিদার পরিবারের সঙ্গে। যেমন গোবরডাঙার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় পরিবার।

তারপর তাঁদের অন্তরঙ্গ আরো ক'টি তুল্য পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বামাচরণের ঘনিষ্ঠতা হয়। যথা, মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরী ও রানাঘাটের পাল-চৌধুরী বংশ। সেকালের অনেক ভূম্যধিকারী পরিবারের মতন এঁরাও সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক যেমন ছিলেন, তেমনি উৎসুক শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত ওস্তাদের অধীনে শিক্ষালাভের আনুকূল্যও করতেন।

এমনিভাবে জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী এবং পাল-চৌধুরী পরিবারের সঙ্গীতপ্রেমীদের সদাশয় সুযোগদানের ফলে তাঁদের সঙ্গতসভায় নিযুক্ত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কলাবতের শিক্ষালাভ করেন বামাচরণ।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরও তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার বিষয়ে সহায়তা করে-ছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনের সহযোগিতার জন্যেই তাঁর নিযুক্ত গুণী সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে শিক্ষার সুযোগ বামাচরণ পেয়েছিলেন, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়িতে।

সঙ্গীতে বামাচরণের প্রতিভা এবং শিক্ষা করে নেবার অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁর উক্ত অনুরাগীরা এমন কয়েকজন ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে তাঁর শেখবার ব্যবস্থা করে দিলেন যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সম্ভাবনাও তাঁর অবস্থার পক্ষে অভাবিত ছিল।

যাঁদের কাছে বামাচরণ এইভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হল :

সুরবাহার-গুণী মহম্মদ খাঁ, বীণ্‌কার ওয়ারিস খাঁ, সেতার-সুরবাহার-গুণী সাজ্জাদ মহম্মদ, রবাবী বাসৎ খাঁ, ধ্রুপদী যদু ভট্ট, খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁ ঠুংরি-গায়ক ছন্নি খাঁ, এবং হিঙ্গনজান ও দিলজান বাঈজীদ্বয় (রানাঘাটের পাল-চৌধুরী ভবনে নিযুক্তা)।

তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি মহম্মদ খাঁর কাছে। তা ভিন্ন সাজ্জাদ মহম্মদ ও বাসৎ খাঁর শিক্ষাও তিনি উল্লেখ্য ভাবে পান। এই তিন জনের কাছে তিনি যা লাভ করেছিলেন, তার সাধনাতেই তাঁর সঙ্গীতসত্তা বিকশিত হয়। একজন সত্যকার গুণী যন্ত্রীরূপে তিনি আদৃত হন সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে।

সেতার সুরবাহার যন্ত্রে বামাচরণ সাধনা করলেও, কণ্ঠ-সঙ্গীতের চর্চাও তিনি করেছিলেন। তবে, আসরে গান গাইতেন না, সাধারণত সেতার বাজাতেন এবং কখনো কখনো সুরবাহার।

ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর কাছে তিনি যে ভালভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে-ছিলেন তা সম্ভব হয় গোবরডাঙার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জন্যে। জ্ঞানদাপ্রসন্ন নিজে মহম্মদ খাঁর তালিমে সুরবাহার-বাদক রূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন। মহম্মদ খাঁর কাছে অনেক সময় জ্ঞানদাপ্রসন্নের সঙ্গেও

শিখতেন বামাচরণ, গোবরডাঙায় এবং তাঁদের কলকাতার ভবনে।

মহম্মদ খাঁর কথা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার, কারণ যে আসরের কথা নিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা সেখানে মহম্মদ খাঁকে উপলক্ষ করেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল।

মহম্মদ খাঁর কথায় সাজ্জাদ মহম্মদের প্রসঙ্গও কিছু আসবে। কারণ তাঁরা একই 'ঘরের'; এবং দুজনেই কলকাতায় এসে দীর্ঘদিন বাস করে ছিলেন এক সঙ্গে। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত সুরবাহার-গুণী গোলাম মহম্মদের পুত্র ও শিষ্য ছিলেন সাজ্জাদ মহম্মদ। মহম্মদ খাঁও লক্ষ্ণৌতে গোলাম মহম্মদের তালিম পান, কিন্তু খুব বেশি শিক্ষার সুযোগ পাননি। তাঁর ওস্তাদের পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ তাঁর চেয়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং অত্যন্ত গুণীও। সেজন্যে সাজ্জাদ মহম্মদের কাছেই মহম্মদ খাঁ শিখেছিলেন বেশি। সাজ্জাদ মহম্মদ লক্ষ্ণৌ থেকে পরে বাঙলা দেশে এসে মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই থাকেন, দীর্ঘকাল ধরে মহম্মদ খাঁ তাঁর সেবা-পরিচর্যা করেন এবং তাঁর সঙ্গীতের উত্তরাধিকারীও হন।

বামাচরণবাবুও মহম্মদ খাঁর কাছে যেমন শেখেন, তেমনি সাজ্জাদ মহম্মদের শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। বামাচরণবাবুকে দুজনেরই শিষ্য বলা যায়, তবে মহম্মদ খাঁর শিক্ষা হয়ত পেয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি। সেজন্যে বাইরে অনেক জায়গায় বামাচরণ মহম্মদ খাঁর শিষ্যরূপেই অধিকতর পরিচিত হয়েছিলেন।

নাড়াজোলের যে আসরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে উপস্থিত মুরাদ আলী বামাচরণকে মহম্মদ খাঁর শিষ্য হিসেবে বোধ হয় সেখানেই জানতে পারেন।

মুরাদ আলীর পারিবারিক সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় দেবার সময়ে আগে বলা হয়েছে যে, তিনি গোলাম মহম্মদের শিক্ষা কিছু পেয়েছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন খাঁ ছিলেন গোলাম মহম্মদের একজন প্রকৃত শিষ্য। সুতরাং মুরাদ আলীর গোলাম মহম্মদ এবং তাঁর 'ঘরের' কথা অর্থাৎ শিষ্যাদির কথা সবিশেষ জানা ছিল, বোঝা যায় গোলাম মহম্মদ এবং তাঁর কৃতী পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ দু-জনেরই শিষ্য মহম্মদ খাঁকেও নিশ্চয় চিনতেন মুরাদ আলী।

কি কারণে জানা যায় না, মুরাদ আলী মহম্মদ খাঁকে অপছন্দ করতেন। মহম্মদ খাঁর প্রতি তাঁর সেই বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ল সেদিনকার

নাড়াজোল রাজবাড়ির আসরে।

মুরাদ আলি সে আসরে প্রথমে বাজালেন। আগেকার আমলের মজলিসে এটি প্রায় প্রথা ছিল যে, প্রবীণ বা বয়োজ্যেষ্ঠ গুণী প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, পরে গাইবেন বা বাজাবেন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীরা।

মুরাদ আলীর বাজনার পরে বামাচরণের বাজাবার কথা। কিন্তু তাঁর বাজনা আরম্ভ হবার আগে মুরাদ আলী মহম্মদ খাঁর কিছু নিন্দাবাদ করলেন। মহম্মদ খাঁর সেতার যন্ত্রে কৃতিত্ব নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মন্তব্য করলেন মুরাদ আলী।

বামাচরণ নিজের ওস্তাদের সেতার বাদনের নিন্দা এমন প্রকাশ্য আসরে শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। মহম্মদ খাঁকে তিনি যন্ত্র-সঙ্গীতের ওস্তাদরূপে শ্রদ্ধা করতেন বিশেষভাবে। কারণ তাঁর কাছেই তিনি সুরবাহার সেতারে সব চেয়ে বেশি শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মহম্মদ খাঁকে তিনি এত শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর একটি প্রতিকৃতি স্বহস্তে খোদাই করে রেখেছিলেন নিজের হাতের সেতার যন্ত্রটিতে।

বামাচরণের এই আর একটি গুণ ছিল যে, তিনি নিজে সেতার যন্ত্র তৈরি করতে পারতেন। এবং তাঁর হাতের তৈরি সেতারটিই তিনি আসরে বাজাতেন। তম্বুরার বদলে কাঠের তৈরী তাঁর সেই হাতের সেতারটি পরে তাঁর পুত্র জিতেন্দ্রনাথও রক্ষা করেছিলেন সযত্নে।...

যা হোক, মুরাদ আলীর মুখে নিজের ওস্তাদের নিন্দা শুনে বামাচরণ কিন্তু কলহে প্রবৃত্ত হলেন না। তিনি স্থির করলেন, মুখের কথায় জবাব না দিয়ে মুরাদ আলীর নিন্দার উত্তর সমুচিতভাবে দেবেন যন্ত্রেরই মাধ্যমে মহম্মদ খাঁর যে সেতার-বাদনের অপযশ মুরাদ আলী করেছেন, মহম্মদ খাঁর শিষ্যরূপে সেই সেতার বাজিয়েই তিনি গুরুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবেন।

বামাচরণ নিজের হাতে-গড়া সেতারটি নিয়ে তখন আসরে বাজাতে বসলেন। ওস্তাদের শিক্ষা ও নিজের সাধনায় সিদ্ধ বাদন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগলেন মুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে।

মুরাদ আলী প্রথম দিকে বামাচরণের বাজনার কোনো গুরুত্ব দিলেন না। অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়ে বসে রইলেন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। বামাচরণের নিপুণ হাতের সেতার ঝঙ্কৃত হতে লাগল উত্তরোত্তর তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এমন সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ সে বাদন-পদ্ধতি যে মুরাদ আলী বেশিক্ষণ

উদাসীনতার ভান করে থাকতে পারলেন না। তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, এই নবীন সেতারী নিজস্ব ধারায় বাজাবার পর আবার এমন সব অলঙ্করণ করছেন যা বিশেষ করে সরদের জিনিস এবং যা তিনি এই আসরে খানিক আগেই প্রয়োগ করেছেন।

বামাচরণ মুরাদ আলীর সরদের সেসব কায়দা সেতারে বাজিয়ে দেখিয়ে যেন যন্ত্রের ভাষায় তাঁকে বলতে চান যে—এই তো আমি সেতারে আপনার সরদের কাজ দেখাচ্ছি। এখন আমি সেতারে যে সব জিনিস বাজাচ্ছি আপনি সরদে দেখান তো ?

এ যেন সাঙ্গীতিক ভাষায় একরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানায়। মুখের কথায় কলহ না করে সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতিযোগিতা করা।

অবশেষে বামাচরণ যখন বাজনা শেষ করলেন শ্রোতাদের প্রশংসাধ্বনির মধ্যে, তখন মুরাদ আলী কিন্তু প্রত্যুত্তরে যন্ত্র নিয়ে বসলেন না। বামাচরণের উদ্দেশে তারিফ করে তাঁদের একটি প্রাণের কথা বলে ফেললেন—আপনি নিশ্চয় মুসলমান। হিন্দু ব্রাহ্মণ সেজে এখানে এসেছেন। পুরুষানুক্রমে পেশাদার না হলে এমন শেখা অসম্ভব।

কথাটা অদ্ভুত বটে। তবে এর মধ্যে বামাচরণের বাজনার সুখ্যাতি প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি এত ভাল বাজিয়েছেন যে, তাঁকে মুরাদ আলীর মনে হয়েছে পেশাদার মুসলমান বাদক। বামাচরণ হিন্দু হয়েই অন্যায় করে ফেলেছেন বলে মুরাদ আলীর বাঁকা মন্তব্য শুনতে হল। বামাচরণ মুসলমান বলে মুরাদ আলী নিশ্চয় তারিফ করতেন সোজা ভাষায়।

কিন্তু খাঁ সাহেবের কথায় নিতান্ত অকারণে যে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেখা গেল, তা আসরের কেউ লক্ষ্য করলেন না। বামাচরণবাবু কিংবা উপস্থিত অন্য কোন হিন্দু ভদ্রতা ও সৌজন্যের বশে মুরাদ আলীর মুখের ওপর একথা বলতে পারলেন না—ভাল বাদক হলে তাকে কি মুসলমান হতেই হবে ? অন্য দৃষ্টান্তের তো অভাব নেই ! এই আসরে যে হিন্দুর নৈপুণ্য প্রকাশ পেলে তাতেও তো আপনার ধারণা ধূলিসাৎ হওয়া উচিত। আর পুরুষানুক্রমে পেশাদার হওয়ার অজস্র উদাহরণ পশ্চিমের হিন্দু কলাবত সমাজে অভাব নেই, বাঙালীদের মধ্যে না থাক ! তা ছাড়া সঙ্গীতের আসরে হিন্দু মুসলমানের নাম, আলাদা করে করা কি শোভা পায় ? শিল্পী হিসেবে তার পরিচয় তা হলে আপনার কাছে যথেষ্ট নয় ! বাদকের ধর্মের কথা

আপনার মনে আসে কেন? শিল্পী এখানে সবচেয়ে বড়। আপনি তা স্বীকার করতে না পেরে শিল্পের জগতে খাটো হয়ে গেলেন।

এসব কথা উচ্চারণ করতে সাধারণ হিন্দুর উদারতায় বাধে। পাছে কেউ তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে দেয় এই দুর্ভাবনায় সে সদা-সন্ত্রস্ত। অসাম্প্রদায়িক হতে গিয়ে যে পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে সে চিন্তার বালাই তার নেই! তাই স্থূল সাংসারে যেমন দেখা যায়, অর্ধ-সত্য বা প্রায়-মিথ্যাকে অত্যন্ত মোটাভাবে কিংবা বার বার বিঘোষিত করার ফলে এবং প্রতিবাদের অভাবে তা লৌকিক ক্ষেত্রে সত্যের মর্যাদা লাভ করে, এখানেও তাই হল। মুরাদ আলীর এমন একটি অবান্তর কথা বলার জন্যে যেখানে অপদস্থ হবার কথা তিনি তা আদৌ হলেন কি? বরং তাঁর কথাটিই সেখানে টিকে রইল—বামাচরণবাবু এত ভাল বাজিয়েও হিন্দু ও ব্রাহ্মণ থেকে যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছেন! আর এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ধরে দিয়েছেন মুরাদ আলী!

ব্যাপারটি আরো মজার এই জন্যে যে, মুরাদ আলীকে সে আসরে বাজবার জন্যে দক্ষিণা দেবেন হিন্দু এবং আসরের প্রায় সমস্ত শ্রোতাও হিন্দু।

তবু মুরাদ আলীর অতি অযৌক্তিক মন্তব্যের কোনো প্রতিবাদ সেখানে শোনা গেল না।

সেই বেসুরের মধ্যেই শেষ হল সেদিনের নাড়াজোলের আসর।

॥ ভগবানের চাবুক ॥

সঙ্গীতের আসরে কত চমকপ্রদ ঘটনাই ঘটে গেছে। কত মর্মান্তিক ও মারাত্মক দুর্ঘটনা পর্যন্ত। কি বৈচিত্র্যময় সব আসরের কথাই যে শোনা যায়। কত করুণ, রুদ্র, হাস্যরসের কাহিনী। কত কৌতূহল-উদ্দীপক, মিলনান্তক বা বিয়োগান্তক পরিণতি। সুরের আসরে কত বিবাদ বচসা, কত অসুরের উপদ্রব কিংবা সুরের শতদল বিকাশের কথা।

তার মধ্যে এই বিচিত্র আসরটি অনন্য হয়ে আছে। এমন ঘটনা-পরম্পরা, এমন বিষয়-বৈচিত্র্য একটিমাত্র আসরের উপলক্ষ্যে সচরাচর শোনা যায় না সেকালের কথায়।

এ আসরের বিবরণ আজকের দিনে অবিশ্বাস্য মনে হবে। গল্পকথার মতনও শোনাতে পারে। কিন্তু গল্পের মতন মনে হলেই যে অলীক কিম্বদন্তী হবে, তা নয়। সত্য অনেক কল্পনাকেও হার মানায়। বাস্তব কখনো কখনো অতিক্রম করে যায় উপন্যাসকে। তাই এমন সব ঘটনা জগতে ঘটে যেতে পারে যা বিবৃত করতে গেলে মনে হবে অদ্ভুত, অভাবিত।

সঙ্গীতের আসরেও অত্যাশ্চর্য কাহিনীর অভাব নেই। তেমনি একটি বলা হবে এই অধ্যায়ে।

কতদিন আগেকার কথা! আজ থেকে প্রায় ষাট বছরের হবে। এই শতকের একেবারে গোড়ার দিকের ঘটনা। সেদিনের সেই খণ্ড জীবন-নাট্যের কোনো পাত্রই এখন আর ইহলোকে নেই। নাটিকার সূত্রধারও কিছুদিন আগে লেখককে তার বিবরণ দিয়ে মর জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন অতি বৃদ্ধ বয়সে।

সেদিনের সেসব মানুষ চলে গেছেন বটে, কিন্তু সেইসব ঘটনার কথা লুপ্ত হয়ে যায়নি। তারা জীবন্ত আছে শ্রুতি-স্মৃতিতে। তাদের যেন মৃত্যু নেই। শিল্পীদের নশ্বর দেহ গ্রাস করেছে মহাকাল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গীত-জীবনের বিচিত্র কীর্তি ও কাহিনী, তাঁদের সার্থকতা ও দুর্বলতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের নানা সংবাদ পরবর্তীযুগে এসে পৌঁচেছে ইতিহাস হয়ে। সঙ্গীত-জগতের সেসব ইতিহাস যদিও এ পর্যন্ত অলিখিত আছে।

যে বাড়িতে সেই বিশেষ আসরটি বসেছিল সেটিরও অস্তিত্ব রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ। অবশ্য তার বাহ্যরূপে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বললেই সঠিক হয়। যে উত্তর কলকাতায় সেকালের নাগরিক বাঙালীর গৃহস্থাপত্যে রাজকীয় ঐশ্বর্যের নিদর্শন বেশ কিছু ছিল, সে অঞ্চলেও এই প্রাসাদোপমটির তুল্য দেখা যেত না বড় একটা।

হস্তান্তরিত হয়ে এখনো তা জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বিদ্যমান। কলকাতা নিবাসী রাজস্থানের বণিকদের উদ্‌যোগে এখন তা একটি সেবা প্রতিষ্ঠান। নাম—লোহিয়া মাতৃ সেবাসদন। কিন্তু এ নাম তো সেদিনের কথা।

তারও আগেকার ইতিহাস কম বিচিত্র নয়। মাতৃ সেবাসদন এখানে প্রতিষ্ঠার আগে অট্টালিকার মালিক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ধনী মল্লিক পরিবারের প্রদ্যুম্ন মল্লিক।

তাঁর আগেকার স্বত্বাধিকারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের যখন ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল, মল্লিক মশায় এটি কিনে নেন। স্বত্ব পাবার পর বাড়ির সামনেকার বিরাট

সোপানশ্রেণীর প্রতি ধাপে উৎকীর্ণ করেন একটি স্পর্ধিত ছড়ার এক একটি লাইন।' পূর্ববর্তী মালিকদের প্রতি শ্লেষ ও অহমিকা প্রকাশ করে সেই ছড়াটি লেখা হয়েছিল।

কিন্তু অচিরকালেই তাঁরও (প্রদ্যুম্ন মল্লিকের) জীবনের কি মর্মান্তিক পরিণতি দাঁড়াল। শুধু বাড়ি নয়, আরো অনেক কিছুর সঙ্গে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হল অকালে, নিজের হাতে।

প্রদ্যুম্ন মল্লিকের তখন মহা নামডাক ছিল বাড়ি আর গাড়ি-বিলাসী বলে। নিত্য-নতুন মডেলের খান পঞ্চাশ মোটর গাড়ি তাঁর শখের বাহন ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি বিলাসিতার হিসেবে। শ্লেষাত্মক ছড়া লেখবার স্পর্ধা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল, বলা যায়। কারণ অতি শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ইহজীবনের দেনা স্বহস্তেই কৃত্রিমভাবে শেষ করতে হয় তাঁকে।

প্রদ্যুম্ন মল্লিকের আগে হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল। তাঁর আগে তাঁর পিতা আশুতোষ শীল ও পিতৃব্য দুনিয়ালাল শীল। তাঁদের আগে তাঁদের মাতামহ প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক। প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের পিতা রূপলালের (মৃত্যু ১৮৫৫ খৃঃ) আমলেই বোধহয় অট্টালিকাটি তৈরী। এই মল্লিক বংশ সিঁদুরে পটির বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের একটি শাখা এবং রূপলালের পিতামহ হলেন স্বনামপ্রসিদ্ধ নয়নচাঁদ মল্লিক। কিন্তু সেসব বৃত্তান্তে দরকার নেই। এখানে জানবার কথা হল, প্রাণকৃষ্ণের পুত্র না থাকায় একমাত্র কন্যার দুই পুত্র আশুতোষ ও দুনিয়ালাল তাঁর বিষয়-সম্পত্তি পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুনিয়ালাল অপুত্রক। সুতরাং সবকিছুর উত্তরাধিকার লাভ করেন আশুতোষের একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ।

এই হল সৌধটির জীবন-নাট্যের নায়ক পরম্পরা। যে আসরের গল্পটি বলবার জন্যে অট্টালিকার কথার অবতারণা, সেটি হরেন্দ্রকৃষ্ণের আমলের।

সেদিনের গল্পটি আরম্ভ করবার আগে হরেন্দ্রকৃষ্ণের কথা বিশেষ করে জানাবার আছে। তিনিই ছিলেন সে আসরের উদ্‌যোক্তা। তা ছাড়া, সেকালের বাঙলার একজন সত্যিকার গুণী হিসেবেও তাঁর কথা স্মরণীয়।

শৌখীন হলেও তিনি প্রথম শ্রেণীর সুরবাহারবাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীতের শিল্পী কৌকব খাঁর তিনি একজন সুযোগ্য শিষ্য। কৌকব খাঁর আগে অন্যান্য ক'জন ওস্তাদদের শিক্ষাও অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে খাঁ সাহেবের নামই ছিল বেশি আর তাঁর কাছে তিনি

একাদিক্রমে শেখেন প্রায় সাত বছর।

তারপর কৌকব খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করামৎ উল্লা খাঁর কাছেও শিখেছিলেন। কৌকব ও করামৎ উল্লার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ বসু। তিনি ছিলেন সরদী এবং খাঁ সাহেবদের নিজস্ব সরদ ঘরানার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। ধীরেন্দ্রনাথের গুরুভাইদের মধ্যে তাঁর পরেই উল্লেখ্য হলেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল।

শীল মশায় প্রধানত সুরবাহার-শিল্পী। সেতার-চর্চা প্রথম জীবনে করলেও পরে একরকম ছেড়ে দেন। সেজন্যে রাগের আলাপচারি অংশেই আত্মনিয়োগ করেন বেশি। রাগালাপে তিনি এই ঘরের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন। পরিণত বয়সে খেয়াল গানের চর্চাও করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ পরে আসবে।

অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে এবং এক মুক্তহস্ত সঙ্গীতপ্রেমী পরিবারে তাঁর জন্ম। আশুতোষ শীলের একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ। কাকা চুনিয়ালাল শীল অপুত্রক বলে সমস্ত সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী তিনি। সঙ্গীত-বিলাসী সমাজে সুপরিচিত চুনী শীল ছিলেন সঙ্গীতের এক অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক। সরকারী ভাবে খেতাব না পেলেও সঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ে বিলাসিতার জন্যে অনেকের কাছে রাজা চুনী শীল নামে তাঁর পরিচয় হয়ে যায়।

বাড়ির জলসাঘর তাই ছেলেবেলা থেকেই হরেন্দ্রকৃষ্ণ সুর-মুখর দেখতেন। চুনী শীলের আসরে গানবাজনা করেননি, এমন গুণী সেকালে কমই ছিলেন বা আসেন কলকাতায়। ভাল আসরের জন্যে কত খরচ হবে সে কথাটা তাঁর কাছে একেবারে অবান্তর ছিল, এই প্রসিদ্ধি আছে।

এই সাঙ্গীতিক পরিবেশে হরেন্দ্রকৃষ্ণের জীবন আরম্ভ হয়। ছেলেবেলা থেকে সঙ্গীতে হাতেখড়ি। পিতৃব্য চুনিয়ালাল শুধু সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন না, সুরের চর্চাও কিছু করতেন; হারমোনিয়ম বাজাতেন, শোনা যায়। আরো কোন কোন যন্ত্র থাকত বাড়িতে।

একটু বড় হতেই হরেন্দ্রকৃষ্ণ সেতার শিখতে আরম্ভ করেন, গানের চর্চাও বোধহয় কিছু কিছু সেই সঙ্গে ছিল। দোতলার জলসাঘরে নিয়মিত বড় বড় ওস্তাদদের গান-বাজনা শোনা তাঁর আগে থেকেই অভ্যাস। সঙ্গীত শিক্ষার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র সেখানে। সেই সঙ্গে তাঁর শেখবার আগ্রহ দেখে বাড়িতে ওস্তাদের কাছে শিক্ষারও ব্যবস্থা হল।

প্রথমে তিনি শিখতে লাগলেন সেতার। গঙ্গা গিরি নামে তখনকার এক নাম করা সেতারী তাঁকে এই যন্ত্রবাদন শেখাতেন। ওই ওস্তাদের সঙ্গীত-জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না, তবে পরবর্তীকালে স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী স্থাপিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র বিদ্যালয়ে গিরি মশায় যে সেতার-শিক্ষক ছিলেন তা সঙ্ঘের মুখপত্র 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' থেকে জানা যায়।

গঙ্গা গিরির কাছে শিক্ষার পরে হরেন্দ্রকৃষ্ণের দ্বিতীয় গুরু হলেন নন্দ দীঘল। এঁর কাছেও তিনি সেতার শিখতেন। নন্দ দীঘলের তখন কলকাতায় নাম ছিল বীণাবাদকরূপে। কিন্তু তিনি কার শিষ্য ছিলেন, সেকথা জানা যায় না। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক হলেও কলকাতানিবাসী ছিলেন অনেক দিন থেকে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গীক তথ্য পাওয়া যায় পূজনীয় শিল্পাচার্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ' খানিতে। তা থেকে নন্দ দীঘল সম্বন্ধে উদ্‌ধৃত করবার দরকার হবে। শুধু হরেন্দ্রকৃষ্ণের অন্যতম সঙ্গীত শিক্ষক বলেই নয়, যে আসরের কথা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় তার সঙ্গে দীঘল মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বলতে গেলে, তিনিই ছিলেন সেদিনের আসরের প্রধান উপলক্ষ। তাঁর জন্যেই সে আসরের আয়োজন ও নাটকীয় পরিণতি। সে কারণেও তাঁর সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ করা চলে যে, প্রথম জীবনে প্রমোদকুমার সঙ্গীতচর্চা রীতি-মতভাবে করতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং যৌবনকালে ধ্রুপদ গাইতেন চন্দ্রকুমার চৌধুরীর (ওস্তাদ আলী বক্‌সের শিষ্য) শিক্ষাধীনে। শুধু ধ্রুপদ নয়, সে-সময়ে প্রমোদকুমার সেতারও শিখতেন বিষ্ণুপুরের ত্রিলোচন চক্রবর্তীর কাছে। উত্তর জীবনে চিত্রশিল্পকে একান্ত সাধনের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় সঙ্গীতচর্চা আর আগের মতন করতে পারেননি বটে, কিন্তু সঙ্গীত তাঁর চিরদিন অন্তরের আকর্ষণ হয়ে থেকেছে। তাই পরিণত বয়সে স্মৃতিকথা রচনার সময়ে প্রথম জীবনে দেখা-শোনা সঙ্গীতজ্ঞদের কথাও দীর্ঘ-কাল পরে প্রকাশ করেছেন 'প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে।

চট্টোপাধ্যায় মশায় প্রথম জীবনে উত্তর কলকাতার যেখানে থাকতেন পরে সেই রাস্তার নাম হয় বলরাম দে স্ট্রীট। তারই কাছে (এখনকার গিরিশ পার্কের পাশে) একটি বাড়িতে নন্দ দীঘল থাকতেন। একদিন

বিকালে প্রমোদকুমার সেখানে কিভাবে নন্দ দীঘলকে দেখেন এবং তাঁর বাজনা শোনেন, তা এইভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর ওই বইখানিতে !

"আমাদের বাড়ির পিছনে যে এখন গিরিশ পার্ক, সেটা আগে জোড়াপুকুর স্কোয়ার ছিল...। সেই বাগানের দক্ষিণ দিকে একখানা জীর্ণ দ্বিতল বাড়িতে থাকতেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দ দীঘল মশাই। পাটের দালালী করতেন, বড় বেলার ছিলেন এবং তখন তাঁর পশারও যথেষ্ট ছিল, চলনসই একটা ঘোড়ারগাড়িও ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী সমাজে তাঁর সম্ভ্রম কিছু কম ছিল না। কিন্তু আমার কাছে দীঘল মশাইয়ের পেশাদারি সম্ভ্রমের চেয়ে অন্য একদিকে তিনি মহৎ বলে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি তখনকার বাঙলায় প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ বীণ্‌কারদের একজন ছিলেন। ও ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন, কারণ তাঁর স্টাইল ছিল আর তা অনুকরণীয়ই ছিল, একথা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। আমাদের এই চন্দ্রবাবু (অর্থাৎ ধ্রুপদী চন্দ্রকুমার চৌধুরী, প্রমোদকুমারের সঙ্গীত শিক্ষক) দীঘল মশাইয়ের সহকর্মী বা সহকারী ছিলেন। দীঘল মশাই বীণ্‌কার আর চন্দ্রবাবু ধ্রুপদ ও খেয়ালে দক্ষ গায়ক।

একদিন মনের উদ্বেগে ছটফট করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐ স্কোয়ারে বসে ভাবছি, কি করে ঘরের অশান্তি থেকে বাঁচা যায়। দীঘল মশাইয়ের বৈঠকখানা থেকে বীণার ঝঙ্কার আসছে না? আর কথাবার্তা নেই, সেই ময়লা গেঞ্জী গায়ে, সোজা গিয়ে দেখি সম্ভ্রান্ত বাঙালী একদল স্থির হয়ে শুনছেন তাঁর বীণা। জানালার ধাপের উপরে বসতে যাচ্ছিলাম, প্রিয়-দর্শন মধ্যবয়সী শ্রোতাদের মধ্যে একজন, ইনিই চন্দ্রকুমার চৌধুরী—এইখানে বসো, বলে তক্তপোশের উপরে তাঁর পাশেই আমায় বসালেন।...যাই হোক যে রাগিণীর খেলা তখন চলছিল, অল্পক্ষণেই তা শেষ হয়ে গেল। উপস্থিত শ্রোতা সকলেই তখন ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। একজন তার মধ্যে বলে উঠলেন—এই হল যথার্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিক, কত তপস্যার ফল—এসব নিয়ে কালচারের সৌভাগ্য কয়জনের হয়?

অপর একজন বলে ফেললেন—দীঘল মশাই, আপনার তিলক কামোদ শুনব।

কামানো দাড়ি, ছাঁটা গোঁফ, প্রশস্ত ললাট, তাতে চন্দনের উর্ধ্বপুণ্ড্র, চন্দনলিপ্ত, সোনার কবচে সোনার চেন বাঁধা, নাতিদীর্ঘ দীঘল মশাই গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ব্যক্তি। বেশ মোটাসোটা, মাথায় টাকের আভাস, গম্ভীর স্বর তাঁর।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন ক'টা বেজেছে?

ঘড়ি ছিল না সেখানে। একজন বললেন—সাড়ে তিনটে-চারটে হবে।

শুনে তিনি বললেন—তিলোক কামোদের সময় নেই। গৌড়সারঙ্গ বাজাচ্ছি, শুনুন।

তারপর আলাপ আরম্ভ হল। গৌড়সারঙ্গের যে রূপ বীণায় তুললেন, এ অনির্বচনীয়···সেইদিন যেন আমার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নূতন জন্ম হল।"

এই নন্দ দীঘল হরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। ধনী শিষ্যের বাড়ি থেকে দক্ষিণার ব্যবস্থাও ছিল বেশ। মাসিক একশ টাকা। উপরন্তু চাল, ডাল, ঘি, তেল, ময়দা, ইত্যাদি সিধায় বরাদ্দ। আজ থেকে ৮০।৮৫ বছর আগেকার হিসেবে খুবই ভাল বলতে হবে।

দীঘল মহাশয়ের কাছেও সেতারে শিক্ষা নিতেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ। তাঁর পরেই যখন তিনি কৌকব খাঁর তালিম পেতে আরম্ভ করলেন, সেই সন্ধিক্ষণে সেদিনের আসরটি বসেছিল। আরো বলা যায়, সে আসর সেদিন ওইভাবে হয়েছিল বলেই হরেন্দ্রকৃষ্ণ শিখতে আরম্ভ করেন কৌকব খাঁর কাছে। সেদিনকার আসর না হলে নন্দ দীঘলের শেষ জীবন অন্যরকম হত, অন্তত ওই কাণ্ড ঘটত না এবং হরেন্দ্রকৃষ্ণকেও হয়ত কৌকব খাঁ শিষ্যরূপে লাভ করতেন না।

সেদিনের আসরটির গল্প বল্‌বার আগে শীল মহাশয়ের কথা আরো কিছু জানাবার আছে। তাঁর সঙ্গীত-জীবনের কথা শুধু নয়, তাঁর ব্যক্তি-জীবনের কথাও। সে জীবনও যেন একটি বিয়োগান্ত নাটক।

জন্মকালে যাঁর মুখে সোনার চামচ, মধ্যজীবনে যিনি কলকাতার একজন নাম-করা ধনী, শেষ বয়সে তিনি হন সর্বস্বান্ত।

একমাত্র বংশধর হিসেবে স্থাবর-অস্থাবর যত সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন তার মোট মূল্য তখনকার হিসেবেই কম-বেশি এক কোটি টাকা হবে। এই বিপুল ঐশ্বর্য কয়েক বছরের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায় তাঁর হাত দিয়ে। গিয়েছিল সব রকমেই। বিলাসে—সেকালের কাপ্তেনীতে, সঙ্গীতের পৃষ্ঠ-পোষকতায়, ব্যবসায়ে, বিশ্বাসঘাতকতায়, দান-খয়রাতে।

তার মধ্যে একটি বড় অংশ চলে যায় ব্যবসায়ের খাতে। সুবর্ণ বণিক ব্যবসায়ী বংশে জন্ম হলেও তিনি ব্যবসায়ী আদৌ ছিলেন না। ব্যবসায়েই তাঁদের সমস্ত পারিবারিক সম্পদ সঞ্চিত হলেও তিনি একেবারে ব্যর্থ হন

ব্যবসায় করতে গিয়ে।

বণিকের সে হিসেবী বুদ্ধি আর মানুষ চেনবার ক্ষমতা কিছুই তাঁর ছিল না। একের পর এক মোটা মোটা টাকার কারবারে নেমেছেন, কিন্তু ভার দিয়েছেন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের ওপর। তাঁদের স্বরূপ চিনতে পারেননি। সরল, উদার, তিনি। মানুষের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন চিরদিন। অনেকাংশে সেই বিশ্বাসই তাঁর কাল হয়েছিল, বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই তাঁর বেশি নষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য তার আলোচনা অবান্তর।

তবে তাঁর স্বভাবের বিষয়ে আরো দু-একটি কথা এখানে বলে নেওয়া যায়। বিলাস-বৈভবের দিনে কোন কোন বিষয়ে দুর্বলতা যেমন তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পায়, তেমনি অন্যদিকে মনের সারল্য ও মনুষ্যত্ব-বোধ কোন অবস্থাতেই হারিয়ে যায়নি তাঁর।

ঐশ্বর্যের সমস্ত রকম ভোগের মধ্যেও অন্তরে তাঁর কোথায় এক নিরাসক্তির ঔদাস্য ছিল। তাই সর্বস্বান্ত হবার পর তাঁর মনের কোন বৈকল্য ঘটতে দেখেনি কেউ। সমস্ত ব্যাপারটাকে অতি সহজভাবে নিয়েছিলেন।

বিপর্যয় একদিনে, এমন কি এক বছরেও হয়নি, বছরের পর বছর ধরে ভাঁটার স্রোত বইতে থাকে একটানা। সতর্ক হবার অনেক সুযোগ পেয়েও সাবধান হননি। তখনও সর্বস্ব যায়নি এমন এক সময়ে রানাঘাটের সঙ্গীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে, সেখানকার এক আসরে যোগ দিতে যাবার সময়ে, হরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেছিলেন—'আশি লাখ টাকা উড়ে গেছে।' কিন্তু তবু 'চৈতন্য' হয়নি।

অবস্থা বিপর্যয়ের পর তিনি প্রায় দশ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু পূর্ব জীবনের জন্যে কোনো ক্ষোভ বা চিত্ত-বিকার বা অনুশোচনা ছিল না। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মন। আগে নিজে যেমন সঙ্গীতচর্চা করতেন, এমনও তেমনি চলতে থাকে। শুধু সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের জন্যে আর্থিক কিছু করা সম্ভব হয় না।

শহরতলিতে থাকেন অতি সাধারণ পরিবেশে। কিন্তু সকলের সঙ্গে মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাৎ, আসরে যোগদান ইত্যাদি বিষয়ে আগেকারই মতন সামাজিক, মজলিসী।

গায়ে পুরু লংক্লথের পাঞ্জাবী, মোটা কাপড় আর ক্যানভাসের জুতো পায়ে এ-সময়ে তাঁকে পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কিংবা গান-বাজনার আসরে দেখা যেত। কখনও শিল্পীরূপে, বেশির ভাগই শ্রোতা হিসেবে।

কোন কোন দিন বিনা আমন্ত্রণেও সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হয়েছেন মনের টানে। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা খাতির, আপ্যায়ন করতেন। যাঁদের জানা ছিল না, তাঁদের লক্ষ্যই পড়ত না তাঁর দিকে। তিনি কিন্তু নির্বিকার। গান-বাজনা শুনে আস্তে আস্তে আসর থেকে চলে গেছেন।

তাঁর মনের সহ্যশক্তি আর বিকারশূন্যতার কথা বলতে গেলে গল্প-কথা মনে হবে। তার আর একটি দৃষ্টান্ত বিশ্বাস করাই শক্ত। যেমন ওই আসরের বাড়িতে নিলাম হওয়ার দিনটির কথা।

অট্টালিকা তখন দেনার দায়ে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তারই উদ্‌যোগ পর্ব হিসেবে অতি মূল্যবান সব আসবাব-পত্রাদি নিলামে চড়ে সেদিন।

এতকালের এমন এক শৌখীন ধনী পরিবারের কত রকমের সরঞ্জাম, কত বহুমূল্য জিনিস। সব সেদিন ওই বাড়ি থেকেই নিলামে জলের দামে যখন বিক্রয় হয়ে যায়, তিনি তখন একতলার একটি ঘরে বসে সুরবাহার বাজাচ্ছিলেন। জ্বলন্ত নগরীর মধ্যে রোম-সম্রাট নীরোর পরমোল্লাসে হার্প বাজাবার সঙ্গে তাঁকে উপমিত করা চলে না। কারণ নীরোর মতন তিনি হৃদয়হীন ছিলেন না এবং হতভাগ্য প্রজাদের অসংখ্য গৃহদাহের দৃশ্যের মধ্যেও সঙ্গীত উপভোগ করেননি তিনি।

নিজের মুক্তাভস্মের দৃশ্য এড়াবার জন্যেই হয়ত সুরবাহারে রাগালাপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সমাসন্ন সর্বনাশের দূত সেই নিলামের খবর পেয়ে সেদিন তাঁর অনেক প্রতিবেশীরই দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। কিন্তু তাঁকে দেখা যায় সমাহিতচিত্ত, নিরুদ্বিগ্ন, সঙ্গীতে নিমগ্ন!

তারপর আরও এক কঠিন আঘাত। শরীরের একদিক পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি তখনও অপরাজিত। সেই অবস্থাতেও গান-বাজনার সঙ্গে রীতিমত সম্পর্ক রেখেছেন। নানা আসরে আর সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, শ্রোতা হিসেবে সব সময় নয়, শিল্পীরূপেও। একটি হাতও অবশ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং এত সাধের ও এত দিনের সাধনার সুরবাহার বাজাবার আর সাধ্য ছিল না।

তাই তখন মাঝে মাঝে আসরে গান গাইতেন—খেয়াল। তৈরি গাওয়া এ অবস্থায় অসম্ভব, তা ছাড়া জীবনে বেশীর ভাগ কণ্ঠের চেয়ে যন্ত্র-সঙ্গীতেরই সাধনা করেছিলেন। এখন যে আসরে গান গাইছেন, এ-ই যথেষ্ট!

সঙ্গীতের কত বড় প্রেরণা থাকলে কোন অপেশাদারের পক্ষে শরীর ও জীবনের এই অবস্থায়ও গান গাওয়া সম্ভব হতে পারে, তা ভাববার কথা।

এই দুর্দিনে শুধু যে গান গাইতেন, তা নয়। সঙ্গীত বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তাও করতেন। তাঁর একটি চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা খেয়াল গানের বিষয়ে।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ) তিনি বাংলা ভাষায় খেয়াল গানের স্বপক্ষে এক অভিভাষণ দিয়েছিলেন। পাঠক-পাঠিকাদের তাঁর মত জানবার কৌতূহল হতে পারে বিবেচনায় তাঁর ভাষণ থেকে প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। এই উদ্ধৃতির পরেই আরম্ভ করা হবে সেদিনের আসরের গল্পটি।

সম্মেলনে অভিভাষণের মধ্যে তিনি বলেন—'আমার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি প্রধানতঃ একটি বিষয়ের অভাব আমাদের দেশের সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছি। সেবিষয়টি আর কিছুই নহে—'খেয়াল'। খেয়াল সাধারণতঃ হিন্দী বা উর্দু ভাষাতেই প্রচলিত, বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশে যে-যে মহোদয়গণ খেয়াল গানে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই হিন্দী বা উর্দুতে রচিত খেয়ালই আসরে গাহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে বাংলা ভাষাতে যেন খেয়াল গান হয় না। কেন যে বাংলায় খেয়াল রচনা হয় নাই তাহার মূল কারণ আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে পূর্বকালে পারদর্শী সঙ্গীতজ্ঞগণ অধিকাংশই অবাঙালী ছিলেন এবং যে সময় খেয়াল গানের সৃষ্টি হয় তখন ভাষার এত উৎকর্ষ লাভ হয় নাই এবং তখন উর্দু ভাষারই দেশে প্রচলন ছিল। এমন কি এই বাঙলা দেশেও হিন্দুরা উর্দু পাঠ করিতেন। ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে মুসলমান রাজত্ব ছিল এবং তজ্জন্য প্রধানত উর্দু ভাষাই রাজভাষা ছিল। প্রত্যেক প্রজাকেই তখন রাজভাষা পাঠ করিতে হইত, আর যে যে বাঙালী মহোদয়গণ খেয়াল গানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই অবাঙালী সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পর ভাষাতেই এই গান শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা এতাবৎ কাল বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন

নাই। যাহা হউক পর ভাষায় রচিত গান গাহিয়া অনেক সময় অনেক কথার প্রকৃত উচ্চারণ করিতে পারা যায় না এবং আমি অনেক আসরে লক্ষ্য করিয়াছি যে বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞ খেয়াল গান গাহিতেছেন এবং কোন একটি কথার প্রকৃত উচ্চারণ হইতেছে না বলিয়া সভাস্থ অপরাপর অ-বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞগণ পরস্পর বিদ্রূপের সহিত ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। ইহা বড়ই অনুশোচনার বিষয়। অবশ্য যিনি গাহিতেছেন তাঁহার কোন দোষ নাই, তিনি সে কথাটির প্রকৃত অর্থ বুঝেন না বা উচ্চারণ জানেন না বা ইহাও হইতে পারে যে এমন উর্দু বা হিন্দী কথা আছে যাহা বাঙালীর মুখে ঠিকভাবে উচ্চারণ হয় না। যাহা হউক একথা খুব সত্য যে মাতৃভাষা যেভাবে উচ্চারণ করা যাইতে পারে, পর-ভাষা সে ভাবে কখনই পারা যায় না। আরও দেখিয়াছি যে কোন এক নামজাদা বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞকে জাতীয় ভাষায় খেয়াল গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন। এই যেমন একটি সাহেব যদি বাংলা উচ্চারণ করেন তাঁহার কথা শুনিয়া অনেক সময় হাসিয়া থাকি। আবার সাহেবরাও অনেক বাঙালীর মুখে অনেক সময় ইংরেজী কথা শুনিয়া হাসেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে মাতৃভাষা আয়ত্ত বা উপলব্ধি করা সহজ, পর-ভাষা উপলব্ধি করা তত সহজ নয়। যাহা হউক, খেয়াল গানের ভিতর আমি এই অভাবটি বেশ উপলব্ধি করিতেছি। এই খেয়াল গান যদি আমাদের বাংলা ভাষায় রচিত হইত তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় এ দুর্দশা আজ হইত না। আমরা সকলেই গানের প্রত্যেকটি কথা ও তাহার অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতাম, এবং তজ্জন্য সে গানটিকে যতদূর সম্ভব উন্নত স্তরে গাহিতে সক্ষম হইতাম। গানের প্রতি শব্দের অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করিয়া গাহিলে যতদূর ভাবানুগত রসের বিস্তার করা যায়, উহার অর্থ না জানিয়া গাহিলে কখনই তাহাতে সাফল্য লাভ করা যায় না। এই কারণে আমার মনে হয়, বাংলা ভাষায় রচিত খেয়াল গান যদি বাঙালী মহোদয়গণ প্রত্যেকে আরম্ভ করেন তাহা হইলে অবিলম্বে এই খেয়াল গানে তাঁহারা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং বাঙলা দেশের সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—'তাঁহারা যেন বাংলা ভাষার খেয়াল গানের প্রচলন দ্বারা ভবিষ্যতে বাঙলা দেশে যাহাতে এই (বাংলা) খেয়ালের উৎকর্ষ লাভ হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন।...'

এই পর্যন্ত সঙ্গীতজ্ঞ শীল মশায়ের কথা। এখন সেই গল্পটির সূত্রে ফেরা যাক।

হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ির সেই আসর যখন হয়েছিল, তখন তিনি নন্দ দীঘলের কাছে সেতার শিখতেন।

সে সময় একদিন তিনি বাড়িতে বসে সেতার বাজাচ্ছেন, এমন সময় শিবকুমার ঠাকুর একজন পশ্চিমা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জলসাঘরে এলেন।

হরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতিবেশী এবং পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শিবকুমার ঠাকুর হলেন রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নিজেও সেতার-বাদক। সঙ্গে যাকে এনেছিলেন, হরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—এঁর নাম কৌকব খাঁ। অতি গুণী। সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন। এখন কলকাতাতেই থাকবেন।

হরেন্দ্রকৃষ্ণেরও পরিচয় দিলেন খাঁ সাহেবকে।

সে হল ১৯০৭ সালের কথা। শৌরীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের উদ্‌যোগে ওস্তাদ কৌকব খাঁকে তার কিছুদিন আগে কলকাতায় আনা হয়েছে। কাশী কিংবা এলাহাবাদ থেকে তিনি এসেছেন যতীন্দ্রমোহনের আমন্ত্রণে।

ভারতবর্ষে সরদ বাদনের অন্যতম প্রবর্তক, খ্যাতনামা গুণী নিয়ামৎউল্লা খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আসাদ্ উল্লা খাঁ—কৌকব খাঁ নামে পরিচিত। সরদে বালক বয়স থেকে পিতার তালিম পেয়েছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করামৎ উল্লারও। আসরে কৌকব খাঁ সরদের চেয়ে ব্যাঞ্জো বেশী বাজান। সেতারের চর্চাও ভালভাবে করেছেন। তালিমও দিতে পারেন সেতারে।

তাঁকে যখন হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়িতে শিবকুমার নিয়ে আসেন, তার আগেই তিনি (শিবকুমার ঠাকুর) খাঁ সাহেবের কাছে সেতার শিখতে আরম্ভ করেছেন।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ির অনুকূল্যে কৌকব খাঁ আসেন কলিকাতায়। সেজন্য তাঁদের বাড়ি থেকেই তাঁকে কলিকাতায় সঙ্গীতপ্রেমী ধনী সমাজে পরিচিত করে পৃষ্ঠপোষকতার চেষ্টা করা হয়। শিবকুমারও তাই তাঁকে এনেছিলেন হরেন্দ্রকৃষ্ণের কাছে। তাঁদের বন্ধুস্থানীয় এই শীল-পরিবারের যে রকম সঙ্গীতপ্রেম ও পৃষ্ঠপোষকতা, তার ওপর হরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজে সেতারের চর্চায় যেমন আগ্রহী, তাতে খাঁ সাহেব এখানকার আনুকূল্য লাভ করতে পারলে তাঁর পেশার পক্ষে ভালই হবে।

আগেই বলা হয়েছে, শিবকুমার যখন কৌকব খাঁকে সঙ্গে নিয়ে হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়িতে আসেন, তখন তিনি সেতার বাজাচ্ছিলেন জলসাঘরে।

পরস্পর আলাপ-পরিচয়ের কথার মধ্যে তাঁর সেতার বাজনা থেমে গিয়েছিল।

প্রাথমিক পরিচয়াদির পর কৌকব খাঁ হরেন্দ্রকৃষ্ণকে বাজনা বন্ধ না রেখে পুনরায় বাজাতে অনুরোধ করলেন, শিষ্টাচার বশতই হয়ত। বললেন—আপনি বাজান যা বাজাচ্ছিলেন, একটু শুনি। বাজনা চলুক না।

তিনি বাজাচ্ছিলেন তিলক কামোদ। খাঁ সাহেবের কথায় আবার তার আলাপচারি করতে লাগলেন। বিশিষ্ট শ্রোতার জন্যে বাজালেন খানিকক্ষণ।

বাজনা শেষ হবার পর নেহাত কথাপ্রসঙ্গে তিনি খাঁ সাহেবকে এই তিলক কামোদ কেমন লাগল, সে কথা জিজ্ঞেস করলেন। নিজের প্রশংসা শোনবার জন্যে নয়, পশ্চিমের গুণী অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করবার জন্যেই জানতে চাইলেন তাঁর মতামত।

কৌকব খাঁ কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না। নিরীহ ভাষায় মারাত্মক শ্লেষ প্রকাশ করে বললেন—বাজনা আপনার বেশ। তবে এ রকম তিলক কামোদ বাড়িতে বসে বন্ধু-বান্ধবদের শোনানই ভাল। বাইরের আসরে সকলকে শোনাবার মতন নয়।

হরেন্দ্রকৃষ্ণের তখন যুবক বয়স। মনে বিলক্ষণ আহত এবং আশ্চর্যও হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন? এ তিলক কামোদের কি হয়েছে?

—রাগে ভুল আছে।

—কি ভুল?

—উদারা গ্রামে ওরকম কাজ হবে না।

উদারায় কোন্ স্বরের কি প্রয়োগ-বিধি নিয়ে খাঁ সাহেব ভুল দেখিয়েছিলেন, তার বিবরণ সঠিক জানা যায়নি। তবে ওই উদারায় কি একটা ত্রুটির কথা বলেছিলেন।

প্রথম দিন তর্কটা ওই পর্যন্তই রইল। তাঁরা দু'জন বিদায় নিলেন খানিক পরেই। হরেন্দ্রকৃষ্ণ কিন্তু কথাটা ভুলতে পারলেন না। মনের মধ্যে বিঁধতে লাগল মাঝে মাঝেই।

তখন তিনি নন্দ দীঘলের কাছে নিয়মিত শিখতেন এবং তিলক কামোদের এই আলাপচারি তাঁরই কাছে পাওয়া। গুরুর ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বিশ্বাস দুই-ই

ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে এ বিষয়ে জানাতে সঙ্কোচ হল, কিন্তু না জানানোও ঠিক মনে হ'ল না তাঁর। শেষে দীঘল মশায়কে কৌকব খাঁর মন্তব্যের কথা জানালেন।

নন্দ দীঘল শুনে বললেন—আমার তিলক কামোদে কোনো ভুল নেই।

তাঁর এই কথা তখন হরেন্দ্রকৃষ্ণ লোক মারফৎ জানিয়ে দিলেন কৌকব খাঁকে।

খাঁ সাহেব উত্তরে জানালেন যে, এই তিলক কামোদে গলদ আছে। তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রকাশ্য আসরে আর পাঁচজন ওস্তাদের সামনে পরীক্ষা দিতে পারেন, যদি প্রয়োজন হয়। তিনি সে রকম কোনো আসরে আহ্বান জানাচ্ছেন শীল মহাশয়ের গুরুকে। সকলের সামনেই বিচার হয়ে যাক কার কথা ঠিক।

হরেন্দ্রকৃষ্ণ কৌকব খাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা দীঘল মশায়কে বলে জিজ্ঞেস করলেন—এ রকম একটা আসর কি তা হলে করব? আপনি তাতে রাজি আছেন তো?

নন্দ দীঘল সম্মত হলেন এবং জানালেন আসরের বন্দোবস্ত করতে। সে আসরে তিনি বাজাতে প্রস্তুত আছেন।

তারপর স্থির হল, বাঙলার বাইরে থেকে কোন বড় ওস্তাদ যন্ত্রীকে নিয়ে আসা হবে। তিনি এই বিচারআসরে উপস্থিত থেকে সকলের মতামত নিয়ে সাব্যস্ত করবেন এদের তিলক কামোদের ঠিক-বেঠিকের কথা।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং সঙ্গীত মহলে সন্ধান নিয়ে হরেন্দ্রকৃষ্ণ এক সুরবাহার-বাদক ওস্তাদকে আনবার ব্যবস্থা করবেন। তিনি এ আসরে বাজাবেনও। মুজরো এক রাতের অনুষ্ঠানের জন্যে এক হাজার টাকা। তা ছাড়া সদলে তাঁর যাতায়াতের খরচপত্র।

সে সুরবাহারী ওস্তাদের নামটি কিন্তু জানা যায়নি। তিনি তখন নাকি হায়দরাবাদের দরবারে অবস্থান করছিলেন, সেখান থেকেই তাঁকে কলকাতায় হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়িতে বিশেষ করে আনা হয় এই জলসার জন্যে। তার আগে তিনি বোধ হয় কলকাতায় আসেননি। বহু-মান্য গুণী যন্ত্রী শুনে হরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁকে নেতৃত্ব করতে দেন এই বিতর্কের আসরে।

হায়দরাবাদ থেকে তিনি এসে পৌঁছতে কৌকব খাঁ এবং নন্দ দীঘলকে জানিয়ে আসরের দিন স্থির করা হল। দোতলার সেই প্রকাণ্ড জলসাঘরে

সেদিন সন্ধ্যার পর আসর বসল, তিলক কামোদের বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে।

নন্দ দীঘল ও কৌকব খাঁ শুধু নন, কলকাতার আরও কয়েকজন নামী গুণী আসরে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লছমীপ্রসাদ মিশ্র, বিশ্বনাথ রাও প্রভৃতি। হায়দরাবাদ থেকে আগত ওস্তাদের সঙ্গে এলেন তাঁর পুত্র ও ক'জন সহচর। গায়ক বাদক শিল্পী এবং শ্রোতাদের নিয়ে আসর পূর্ণ হয়ে গেল। অনেকেই কৌতূহলী হলেন নন্দ দীঘল ও কৌকব খাঁ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখবার জন্য।

কি ভাবে ব্যাপারটি আরম্ভ ও অগ্রসর হয় এবং বহিরাগত এই প্রবীণ ওস্তাদ কি ভাবে বচসার নিষ্পত্তি করেন তা দেখতে শ্রোতাদের মধ্যে রীতিমত ব্যগ্রতা জাগল। আসর আরম্ভ হওয়ার জন্যে আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন সকলে।

ওস্তাদজী তাঁর সুরবাহার যন্ত্রও নিয়ে এসেছিলেন অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে। আসরের উদ্দেশ্য তাঁর ভাল রকমই জানা ছিল এবং এও তিনি বুঝলেন যে এ ধরনের আসরে বাক-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পরিণতি ঘটতে পারে। অন্তত সঙ্গীতের একান্ত ও শান্তিময় পরিবেশ আর থাকবে না। প্রতিযোগীদের বাজনা আরম্ভ হলে এবং তারপরে তাঁর নিজের মেজাজও আসবে না বাজাতে।

সুতরাং তিনি বললেন যে, তিনি আগে বাজিয়ে নেবেন। শেষে হবে দুই বাদকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁকে সমর্থন জানালেন।

বাজনা আরম্ভ করবার আগে ওস্তাদজী বেশ সপ্রতিভ ভাবেই তাঁর নিজস্ব প্রস্তুতি-পর্বটি সারলেন। এমন প্রকাশ্য আসরে এত অপরিচিত লোকের সামনেও তিনি বেশ খানিকটা পান করে নিলেন অম্লান বদনে। একটি রুপোর পাত্রে পুত্র যোগান দিলে তিনি প্রায় এক নিঃশ্বাসে উদরসাৎ করে ফেললেন। ব্যাপারটি অভিনব বোধ হল অনেকের কাছেই—এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন পরস্পর।

তারপর ওস্তাদজী খোস মেজাজে যন্ত্র নিয়ে বসলেন। যন্ত্র বেঁধে নিয়ে তখনই কিন্তু বাজনা আরম্ভ করলেন না, বরং দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আর একটি।

তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশে একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন। তার মর্মার্থ হল—এখন আমি একটি রাগ আলাপ করব, যা শুনে আপনাদের মধ্যে

একটি বিশেষ ভাব দেখা দেবে। তা আমি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখতে চাই। সে ভাবটি কি, তা আমি সকলের সামনে এখন বলে দিলে মজা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যে বুজরুকি করছি না তা জানাবার জন্যে আমি একটি কাগজে কিছু লিখে রাখব। তাতে লেখা থাকবে, আমার বাজনার সুর শুনে আপনাদের মধ্যে যে রকমের ভাব হবে তার কথা। আপনারা পরে মিলিয়ে দেখবেন, সত্যি বলেছি কি না।

এই বলে তিনি এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিলেন এবং তাতে কি লিখে উপুড় করে কার্পেটের ওপরে রাখলেন। কাগজটির ওপর চাপা দিয়ে দিলেন সেই রুপোর পাত্রটা। তারপর সুরবাহারে ঝঙ্কার তুলে তাঁর রাগালাপ আরম্ভ করলেন।

আসরের সকলেই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন একটি নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশায়। শ্রোতাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সুরের প্রভাব ঠিক কেমন হবে তা এমন করে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রাখবার কথা তাঁরা আগে কখনো শোনেননি। ব্যাপারটির জন্যে সকলেরই মন আকৃষ্ট হল ওস্তাদজীর দিকে। তিনি কি বাজান, কোন্ পদ্ধতিতে রাগের রূপ দেখান জানবার জন্যে শ্রোতারা একাগ্র হলেন।

ওস্তাদজী বাজাতে আরম্ভ করলেন—'বাঙাল' রাগ।

রাত প্রথম প্রহরই তখন শেষ হয়নি, অথচ তিনি বাঙাল ধরলেন দেখে অভিজ্ঞ শ্রোতারা আশ্চর্য বোধ করলেন। কারণ এ রাগের সময় ধরা হয় সকালবেলা। দিনের অ সার প্রথম প্রহরেই বাঙালের অনুষ্ঠান প্রচলিত।

প্রভাতের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে যে রাগের আবেদন স্বীকৃত আছে তা রাত্রে কেন ওস্তাদজী বাজাতে লা:লেন তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। তিনি যে রাগের কাল বিষয়ে অনভিজ্ঞ তা কি সম্ভব ?

কেউ কেউ ভাবলেন, বাঙলা দেশে এসে বাজাচ্ছেন সেজন্যেই হয়ত বাঙাল নির্বাচন করেছেন, রাতের আসরের কথা অত বিবেচনা করেননি।

তারপর ওস্তাদজীর বাজনা যত অগ্রসর হতে লাগল, রাগের রূপ বিস্তার করে কোমল স্বরের প্রয়োগে তিনি আসর ভরে দিলেন সুরের ধারায়। রাগ সময়োচিত হয়েছে কি না, এ বিশ্লেষণ করবার স্পৃহা আর শ্রোতাদের রইল না।

সুরের একটি বিশেষ রকমের মাধুর্যে তাঁরা মুগ্ধ হতে লাগলেন, আবিষ্ট

হতে লাগলেন। এমন মধুর আবেশে মন ভরে উঠল সকলের, এমন গভীর আরাম বোধ করতে লাগলেন তাঁরা, যে চোখ বুজে আসতে লাগল তৃপ্তিতে। চোখে তন্দ্রার ঘোর দেখা গেল।

সুরের ঘোর থেকে ক্রমে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন অনেকেই। অনুমান হতে লাগল—কি স্নিগ্ধ হাওয়া ঘরের মধ্যে ঝিরঝির করে বইছে! যেন ভোরাই হাওয়া। মন-প্রাণ জুড়ানো, সকালবেলার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজ। অনেকেই আর চোখ খুলে রাখতে পারেন না, ঘুমের ঢুলুনি আসে। তন্দ্রা-বিজড়িত অর্ধচেতন মনের অতলে রিন্ রিন্ করে ধ্বনিত হতে থাকে ওস্তাদজীর সুরবাহারের নিক্কণ।

তারপর যখন তিনি বাজনা থামালেন, সকলে ক্রমে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সুরের প্রভাব তখনো একেবারে কাটেনি, তখনো আছে তন্দ্রার মতন আচ্ছন্নের ভাব।

ওস্তাদজী যন্ত্র নামিয়ে রেখে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের ঘুম এসেছিল কি? ভোরাই হাওয়া দিচ্ছে এমন মনে হয়েছে?

সত্যিই তো, দু'টির কোনটিই অস্বীকার করা যায় না। তন্দ্রার ঘোর এখনো অনুভব করছেন কেউ কেউ।

এবার ওস্তাদজী তাঁর লেখা চিরকুটখানি বার করে একজনের হাতে দিলেন। তিনি এবং তাঁর কাছ থেকে নিয়ে কৌতূহলী অনেকেই সবিস্ময়ে পড়লেন সেই লেখা—Slumber and morning breeze

ওস্তাদজীর সেই ইংরাজী লাইনটি দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে সাবাস দিতে লাগলেন।

একটি বিশেষ সুর শুনিয়ে ঘুমের ভাব সৃষ্টি করা, এতে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। তবে ভোরের হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করা যদি কেউ বিশ্বাস না করেন, তা হলে তাঁকে বলবার কথা এই যে, সে আসরে উপস্থিত এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও সেদিন অনেক শ্রোতার সঙ্গে বায়ু সেবনের মতন ওই অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলে তিনি জানান।

অনেক সময়ে magic কিংবা mesmerism-এর ফলে আরো গুরুতর সম্মোহন কিংবা মায়া সৃষ্ট হতে যখন জানা গেছে, তখন এটুকু অবিশ্বাস করবার কি আছে? তা ছাড়া সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং সুরের মোহিনী আকর্ষণ ও নানা প্রকার ভাব জাগাবার কিংবা বিষধর সাপ বশীভূত করবার

কথা যখন নতুন নয়, তখন এরকম একটি প্রভাবের দৃষ্টান্ত অবিশ্বাস্য হবে কেন?

ওস্তাদজীর বাজনার ধরনেরই আর একটি গল্প—এটিও সত্য ঘটনা, এবং বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া—এ প্রসঙ্গ বলে নিয়ে সে আসরের শেষকালের ব্যাপারটি বলা হবে।

এই রকমেরই আর একটি আসর হয়েছিল মধ্য প্রদেশের দাতিয়া রাজ্যে; সেও প্রায় ৬০ বছর আগেকার ঘটনা। ভারতবিখ্যাত খেয়াল-গুণী গোয়ালিয়রের হদ্দু খাঁর সুযোগ্য পুত্র রহমৎ খাঁ তখন দাতিয়া মহারাজের দরবারে কিছুদিন থেকে ছিলেন।

ওয়াকিবহাল মহলে জানা আছে যে, রহমৎ খাঁ অসামান্য প্রতিভাদীপ্ত গায়ক ছিলেন বটে কিন্তু মাথার রোগের জন্যে তাঁর সঙ্গীত-জীবন সার্থক পরিণতি লাভ করতে পারেনি। এ অসুখের মূলে অবশ্য তাঁর অতিরিক্ত নেশায় আসক্তি। তাঁর রোগের লক্ষণ যখন ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, গায়ক হিসেবে তখনই তাঁর রীতিমত নামডাক।

তারপর তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি মাঝে মাঝে দেখা দিত, অন্য সময় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতেন। অনেক সময়ে এমনও হয়েছে যে, অসংলগ্ন আচরণ করছেন কিংবা কথাবার্তা বল্‌ছেন, কিন্তু গানের আসরে বসলেই শিল্পীসত্তা প্রকাশ পেয়েছে। দেখা দিয়েছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেয়াল-গায়ক রহমৎ খাঁ। গানের পরেই আবার হয়ত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন। অতি দুঃখের বিষয় যে, শেষ জীবনে এই দ্বিতীয় সত্তাই প্রায় স্থায়ী হয়ে যায় এবং তিনি ক্রমেই বিদায় নেন সঙ্গীত-জগৎ থেকে।

এ ঘটনাটি হল তাঁর সঙ্গীত-জীবনের প্রথম দিকের কথা, যখন তিনি মাঝে মাঝে অসংলগ্ন ব্যবহার করতেন। তখন দাতিয়ায় থাকবার সময় একদিন সেখানকার রাজা তাঁকে বললেন—খাঁ সাহেব, একটা নতুনত্ব কিছু করুন।

রহমৎ খাঁ বললেন—আচ্ছা। কিন্তু মহারাজ, আসরটা একটা নতুন রকমের করে দিতে হবে। ঐ যে জলসা ঘরে আমি গাইব, ওর একধারে আমার জন্যে একটি মন্দির তৈরি করে দিন। তার মধ্যে আমি একলা বসে গাইব আর সবাই শুনবেন অন্য দিকে বসে। মন্দিরের বাইরে সকলে থাকবেন।

দাতিয়া-রাজ জানালেন—বেশ, তাই হবে।

পরের দিনই তিনি হুকুম দিলেন, রহমৎ খাঁর খেয়াল অনুযায়ী আসরের

একদিকে মন্দিরের মতন গড়ে দিতে। মন্দিরে একটিমাত্র এবং উঁচু বেদী থাকবে গায়কের বসবার জন্যে।

যথাসময়ে সেই অভিনব, ছোট্ট মন্দিরটি তৈরী হ'ল। তখন একদিন সন্ধ্যার পর রহমৎ খাঁর গানের আসর বসল সেখানে। গায়ক মন্দিরের মধ্যে সেই বেদীতে আলাদা আসনে বসলেন। অন্য সবাই মন্দিরের বাইরে—সামনে রাজা, তাঁর পিছনে পাত্র-মিত্র এবং অন্যান্য শ্রোতারা।

খাঁ সাহেব ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনিভাবে আসর সাজান হয়েছে অনেক খরচ করে। কোনদিকে কোন ত্রুটি নেই। নিজের বসবার জায়গাটি খাঁ সাহেবের ভারি পছন্দ হল। তারিফ করলেন মহারাজাকে।

তারপর মহা খুশি হয়ে বসন্ত রাগে গান আরম্ভ করলেন। হদ্দু হস্‌সু খাঁর ঘরের এই রত্ন ও অদ্বিতীয় গায়কের কণ্ঠে সেকালের (গোয়ালিয়রের সেই ধ্রুপদ-ভাঙা) ভারি চালের খেয়াল। রাগ রূপায়ণে ও তানকর্তবে তাঁর তুল্য প্রতিযোগী তখন সারা হিন্দুস্থানে বিরল। উপরন্তু তাঁর গানের মেজাজ সেদিন স্ফূর্তিলাভ করেছে গান করবার এই নতুন জায়গার বন্দোবস্ত দেখে। সুতরাং তাঁর শিল্পী-সত্তা মোহন রূপে আপনাকে প্রকাশ করতে লাগল। অতি হৃদয়স্পর্শী হল তাঁর বসন্ত রাগের রূপ-বিস্তার। শ্রোতারা সুরের আবেশে ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তন্দ্রা-বিজড়িত হলেন বসন্তের পুষ্পিত পরিবেশ সৃষ্টিতে।

গান শেষ হবার পরেই শ্রোতাদের চমক ভাঙ্গল। তন্দ্রার ঘোর কেটে যেতে তাঁরা দেখলেন—মন্দির-বেদী শূন্য। গায়ক নেই।

সুরের মায়ায় তাঁদের আচ্ছন্ন করে রেখে উদাসীন সবার অলক্ষ্যে কোথায় চলে গেছেন। শ্রোতাদের কানে মনে বসন্তের সুরের সুরভি পূর্ণ করে দিয়ে সেই মহান শিল্পী যেন তখনও আসরে বিরাজ করছেন অশরীরী হয়ে আর অপ্রকৃতিস্থ মানুষটি অন্তর্ধান করেছেন অকস্মাৎ।

ওদিকে হরেন্দ্রকৃষ্ণের জলসাঘরে সঙ্কট ঘনিয়ে এল। ওস্তাদজীর বাজনার প্রভাব আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিক মিলে যেতে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল আসরের সকলের মনে। শ্রোতারা একটি অনাস্বাদিত আনন্দ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তারপরই আরম্ভ হ'ল বহু-প্রতীক্ষিত সেই বিতর্কের সভা।

ওস্তাদজী এবার মামলা আরম্ভ করতে বললেন। তিনি প্রস্তুত হলেন

অশান্তি এবং তার নিষ্পত্তির জন্যে। কিন্তু শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়াবে তা তাঁর বা আসরের অন্য কারুরই কল্পনার অতীত ছিল।

কৌকব খাঁ তর্ক উঠিয়েছিলেন যে, নন্দ দীঘলের তিলক কামোদে উদারা গ্রামে ভুল আছে সুতরাং আসরে কথা হল যে, দীঘল মশায় এখানে সর্ব সমক্ষে তিলক কামোদ বাজাবেন, তারপর কৌকব খাঁ জানাবেন তার ত্রুটি কোথায়।

তখন ওস্তাদজী এবং অন্যান্য গুণীজন বিবেচনা করবেন, দু-জনের মধ্যে কার মত সঠিক।

এবার নন্দ দীঘলকে বাজাতে অনুরোধ করা হল। কৌকব খাঁ তাঁর সামনেই রইলেন, সময় বুঝে নিজের মতামত প্রকাশ করবার জন্যে। লছমী ওস্তাদ, বিশ্বনাথ রাও, হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতিও কাছাকাছি রয়েছেন। উৎসুক শ্রোতায় পরিপূর্ণ আসর।

নন্দ দীঘল যন্ত্র তুলে সবেমাত্র বাজাতে আরম্ভ করেছেন, কি করেননি, কারুর সঠিক তা লক্ষ্য হয়নি—তার পরই দেখা গেল, তিনি বাজাতে অসম্মতি জানাচ্ছেন।

ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে না পেরে ওস্তাদজী তাঁকে বাজনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তবুও রাজি হলেন না দীঘল মশায়। তখন আসরের আরও কেউ কেউ তাঁকে বাজাতে বললেন, শোনা গেল। কিন্তু তিনি কারুর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

তাঁকে যেন কেমন অসুস্থ দেখাতে লাগল। তিনি ঘর্মাক্ত হতে লাগলেন বসে বসে। শ্রোতাদের অনেকেই পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন—ব্যাপার কি?

তিনি শুধু ঘামতে লাগলেন না, একটু পরেই কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। এবারে উদ্বিগ্ন হলেন উদ্‌যোক্তার কেউ কেউ তাঁকে বাতাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ঘাম বন্ধ হল না, কমলও না। সেই সঙ্গে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

আসরের সবাই দেখলেন—নন্দ দীঘল দুচোখ বুজে রয়েছেন এবং অত্যন্ত পীড়িত দেখাচ্ছে তাঁকে।

তখন তাঁকে ধরাধরি করে পাশের একটি ঘরে নিরিবিলিতে নিয়ে যাওয়া হল। আসরে সোরগোল পড়ে গেল।

পাশের ঘরে খানিকক্ষণ সেবা-যত্ন করেও সুস্থ হলেন না দেখে, তাঁকে গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। বাড়িতে ফিরে যাবার একদিনের

মধ্যেই মৃত্যু হল নন্দ দীঘলের। অনেক চিকিৎসাতেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই জমাট আসরও একেবারে মাটি হয়ে যায়, সে কথা বলা বাহুল্য।

এই অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু বড়ই শোচনীয় ব্যাপার।

অনেকেরই মনে হতে পারে, এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বিদ্যার পরিচয় দিতে ভীত হয়ে পড়েন তিনি এবং তারই ফলে মৃত্যু। খানিকটা ভালভাবে বাজাবার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর রাগ-জ্ঞান সম্বন্ধে এমন অপযশের কথা কেউ-ই ভাবতে পারত না। কারণ, আসরে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের সময়ে আরও কয়েকজন গুণী শিল্পীর মৃত্যু ঘটে গেছে কলকাতাতেই, এই ঘটনার আগে এবং পরেও। ('সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে তেমন ক'টি দুর্ঘটনার কথা দেওয়া আছে)।

তবে নন্দ দীঘলের মৃত্যুর কারণ নিয়ে জোর করে কোন মতামত দেওয়া যায় না। থ্রম্বসিস জাতীয় রোগে তিনি গত হতে পারেন এবং বাজাবার আগে থেকেই তার অদৃশ্য আক্রমণ তাঁর দেহে ক্রিয়া করতে পারে। তার জন্য অসুস্থ বোধ করে তিনি বাজাতে অসম্মত হন হয়ত। তাঁর যদি আত্মবিশ্বাস না থাকত, তাহলে তিনি কৌকব খাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আসরে বাজাতেই আসতেন না।

'প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ' বইয়ের উদ্ধৃতি থেকে দেখা গেছে যে, তিলক কামোদের জন্যে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। কৌকব খাঁ যে তাঁর রূপায়ণে কিছু ত্রুটি দেখেছিলেন তা বেদবাক্য কিংবা সত্যের শেষ কথা মনে করবারও কারণ নেই। কোন একটি রাগ নিয়ে দুটি ভিন্ন ঘরের শিল্পীর মধ্যে প্রচণ্ড মতানৈক্য নতুন কথা নয়। ওস্তাদদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের এ নিয়ে শেষ নেই।

সেকালে তা আরও বিকট ভাবে ছিল। তার ওপর, কৌকব খাঁ উচ্চাঙ্গের শিল্পী হলেও জাতে পাঠান এবং সঙ্গীত ব্যবসায়ী। যোদ্ধা-সুলভ একটা সংগ্রামী মনোভাব তাঁর ছিল এবং বাংলা দেশের সঙ্গীতক্ষেত্রে পেশাদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সুরের লড়াইও তিনি অনেক করেছেন।

এক্ষেত্রেও কাজ করতে পারে তাঁর সেই মনোভাব। মহা ধনী হরেন্দ্রকৃষ্ণের এই শিক্ষককে পর্যুদস্ত করতে পারলে তাঁর শিষ্যকে লাভ করা যেতে পারে। (দীঘল মশায়ের মৃত্যুতে হরেন্দ্রকৃষ্ণ কৌকব খাঁর শিষ্য হয়েছিলেন)। তা ছাড়া, তিলক কামোদ এমন কিছু একটা কূট বা ভারি রাগ নয় (দেশ, বেহাগ

ও কামোদের সংমিশ্রণে তিলক কামোদ গঠিত) যে, নন্দ দীঘল তার মধ্যে একটা বড় রকমের গলদ করবেন। সুতরাং ওদিক থেকে জোর করে বলা যায় না তাঁর বিরুদ্ধে।

তিনি হয়ত এতলোকের সামনে বিদ্যার পরীক্ষা দিতে দারুণ অপমানিত বোধ করতে পারেন। সেই মর্মপীডনের ফলেও ঘটতে পারে হৃদ-যন্ত্রের বৈকল্য এবং মৃত্যু। কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।

কৌকব খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করামৎউল্লা খাঁ পরবর্তী কালে একবার রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামীর নট কামোদকে জনান্তিকে ভুল বলে মন্তব্য করেছিলেন। তার পর একটি প্রকাশ্য আসরে অন্যান্য গুণীজনের সামনে বিচারে প্রমাণ হয়ে যায় যে, কোন ত্রুটি ছিল না গোঁসাইজীর নট কামোদ রূপায়ণে। পশ্চিমের ওস্তাদরা অনেক সময়ে বাঙলা দেশে অহেতুক অহমিকা প্রকাশ করে গেছেন। কৌকব খাঁর ব্যবহারও এক্ষেত্রে সেরকম কিছু ছিল না এমন কথা কেউ বলতে পারেন না নিশ্চিত করে।

নন্দবাবুর আর একটি দিনের বিবরণ এখানে পূর্বোক্ত 'প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ' বইখানি থেকে উদ্ধৃত করা হবে। যদিও সঙ্গীতের সঙ্গে বা তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সঙ্গে বিষয়টির আপাত কোন সম্বন্ধ নেই, তবু অন্তর্গূঢ় কোন সম্পর্ক আছে কি না পাঠক-পাঠিকারা বিচার করতে পারেন ইচ্ছা মতন।

মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা বিধাতার অস্তিত্বে অনেক সময় সন্দেহ জাগে, সংসারে দুরাত্মাদের নির্ভয়ে পাপকর্ম করে যেতে দেখে। কিন্তু 'ভগবানের চাবুক' কথাটির কোন তাৎপর্য আছে কি না কিংবা এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায় কি না পাঠক-পাঠিকারা বিবেচনা করে দেখবেন। উদ্ধৃতি—

"দীঘল মশাইয়ের কথা আরও একটু আছে এখানে। এতটা শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন তিনি আমাদের, শেষে অর্থাৎ উপরের ঘটনার বোধ হয় মাসখানেক পরে এক বিকালে এমন একটি ব্যাপার চোখে পড়লো যার ফলে আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বিপরীত দিকে টলে পড়লো। আমরা তাঁর বাড়ির সামনে, পার্কের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় এক বিকালে চু-কপাটি খেলা দেখছিলাম; দেখি একখানা পালকী হাম হাম করে এসে নামলো সেইখানে যেখানে ছেলেরা খেলায় মশগুল। আমরা সরে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে বেরিয়ে এলেন একটি মহিলা, চওড়া কালাপেড়ে ধোপদোরস্ত কাপড়, গহনাগাঁটি পরা। উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী, বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে দীঘল

মশাইয়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন—তখন একটা চাকর বেরিয়ে আসছিল তাঁর বাড়ি থেকে, সে দেখেই খবর দিতে গেল ভেতরে। অল্পক্ষণেই দীঘল মশাই এলেন বেরিয়ে—বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, নিকাল যাও ইহাঁসে। মহিলাটি বললেন, 'কেন? আমি কি করেছি—আমায় এমন করে পায়ে ঠেলে চলে এসেছ?' 'কোন কথা শুনতে চাই না, খবরদার বলছি, চলে যাও এখান থেকে, না হলে চাবুক মেরে তাড়াবো' বলে দীঘল হাতে সঙ্কেত করলেন চলে যেতে। উত্তরে সেই মহিলা বললেন, 'মারো না মারো, তোমার হাতে চাবুক খেয়েই যাবো।' আশ্চর্য, দীঘল মশাই মিথ্যা ভয় দেখাতেই যে ঐ কথাটা বলেননি,—সবাই, আমরা অবাক বিস্ময়ে কতকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম। আমাদের তিনি মানুষ বলেই গণ্য করলেন না। 'চাবুক লাও', হুকুম করতেই কোচমান চাবুক নিয়ে এসে হাজির করলে, আর তিনি সপাসপ চালাতে আরম্ভ করলেন ঐ মহিলার গায়ে, পিঠে, সর্বাঙ্গে—'বেরোও, এখান থেকে', এই বলতে বলতে। মেয়েটি—সেই চাবুকের প্রত্যেক আঘাত পেয়ে চমকে চমকে উঠতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'মারো, মারো, আরও মারো।' ভয়ে, বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমরা দেখলাম শেষ পর্যন্ত দীঘল মশাই ক্লান্ত হয়ে চাবুকটা ছুড়ে ফেলে নিজের বাড়িতে গিয়ে বসলেন আর সেই মহিলাও উঠলেন। এ দৃশ্য আজও ভুলতে পারি না। এতগুলি চাবুকের আঘাত মেয়েটি সহ্য ক'রে শেষে চোখের জলে, 'আচ্ছা চললাম, তুমি ভাল থাকো', এই বলে চলে গেল।"

এই নৃশংস ঘটনাটির পূর্ব-বৃত্তান্ত অর্থাৎ মহিলার সঙ্গে নন্দবাবুর সম্পর্ক কি, তা জানা যায়নি। আন্দাজ করা যেতে পারে (সেকালে যেমন অনেক ঘটত) মহিলাটিকে হয়ত কুল থেকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে দিব্য গৃহস্থ সংসারী সেজে বাস করতেন সমাজের মধ্যে। তবে এই দৃশ্যে নন্দ দীঘলের পাষণ্ড, বর্বর চরিত্র নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অসহায় নারীর প্রতি এই অমানুষিক লাঞ্ছনা, এই চাবুক ন্যায়ের দণ্ডে তোল হয়ে পরে অপরাধীকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিল। ভগবানের অদৃশ্য চাবুক চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল সেদিনকার আসরে।

কৌকব খাঁ এবং তিলক কামোদের সেই বিরাট আসর উপলক্ষ্য মাত্র।

॥ সঙ্গীতের দীপশিখা ॥

রাগ, রসুই ঔর পাগড়ি,
কভি কভি বন্ যায়।

রাগের গান, রান্নার তার আর পেঁচদার পাগড়ি কখনো কখনো বেশ উৎরে যায়। আবার কখনো ঠিক তেমনটি হয় না। বিশেষ রাগসঙ্গীত। কারণ এখানে আছে শিল্পীর প্রাণের অনুভবের প্রশ্ন। সে এক সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর মনের জগৎ। সেই মেজাজের ওপর গানের নির্ভর অনেকখানি। উপকরণ হয়ত সব ঠিক আছে, ব্যাকরণ নিখুঁত, তবু গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল না। কারণ সেই মেজাজের তারতম্য।

আর একটি কথা আছে। নটের জীবনে যেমন নাট্যমঞ্চ, সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনে তেমনি আসর। এই পাদপ্রদীপের সামনে যিনি প্রতিভার পরিচয় দেবেন, তিনিই গণনীয় হবেন বর্তমান কালে আর স্মরণীয় থাকবেন ভবিষ্যতে। চক্রীদের ষড়যন্ত্রে কিংবা ভাগ্য-দোষে যিনি এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁর সঙ্গীত-জীবন নিষ্প্রদীপ। বৃহত্তর সঙ্গীত-সমাজ তাঁর কথা জানবে না। তাঁর গুণপনার কথা এসে পৌঁছবে না পরের যুগের সঙ্গীতজ্ঞ মহলে।

সেকালের সঙ্গীত-জগতে একথা কত সত্য ছিল তা' এখনকার রেডিও, রেকর্ড, সঙ্গীত-সম্মেলন ইত্যাদি সুবিধার যুগে ঠিক ধারণা করা কঠিন। তখনকার কোন গায়ক বা বাদককে যদি এক জায়গায় আসর থেকে অপসারণ করা যেত তাহলে সেখানে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে পড়ত, তা তিনি যত বড় প্রতিভাধরই হোন। কারণ তাঁর প্রতিভা প্রচারের আর দ্বিতীয় মাধ্যম ছিল না। গুণের পরিচয় দেবার একমাত্র মঞ্চ সেকালের আসর। আর সে আসরের পরিধি যেমন সীমায়িত, সংখ্যাও তেমনি মুষ্টিমেয়।

ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ছিল বলে প্রতিযোগিতাও এক এক সময় হত। কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উপলক্ষ্য করে নিষ্ঠুর চক্রান্ত।

সে আসরটির কথা মনে হলে সেকালের সঙ্গীত জগতের ওইসব কথাও মনে আসে।

এ আসরটি আর এক দিক থেকে অসাধারণ। অন্য এক রকমের বিয়োগান্তক।...

শেঠ দুলিচাঁদের দমদমার বাগানবাড়ি। সেখানকার নিয়মিত আসরের মধ্যে এও একটি। তবে অন্যান্য আসরের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মতন নয় এর কাহিনী। দোষে গুণে এই জল্‌সা সেকালের দস্তুরমত প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সেযুগের হৃদয়হীন দলাদলি ও অসামান্য গুণপনার যুগপৎ দৃষ্টান্তস্থল। এ আসর থেকে একজন মহৎ গুণী স্বদেশের সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে দেশান্তরী হয়ে যান।

দুলিচাঁদের বাড়ির এই আসর প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা।...

জল্‌সার দুই নায়ক। জগদ্দীপ মিশ্র ও মৌজুদ্দিন খাঁ। বলা যায়, নায়ক ও প্রতি-নায়ক। এক কাহিনীর দুজনের নায়কত্ব মানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর তার ফল দুজনের জীবনে একেবারে বিপরীত রকমে ফলে যায়।

ঘটনাটা বল্‌বার আগে, যে বাড়িতে সে আসর বসেছিল, দুলিচাঁদের সেই বাড়িটার কথাও বলা দরকার। এমন সাজানো আসর সেকালেও বেশি ছিল না। বিলাসী দুলিচাঁদ আর তারাবাঈ-এর কথাও জানবার আছে। এ কাহিনীর সঙ্গে দুলিচাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনিই ছিলেন মিশ্রজীর সব চেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর বাড়ির জলসায় জগদ্দীপের গান বেশি হত। আর সেখানেই হয়েছিল তাঁর শেষ আসর। দুলিচাঁদের জলসায় জগদ্দীপের গান যদি তখন না হত, তা হলে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের ওই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতে পারত না।

আর সে ব্যাপারে কিছু নৈতিক দায়িত্বও ছিল দুলিচাঁদের। শুধু তাঁর বাড়ির আসর বলেই নয়। বিবেক এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নও ছিল। অবশ্য এ প্রশ্ন দিয়ে যেমন সংসারের তেমনি আসরের সব সমস্যার বিচার-বিবেচনা হয় না। দল বা গোষ্ঠীর এক একটা চক্রে হৈ হৈ করে এক একটা কাণ্ড ঘটে যায় আর সবাই বা বেশির ভাগ লোক মেনে নেয় ব্যাপারটা।

কিন্তু তবু মনে হয়, দুলিচাঁদ যদি মেরুদণ্ডহীন না হয়ে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হতেন, তা হলে হয়ত এমনটা হতে পারত না। প্রচুর অর্থব্যয়ে সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে তিনি মান্যগণ্য ছিলেন তখনকার কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে। বহু গুণীই তাঁর কাছে উপকৃত।

তিনি একটা ন্যায্য কথা যদি জোর দিয়ে সে সময়ে বিবাদমান দলকে

জানাতে পারতেন, তাঁদের পক্ষে অমান্য করা সম্ভব হত না। কিংবা তাঁরা তাঁর মধ্যস্থতা অস্বীকার করলেও, জগদ্দীপের মনের গ্লানি অন্তত দূর করতে পারতেন। তাঁকে সঙ্গীত-জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারতেন তিনি।

এত বড় একজন শিল্পীর অকালে সঙ্গীত-জীবন থেকে এক রকম অবসর নেওয়া বন্ধ করা যেত দুলিচাঁদ দৃঢ়চিত্ত হলে। কিন্তু সেসব ঘটনা বর্ণনা করবার আগে তাঁর বিলাস-জীবনের কথা কিছু জানাবার আছে।

জাতিতে মাড়োয়ারি। কিন্তু কলকাতাকেই দেশঘর করে নিয়েছিলেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। রুজি-রোজগার সবই এখানে।

সেকালের এক আদর্শ 'কাপ্তেন' ছিলেন দুলিচাঁদ। সঙ্গীত-প্রেমী, মহা শখ্‌দার, ভোগী এবং মুক্ত-হস্ত।

তাঁর স্বজাতীয় বণিককুলের মধ্যে দু' শ্রেণীর দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। অর্থগৃধ্নু এবং অপরিমিত ব্যয়ী। শেষোক্তরা তুলনায় সংখ্যাল্প। দু' শ্রেণীরই অর্থোপার্জনে দক্ষতা থাকলেও ফল হয় ভিন্ন প্রকারের। দুলিচাঁদ শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন।

পাটের কারবার ছিল। তাতে যেমন প্রচুর আয় করতেন, ব্যয়ও তেমনি। সেই খরচের একটি বড় খাত হ'ল—সঙ্গীতক্ষেত্র। তা ছাড়া, ভোগ ও শখের আরও নানা উপকরণ ছিল।

দমদমা অঞ্চলে দমদম রোডের ধারে বাগান-ঘেরা প্রকাণ্ড তাঁর বাড়ি। সুসজ্জিত অট্টালিকা। তার সর্বাঙ্গে গৃহস্বামীর স্বচ্ছলতার প্রকাশ।

তাঁর বাগান বা বাড়ির অন্যান্য অংশের বর্ণনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এ অধ্যায়ের প্রধান ঘটনার সঙ্গে কিংবা জগদ্দীপের আসরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে শুধু জলসা-ঘরটির। এখানেই তিনি অনেক আসর মাৎ করেছিলেন আর এখানকার আসরে শেষ গেয়েই সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে একরকম অবসর নিয়ে চলে যান।

বাড়ির দোতলায় দুলিচাঁদের সেই গান-বাজনার প্রকাণ্ড হল। সে জলসাঘরে ঢোকবার আগে, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে প্রশস্ত অলিন্দ পার হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায় অনভ্যস্ত শ্রোতারা। সামনেই দুলিচাঁদের শখ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক রূপকথার গাছটি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। গাছের সঙ্গে আরও নানা সরঞ্জাম।

গোলাপ জলের একটি নাতি-বৃহৎ ফোয়ারা। তারই অঝোর ধারায় নীচে আলোর ঝিকিমিকির মধ্যে স্বপ্ন-জগতের সেই কল্পতরুটির অপূর্ব শোভা।

তরুর কাণ্ড, শাখা সবই রুপোর তৈরী। রুপোলি ডাল থেকে ঝুলে আছে সোনার ফুল। ফলগুলি মণি মুক্তা জহরতের। সেই ধাতব কাণ্ড শাখা-ফুল-ফল জল-চূর্ণের প্রতিফলিত আলোয় ঝলমল করছে। এক অপরূপ বর্ণ আর সুবাসের পরিবেশ।

অতি সুগন্ধী বাষ্পে ভরে উঠেছে গোলাপ জলের ফোয়ারা। নিমন্ত্রিতেরা সেখান দিয়ে জলসাঘরে যাবার সময় সেই সুমিষ্ট গোলাপ-জলে রুমাল ভিজিয়ে নিচ্ছেন। শরীর মন পুলকিত হয়ে উঠছে সেই পরম রমণীয়তায়।

তেমনি মনোরম জলসাঘর দুলিচাঁদের। মেঝে জুড়ে দামী কার্পেট। দেয়ালে দেয়ালে প্রকাণ্ড আয়না, ছবি, দেয়ালগিরি। ঘরের মাঝখানে ছাদ থেকে ঝোলানো আলোর ঝাড়। অতিথিদের জন্যে রুপোর পাত্রে মশ্‌লাদার পান। আতরদান, গোলাপ-পাশ। ফুলেল আতরের আমোদ-করা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এক একজনের আতর নেবার সময়। গান বাজনা কিংবা নাচ আরম্ভ হবার আগে থেকেই যেন ঘরে মাদকতার স্পর্শ জাগে।

আর তাঁর জলসাও হত উঁচুদরের। প্রতি শনিবার নিয়মিত। সেকালের হিসেবে দরাজ দক্ষিণার ব্যবস্থায় বড় বড় ওস্তাদ ও বাঈজীদের সঙ্গীতে আসর মুখর হয়ে থাকত গভীর রাত পর্যন্ত।

গায়ক-বাদকদের দুলিচাঁদ মুজ্‌রো দিতেন, যেমন তাঁদের সঙ্গে কথা হয়ে থাকে। অনেক সময় তার সঙ্গে উপরন্তু উপহার থাকত পাগড়ি কিংবা দোপাট্টা।

কিন্তু বাঈজীদের বেলা আলাদা বন্দোবস্ত। তাঁদের তিনি নিজস্ব ধরনে দক্ষিণা দিতেন। নির্দিষ্ট মুজ্‌রো ভিন্ন আরও একটি বিশেষ উপহার।

তাঁর একটি থলিতে অনেক রকমের আংটি রাখা থাকত। কম দামী, ঝুটো মুক্তো আর অন্যান্য পাথরের থেকে আরম্ভ করে আসল মুক্তো, বহুমূল্য হীরের আংটিও।

যে বাঈজীর নৃত্যগীত বেশি ভাল লাগত, তাঁর সামনে দুলিচাঁদ সেই থলির মুখ খুলে দিয়ে আংটি সব ঢেলে দিতেন। বলতেন—বেছে নাও যে আংটি তোমার পছন্দ।

বাঈজী বখশিস-স্বরূপ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতন একটি আংটি তার

থেকে নিতেন।

এও ছিল দুলিচাঁদের এক প্রিয় শখ।

প্রতি শনিবারের আসর ছাড়া অন্য এক এক দিনও কলাবতদের আসর বসত তাঁর জলসাঘরে। মুজরো দিয়ে যাঁদের আনতেন, তাঁরা ছাড়া তাঁর বাড়িতে নিয়মিত বরাদ্দে অন্য ওস্তাদও নিযুক্ত থাকতেন। তাঁদের অনুষ্ঠানও হত মাঝে মাঝে।

ঠুংরির স্বনামধন্য ওস্তাদ গণপৎ রাওকে তিনি অনুগত শিষ্যের মতন সেবা যত্ন করতেন, ওস্তাদজী কলকাতায় এলে। দুলিচাঁদ নিজে সঙ্গীতচর্চা না করলেও নিয়মিত সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর দিন কাটত এবং গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব)-কে তিনি গুরুর মতন মান্য করতেন।

তারাবাঈ নামে একটি গায়িকা নিয়ে দুলিচাঁদ দমদমার সেই বাড়িতে বাস করতেন। তারাবাঈয়ের রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত রাখতেন উচ্চশ্রেণীর ওস্তাদ। তারাবাঈ ভাল গায়িকা। কিন্তু তাঁর গান আসরের সকলের জন্যে নয়। তারাবাঈ-এর গায়িকা ভগিনী তখন হায়দরাবাদ নিবাসিনী। একই পেশা দুজনের।

তারাবাঈকে গান শেখাবার সূত্রেই দুলিচাঁদের এই বাড়িতে এসে বাস করেছিলেন বিখ্যাত গুণী বাদল খাঁ! এখানে আসবার অনেক বছর আগে খাঁ সাহেব নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারে নিযুক্ত থেকে প্রথম কলকাতায় অবস্থান করেন। কিন্তু সেবারে তাঁর কলকাতা বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুকাল পরেই ফিরে গিয়েছিলেন পশ্চিমে।

এবারে দুলিচাঁদের আমন্ত্রণে যখন তাঁর বাড়িতে নিযুক্ত হয়ে এলেন তখন খাঁ সাহেবের বয়স প্রায় ৮০ বছর। এ যাত্রায় জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত, ২০ বছরেরও বেশি কলকাতায় রইলেন। দুলিচাঁদের বাড়ি বরাবর নয়, প্রথম ক'বছর মাত্র। কিন্তু দুলিচাঁদের জন্যেই বাদল খাঁর এবারকার কলকাতা বাস আরম্ভ হয়।

দুলিচাঁদবাবুর দমদমার সেই বাগানবাড়ি হস্তান্তরিত হয়ে তাঁর জলসার আলো যখন নিভে যায় তখন বাদল খাঁকে লাভ করে উপকৃত হয় কলকাতা তথা বাঙলার সঙ্গীত-সমাজ। এবং এখানকার কয়েকজন প্রতিভাবান্ ও নেতৃস্থানীয় গায়ক তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন, যদিও অন্য গুণীর শিক্ষা তাঁরা আগেও পেয়েছিলেন। যথা—গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ

দত্ত, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জমিরুদ্দিন খাঁ, শচীন্দ্রনাথ দাস ও আরও অনেকে। সেসব অন্য প্রসঙ্গ।

দুলিচাঁদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। এত ভোগ বিলাসের মধ্যে বাস করেও তাঁর মনে একটা নিরাসক্তির ভাবও ছিল। এত সাধের আসর সমেত অট্টালিকাটির শেষরক্ষা করতে পারেননি তিনি। সবই বিপরীত স্রোতে ভেসে যায়। প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু মন ভাঙেনি আদৌ।

তাই দেখা যায়, কিছুদিন পরে সেই বাগানবাড়ির নতুন মালিক যখন তাঁকে আবার সেখানকারই আসরে নিমন্ত্রণ করেন, দুলিচাঁদ অন্যান্য শ্রোতাদের মধ্যে বসে গান শুনছেন সেই জলসাঘরে। মনে তিলমাত্র বিকার নেই। যেন পরিবর্তন কিছুই হয়নি। অনেকটা হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের মতন মোহমুক্ত মন বলা যায়। এসব অবশ্য আমাদের মূল প্রসঙ্গের অনেক পরের কথা।

জগদ্দীপ মিশ্রের আসর যখন' সেখানে হত, তখন তার মালিক ছিলেন দুলিচাঁদ এবং তখন তাঁর খুব ধূমধামের অবস্থা।

প্রতি শনিবারের বাঁধা আসর। তা ছাড়া অন্য দিনেও মাঝে মাঝে জলসা বসে। বাড়িতে নিযুক্ত কোনো গুণী কিংবা পশ্চিমাগত কোনো কলাবত যোগ দেন সে আসরে। গোলাপ জলের ফোয়ারায় আলো-ঝলমল রুপোর গাছ, সোনার ফুল, মণি মুক্তার ফলের সামনেকায় জলসাঘর সুর, ছন্দে মুখর হয়ে ওঠে।

সেসব আসরে তখন জগদ্দীপ মিশ্রের প্রতিভার দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে নিত্য নতুন করে। গুণবান ও রূপবান শিল্পী জগদ্দীপ সেসময় দুলিচাঁদের আসরে মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছেন। দুলিচাঁদই তখন কলকাতায় তাঁর শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠ-পোষক।

সঙ্গীতকেন্দ্র বারাণসীর এক অনন্য সঙ্গীত-প্রতিভা জগদ্দীপ। তখনকার সঙ্গীত-জগতের প্রোজ্জ্বল দীপশিখা। সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালকে আলোকে উদ্‌ভাসিত করে শ্রুতিস্মৃতির রাজ্যেও অনির্বাণ থাকবার মতন দীপ্তি তাঁর প্রতিভায় ছিল।

অথচ তাঁর নাম আজ সুরের জগতে প্রায় বিস্মৃত বলা যায়। আসরের শ্রোতৃ সাধারণের কাছে সে নাম একেবারে অপরিচিত। বিগত যুগের নানা প্রতিভাবানের পরিচয়-কথা কিংবা অন্তত তাঁদের নামগুলি স্মরণের সরণি বেয়ে এখানকার সঙ্গীত-সমাজে এসে পৌঁচেছে।

কিন্তু এত বড় এবং এমন বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা—যা তাঁর সমসাময়িক কালের উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিল—তাঁর নামটি পর্যন্ত বহন করে আনতে পারেনি এযুগের আসরে।

তাঁর স্মৃতি লুপ্ত হবার কারণ আগেই ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পাদ-প্রদীপের সামনে থেকে, মুগ্ধ শ্রোতাদের আসর থেকে তাঁর অকাল-বিদায়। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সময়েই তিনি আলোকিত মঞ্চ থেকে অবসর নিয়ে যান। এবং তাঁর নাম পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায় মহাকালের অন্ধকারে।

অথচ ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নাম মনে রেখে দেবার মতন। যে সময়ে তাঁর সঙ্গীত-জীবন—উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রথম দশক, তখন উত্তর ভারতে বহু প্রতিভাশালী গায়কের আবির্ভাব হয়েছিল। বলতে গেলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এত প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-প্রতিভা ভারতবর্ষ লাভ করেছিল তার তুলনা এদেশের অন্য কোন ঐতিহাসিক-কালে বেশি পাওয়া যায় না। তবু সেই সৃষ্টি-প্রাচুর্যের কালেও জগদ্দীপ মিশ্র ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গুণী। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এই স্বীকৃতি তাঁর প্রতিপক্ষের কাছেও পাওয়া যায়। সুতরাং ধারণা করা যেতে পারে কি অনন্য প্রতিভার আধার তিনি ছিলেন।

সে যুগে এবং অন্য সময়েও এমন শিল্পীর দর্শন কদাচিৎ পাওয়া গেছে, যিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি কণ্ঠসঙ্গীতের এই চার অঙ্গেই পারদর্শী। ভারতীয় সঙ্গীতের বিস্তার ও গভীরতা এত বেশী যে এ ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভা দুর্লভ দেখা যায়। রাগসঙ্গীতের প্রত্যেক অঙ্গ এমন বিশিষ্ট এবং এমন একান্ত সাধনা সাপেক্ষ যে প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর গুণীরাই এক একটি অঙ্গে বিশেষজ্ঞ, খুব বেশী তো দু'টি অঙ্গে—খেয়াল ও ঠুংরিতে। চারটি অঙ্গের জন্যে গীতশিল্পীদের আলাদা রকমের মেজাজ, এমন কি সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। সেজন্যে অনেকে বিভিন্ন অঙ্গের চর্চা ঘরে করলেও বা ছাত্রদের শিক্ষা দিলেও আসরে প্রদর্শন করতে অভ্যস্ত নন। অন্তত খেয়াল ঠুংরির চেয়ে বেশি নয়।

কিন্তু জগদ্দীপ মিশ্র এই দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যে, আসরে ওই চারটির যে কোন অঙ্গে গানের ফরমায়েশ হত, কিংবা যে ধরনের আসরে গানের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হতেন—পরিবেশন করতেন অনুরূপ প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত। চার অঙ্গেই তাঁর রীতিমত সাধনা ছিল, অশিক্ষিত-পটুত্ব নয়। উপরন্তু সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সহজাত সংস্কার তাঁর সঙ্গীত-সত্তার মূলে ছিল।

প্রতিভা, পরিবেশ ও সাধনকৃতির সুবর্ণ ফল বারাণসীর জগদ্দীপ মিশ্র। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কয়েকজন ভারতের শীর্ষস্থানীয় গুণীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

কাশীর বিখ্যাত প্রসদ্দু মনোহর (মনোহর ও হরিপ্রসাদ মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গীত-সাধনার জন্যে কীর্তিত) ঘরানার (মিশ্র ঘরানা) রামকুমার ও তাঁর পুত্র লছমী ওস্তাদ এবং সুপরিচিত বেতিয়া ঘরানার শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন জগদ্দীপের আত্মীয়।

প্রথম জীবনে তিনি বারাণসীতেই বাস করেন। যতদূর জানা যায়, তাঁর সঙ্গীতশিক্ষাও অনেকখানি সেইখানে। কিন্তু সঠিক জানা যায়নি কোন্ কোন্ কলাবতের অধীনে তিনি বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করেন।

শুধু একথা জানা যায় যে, তিনি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন। আগেই সমাপ্ত হয়েছিল সাধনার পর্ব।

কলকাতায় যখন আসেন তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত গুণী। শিক্ষার পাকা ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গীত-জীবন গঠিত। ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরি—চার অঙ্গেই রীতিমত পারদর্শী। উপরন্তু নৃত্যবিদ্। কথক নৃত্যের কলা-কৌশল ও ভাব প্রদর্শনেরও (ভাও বাংলানা) শিল্পী। আসরে নৃত্য পরিবেশন করেন না বটে, কিন্তু নৃত্য-বিদ্যা নিপুণভাবে শিক্ষা দিতে পারেন। অনুরাগীদের অনুরোধে মুখ-চোখ ও ভ্রূবিলাস সমন্বয়ে অপরূপ ভাও বাংলান ঘরোয়াভাবে। নৃত্য-শিল্পের দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এমনিভাবে পরিচয় দেন তৌর্যত্রিক বিষয়ে নিজের শিল্পী মানসের।

সব মিলিয়ে জগদ্দীপ মিশ্র এক দুর্লভ সঙ্গীত-প্রতিভা। গানের আসরে শ্রোতারা শুধু তাঁর পটুত্বে মুগ্ধ হতেন না, তাঁর সুকণ্ঠেও আকৃষ্ট হতেন। খুব ভাল আওয়াজ ছিল জগদ্দীপের গলার।

ঈষৎ খর্বাকৃতি হলেও তিনি সুপুরুষ ছিলেন। অতি শৌখীন পশ্চিমা পোশাকে শোভমান। পাগড়ি ও বেশ-ভূষার পরিপাট্যে নয়নদর্শন, রূপবান। গৌরবর্ণ, দীর্ঘায়ত চক্ষু, সংযুক্ত বঙ্কিম ভ্রূ-যুগল। দৃষ্টিতে শিল্পী-প্রাণের স্বপ্নময়তা।...

গায়করূপে একজন যথার্থ শিল্পী মিশ্রজী। মনে-প্রাণে শিল্পী। স্পর্শকাতর, অভিমানী, শান্তিপ্রিয়। নির্বিরোধী এবং নিরাবিল পরিবেশে সঙ্গীত-চর্চায় অভিলাষী। দঙ্গল বা দলাদলিতে তাঁর মর্ম বিদীর্ণ হয়। সযত্নে পরিহার

করে চলেন কলহ-বিবাদের সমস্ত সম্ভাবনা।

কলকাতায় পদার্পণের আগে কিছুকাল নেপাল দরবারে ছিলেন। গুণী হিসেবে বিশেষ সম্মান ও সমাদর পান সেখানে।

এই শতকের একেবারে প্রথমে সেখানকার বিখ্যাত বগ্ড়ির জলসায় তিনি গান গেয়েছিলেন। সেই বগড়ির জলসায় যাঁরা অংশ নেন তাঁরা সকলেই তখন ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। জগদ্দীপের বয়স তখন বোধহয় পঁচিশও হয়নি, তবু সেখানে শ্রেষ্ঠ কলাবতদের পাশে বসে অসাধারণ গুণপনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

কিন্তু বেশিদিন তখন নেপালে থাকেননি। সেখান থেকে কলকাতার বিরাটতর সঙ্গীতক্ষেত্রে চলে আসেন। কলকাতায় তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, সে কারণেও তাঁর এখানে আসা হতে পারে। কিংবা এখানকার ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রতিভার অধিকতর স্ফূর্তি লাভের আশায় আসতে পারেন কলকাতায়।

কলকাতা তখনও ভারতের রাজধানী। রাষ্ট্রীয়ভাবে শুধু নয়, সঙ্গীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিষয়েও। সঙ্গীতের এত আসর এবং এত অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ভারতবর্ষের অন্য অনেক সঙ্গীত-কেন্দ্রেই দেখা যায়নি। তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমা গুণীদের আগমন ঘটতে থাকে এখানে। আজও এই ক্রিয়ার ধারা রুদ্ধ হয়নি, যদিও কলকাতা থেকে ষাট বছর যাবৎ রাজধানী স্থানান্তরিত।

এই শতকের প্রথম দিকেও এখানে পশ্চিমাঞ্চলের কলাবতদের অনেককে স্থায়ীভাবে বাস করতে দেখা গেছে। আত্মীয়দের পরামর্শে জগদ্দীপ মিশ্রের সে উদ্দেশ্যেও আগমন হতে পারে কলকাতা শহরে।

কলকাতায় এসে তিনি উত্তরাঞ্চলে বাস করতে লাগলেন। কলকাতার মধ্যে এইদিকেই তখনও সঙ্গীত-চর্চা বেশি আর পশ্চিমা গুণীদের বাস। এই ধারা উনিশ শতক থেকেই চলে এসেছে।

কলকাতায় জগদ্দীপ মিশ্র কতদিন ছিলেন, তা জানা যায় না। তবে খুব বেশিদিন নয়, মনে হয়। কারণ তাঁর শিষ্য গঠন বিশেষ হয়নি এখানে। শুধু সুপ্রসিদ্ধ যাদুমণি তাঁর শিক্ষা পান একথা উল্লেখ করা হয়েছে 'ছন্দ হারা' অধ্যায়ে। কিন্তু কতদিনের জন্যে, তা জানা যায়নি।...

যাই হোক, এ কাহিনীর সূত্রে তখন তিনি প্রধান আকর্ষণ হয়ে রয়েছেন

শেঠ দুলিচাঁদের দমদমার বাড়ির আসরে। বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। প্রতিভার পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। নিবাস জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বলরাম দে স্ট্রীটের বাসাবাড়িতে, মিশ্র বংশীয় আত্মীয়দের সঙ্গে।

শুধু দুলিচাঁদের আসরে নয়, কলকাতার সঙ্গীত-সমাজেও জগদ্দীপ তখন এক দুর্লভ প্রতিভা বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এমন সময় বারাণসীরই আর এক প্রতিভার গায়ক উপস্থিত হলেন কলকাতার পেশাদার সঙ্গীতক্ষেত্রে।

তিনি সেকালের সঙ্গীত-জগতের আর একটি বিস্ময়। নাম মৌজুদ্দীন। খেয়াল ও ঠুংরি গায়ক। অসামান্য কণ্ঠসম্পদের অধিকারী এবং শ্রুতিধর প্রতিভা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মৌজুদ্দীনের সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। সঙ্গীত-রসিক ও সঙ্গীত-তাত্ত্বিক অমিয়নাথ সান্যাল মশায় মৌজুদ্দীনকে রোমান্টিক-রূপে চিত্রিত করে রেখেছেন 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থে।

এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকারা চমৎকৃত হয়ে জেনেছেন যে, মৌজুদ্দীনের প্রতিভা ছিল অলৌকিক এবং তিনি বিনা সাধনায় খেয়াল গানে এমন তান-কৃতিত্ব প্রদর্শন করতেন, সমসাময়িককালে সমগ্র হিন্দুস্থানে যার তুলনা ছিল না। বইটি থেকে তাঁরা মৌজুদ্দীনের পরমাশ্চর্য পরিচয় এইভাবে পেয়েছেন—'সে না জানে রাগ কাকে বলে, না জানে তাল, অথচ রাগ ও তালে গান করে। মাত্র একবার শুনেই গোটা গান আয়ত্ত করে ফেলে।··· মৌজুদ্দীন রেখব গান্ধার জানে না। ওকে কখনও সার্গম করতে শুনবে না।··· এখন ও যা গায়, সেগুলি সমস্তই শুনে শেখা গোটা গান ওর অদ্ভুত স্মৃতি থেকে টেনে বার করা; কসরৎ করে শেখা নয়; কোনও কসরৎ ও কখনও করে নি।'...

মৌজুদ্দীনের প্রতিভার উক্ত সংবাদে হয়ত কেউ কেউ স্তম্ভিত বোধ করেছেন। বিশেষ যাঁরা খেয়াল সঙ্গীতের গায়ক-গায়িকা। কারণ বিনা কসরতে ও শুনে শেখা গোটা গান যা মৌজুদ্দীন তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি থেকে টেনে বার করে আসর মাৎ করতেন সেসব কোন সাদা-মাঠা বাঁধা গান নয়। নব নবোন্মেষশালী, সৃষ্টিমুখর, অভাবিত তান বিস্তার অলঙ্কারাদির সুনিপুণ সৌন্দর্যে ভরা খেয়ালরীতির রাগ- সঙ্গীত।

এ হেন মৌজুদ্দীন—যিনি না-সাধা সুর, না-শেখা গান গেয়ে প্রত্যেক আসর মাৎ করতেন, যে-কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর গান শুনে তাঁর পরেই

সেই গানটি সে আসরে বহুগুণ ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে দৈবী-শক্তির পরিচয় দিতেন, যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গায়ক আর কেউ ছিলেন না—যখন কলকাতায় এলেন, তাঁর আমন্ত্রণ হল ছুলিচাঁদের দমদমার বাগানবাড়িতে।

কলকাতায় আগত নতুন পশ্চিমা কলাবতের গুণপনার কথা শোনবার ফলে যে এই আসর বসেছিল, তা হয়ত নয়। কারণ মৌজুদ্দীন তার আগে কলকাতায় আসেননি। মৌজুদ্দীন গণপৎ রাও-এর গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার এবং ছুলিচাঁদ গণপৎ রাও-এর সেবক বলে এই যোগাযোগ ঘটে থাকতে পারে। কারণ গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব) সে সময় কলকাতায় এসেছিলেন।

ছুলিচাঁদের জলসাঘরে প্রথম যেদিন মৌজুদ্দীন এলেন, জগ্‌দীপও সেদিন আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁদের দু'জনেরই গাইবার কথা হয় সে আসরে। অনুধাবন করলে সন্দেহ হয়, তাঁদের দু'জনের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে মজা উপভোগ করা কিংবা মৌজুদ্দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা মৌজুদ্দীনের পক্ষীয়দের তরফ থেকে হতে পারে। কারণ, ছুলিচাঁদবাবুর জলসাঘর কলকাতায় আগত পশ্চিমা গুণীদের একটি বহুবিখ্যাত আসর এবং তাঁদের নাম-প্রচারের একটি বড় মঞ্চ। এখানকার জয়-পরাজয়ের ওপর কলাবতদের কলকাতার সমাজে সঙ্গীত-ব্যবসায় অনেকখানি নির্ভর করে। সুনাম যেমন মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়, বদনাম রটে তার চেয়ে বেশি।

এসব কথা সেকালের সঙ্গীতজগতে কিছু নতুন নয়। দশচক্রে একজনকে গাছে তোলা এবং আর একজনকে গাছ থেকে ফেলে দেওয়া আজকালকার তুলনায় সে যুগে অনেক সহজ ছিল। এখনকার হিসাবে প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্র তখন ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। জবরদস্ত দল পিছনে না থাকলে এবং শিল্পী নিরীহ, অভিমানী ও শান্তিপ্রিয় হলে অনেক সময়ে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত।

এ আসরের ঘটনাটিও তার এক দৃষ্টান্ত হতে পারে। এখন সেই সূত্রে ফেরা যাক। সে রাত্রের আসর বসেছে। জমজমাট আসর।

মৌজুদ্দীনের গুরু, গোয়ালিয়রে স্বনামধন্য গণপৎ রাও এবং আরও অনেকে সেদিন উপস্থিত হয়েছেন।

তাঁর মধ্যে একজন হলেন অতি তরুণ বাঙালী গায়ক অনাথনাথ বসু। তিনি তখন ছুলিচাঁদের বাড়ির আসরের অন্যতম শিল্পী এবং নিয়মিত তাঁর সেখানে যাতায়াত। শেঠ ছুলিচাঁদের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত থেকে অনাথবাবু

তারাবাঈকে কয়েকটি বাঙলা গানও শিখিয়েছেন। তাঁর কথা পরে বিশেষভাবে আসবে। এখন সেই আসরের কথা

প্রথমে গাইলেন জগদ্দীপ। মুরেঠা আদি দরবারি পোশাকে সুশোভন, দর্শন-সুন্দর শিল্পী। পরিশীলিত মোহন কণ্ঠ, রাগ রূপায়ণে সংসিদ্ধ, অন্তর থেকে উৎসারিত সঙ্গীতের অনুভব। এমন বিদ্যা, এমন সৌন্দর্যময় পরিবেশন, এমন নিজস্ব গায়কী যে আসর মাতিয়ে দেবে, সে আর বিচিত্র কি?

সে আসরের সুর-রসিকদের মনে জগদ্দীপ মিশ্র সঙ্গীতের একটি অনির্বাণ দীপশিখার তুল্য প্রতীয়মান হলেন।

এটি গেল সঙ্গীত-জগতের (এবং বাস্তব জীবনেরও) আলোকিত দিক। কিন্তু এর একটি ছায়া-পৃষ্ঠও আছে। সে অংশের সংবাদ এই যে, জগদ্দীপের গান শেষ হবার আগেই মৌজুদ্দীন অনেকেরই অলক্ষিতে সেদিন আসর থেকে উঠে আসেন—যাতে তাঁকে গাইতে না হয়। এত বড় স্বকীয় প্রতিভার সামনে গান গাইবার কথা সেদিন ভাবতে পারেননি মৌজুদ্দীন। আসর ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন।

তারপর তাঁর কলকাতার প্রধান আশ্রয়স্থল, গুরুভাই শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়িতে এসে তাঁকে এই ধরনের কথা বলেছিলেন যে, এ লোক (অর্থাৎ জগদ্দীপ) কলকাতায় থাকলে আমি এখানে টিকতে পারব না।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী শুধু গণপৎ রাওয়ের শিষ্য বলেই নয়, চরিত্রগুণে এবং সঙ্গীত-জগতের বিদগ্ধ ব্যক্তিরূপে তখনকার কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে বিশেষভাবে সম্মানিত। তাঁর গৃহ ছিল সঙ্গীতচর্চার একটি সুপরিচিত কেন্দ্র এবং বাঙলার ও বাঙলায় আগত পশ্চিমা গুণীদের অনেকেই তাঁর আসরে উপস্থিত হয়েছেন। ঢুলিচাঁদও বিশেষ খাতির করতেন শ্যামলালজীদের। গহরজান, মালকাজান প্রভৃতি কলকাতার শ্রেষ্ঠা বাঈজীরা ক্ষেত্রী মশায়ের গুরুর সুবাদে একই গোষ্ঠীভুক্তা এবং তাঁকে অতিশয় মান্য করে চলেন। সব মিলিয়ে সেকালের কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর বৃহৎ গোষ্ঠী ও বিপুল প্রভাব। এবং তিনিই এখানে গুরুভাই মৌজুদ্দীনের প্রতিভাকে সঙ্গীত সমাজে সুগোচর ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ঢুলিচাঁদের বাড়ির মাইফেলে আনেন।

মৌজুদ্দীন যে জগদ্দীপের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যাবেন এ অবস্থাকে মেনে নিতে পারলেন না শ্যামলাল ক্ষেত্রী। স্বভাবে তিনি উদারমনা এবং সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সেবক হলেও এ ক্ষেত্রে সঙ্গীতশিল্পের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব

দেখালেন না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও এমন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, মৌজুদ্দীনকে তোলবার জন্যে জগদ্দীপকে নামাবার চেষ্টা হয় শ্যামলাল ক্ষেত্রীর পক্ষ থেকে।

জগদ্দীপ ছিলেন নিতান্ত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। দলাদলিটা সেজন্যে একতরফাই হয়ে গেল।

এ বিষয়ে তাঁদের পক্ষীয় বিবরণ আছে অমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের 'স্মৃতির অতলে' গ্রন্থে। অন্য দিকের কথা জানবার আগে বইটি থেকে জগদ্দীপ-মৌজুদ্দীনের যুক্তপ্রসঙ্গ এখান উদ্ধৃত করা হ'ল (২৮-২৯ পৃষ্ঠা):

"বাবুজী (শ্যামলাল ক্ষেত্রী) বললেন,...তুমি ওকে আজ সকলের সামনে জিজ্ঞাসা কর, খাঁ সাহেব, তোমার গানের থেকেও ভাল গান শুনেছ কি না! তার পর বলব।"

সেইদিনই সন্ধ্যার বৈঠকে মৌজুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, খাঁ সাহেব! আপনার চেয়েও বড় গুণী আপনি দেখেছেন কি না, সত্য করে বলুন। আমরা তো জানি, আপনার উপরে আর কেউ নেই।

প্রশ্ন শুনেই মৌজুদ্দীনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাবুজী, তন্নূলালজীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "বাবুজী, জগদ্দীপ, জগদ্দীপ! আর কেউ নয়। আহা, হা, কি গানই করত। বাবুজীই বলুন, আমি ঠিক বলেছি কি না!"

জগদ্দীপের প্রসঙ্গ ওঠে। বাবুজী ও তন্নূলালজীর কথার সারাংশ উদ্ধার করে দিলাম।

জগদ্দীপ সহায়, মৌজুদ্দীনের থেকে কিছু বড়। বড় বড় আকর্ণবিস্তৃত দু'টি চোখ, গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, মধুর কণ্ঠ ও উন্নত শ্রেণীর শিক্ষিত পটুত্বই ছিল তার প্রতিষ্ঠার কারণ। ভাইয়া সাহেব ও মৌজুদ্দীনের সঙ্গে দুলিচাঁদজীর সংশ্রবের পূর্বে দুলীচাঁদজীই ছিলেন জগদ্দীপের পৃষ্ঠপোষক ও পালনকর্তা। জগদ্দীপের যশোলাভ ছিল না। সে ছিল অতি বিনয়ী; দঙ্গল বা রেষারেষি বুঝতে পারলেই সরে যেত সেখান থেকে।

ভাইয়া সাহেব ও শ্যামলালজী যখন মৌজুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় দুলিচাঁদের বাড়িতে প্রথম মাইফেল করলেন, তখন একই আসরে হয়েছিল জগদ্দীপ ও মৌজুদ্দীনের প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জগদ্দীপের মুখের নায়কী বিলাস বিভ্রম এবং ভাবাবেগপূর্ণ গায়কী মৌজুদ্দীনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে দিয়েছিল। সেই মাত্র একদিন হয়েছিল মৌজুদ্দীনের আত্মাবমাননা;

তার গান সেদিন জমেনি। কিন্তু এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ভাইয়া সাহেব এঁরা জগ্‌দীপের অনুকরণে নায়কী ও গায়কী দিয়ে মৌজুদ্দীনকে প্রস্তুত করে দিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের মাইফেলে জগ্‌দীপ ও মৌজুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেখা গেল, মৌজুদ্দীন জগ্‌দীপকে ছাড়িয়ে উঠেছেন—তারই অনুকরণ করে।

জগ্‌দীপ মলিনমুখে দুলিচাঁদের আসর থেকে বিদায় নিলেন, এবং কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন নেপালে তাঁর আত্মীয়ের কাছে। সেখান থেকে জগ্‌দীপ ব্যথিত হৃদদের অভিমানে ভরা একখানি চিঠি লিখেছিলেন শ্যামলালজীকে; লিখেছিলেন, "আপনারা আমাকে যে স্নেহ আদর করতেন তা আমি ভুলিনি। কিন্তু মৌজুদ্দীনের যশের কাঁটা হয়ে থাকব না। এক কলকাতায় জগ্‌দীপ ও মৌজুদ্দীন থাকতে পারে না। সে কারণেই আপনাদের মায়া কাটিয়ে এলাম।"

বাবুজী আক্ষেপ করে বলতেন, তিনি যদি জ্ঞাতসারে কোন পাপ করে থাকেন, তবে জগ্‌দীপের মনে কষ্ট দেওয়াই সেই একমাত্র পাপ। এই প্রায়শ্চিত্ত মাঝে মাঝে করতেন এক নিঃশ্বাসে মৌজুদ্দীন ও জগ্‌দীপকে স্মরণ করে; চোখের জলের দু-এক বিন্দু দিয়ে ধোয়া ঐ দুটি নাম উচ্চারণ করে।

মধ্যে থেকে মৌজুদ্দীনের মনে একটি আলাপনীয় প্রভাব রেখে গেল ঐ জগ্‌দীপ। সে একদিন বাবুজীকে বল্লে, "ঐ রকম চোখ, ঐ ভ্রূ যদি ভগবান আমাকে দিতেন, তা হলে আমি নিশ্চয়ই জগ্‌দীপের চেয়েও বড় হতে পারতাম। কি গানই করত জগ্‌দীপ! বাবুজী! ও রকম গান তো আর শুনলাম না। আচ্ছ বাবুজী, ওরকম চোখ, ভ্রূবিলাস নকল করা যায় না?"

বাবুজী আর কি বললেন। বললেন, 'তুমি চোখে টেনে টেনে সুরমা লাগাতে আরম্ভ কর। তা হলেই চোখ-মুখের সুরত খুলে যাবে। ওস্তাদের কাছে মুখ বিলাস শিখে নিতে পার না?

সেই থেকে মৌজুদ্দীনের সুরমা বাতিক আরম্ভ হল।"...

এই বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে—(১) মৌজুদ্দীন তাঁর চেয়ে জগদ্‌দীপকে বড় ও ভাল গায়ক বলে স্বীকার করতেন। (২) একই আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম দিন মৌজুদ্দীন জগ্‌দীপের প্রতিভার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যান। (৩) জগ্‌দীপের মনে আঘাত দিয়ে শ্যামলাল ক্ষেত্রী পাপ করেন, এই বোধ তাঁর পরে হয়েছিল। (৪) পরের দিনের আসরের জন্যে গণপৎ রাও ও শ্যামলাল

মৌজুদ্দীনকে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত করে দেন জগ্‌দীপেরই গায়কী অনুকরণ করে। (৫) জগ্‌দীপ অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং রেষারেষি বুঝতে পারলেই সেখান থেকে সরে যেতেন ; ইত্যাদি।

কিন্তু অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, মৌজুদ্দীন জগ্‌দীপকে ছাড়িয়ে উঠেছেন আর জগ্‌দীপ মলিন মুখে দুলিচাঁদের আসর থেকে বিদায় নিলেন—ব্যাপারটা ঠিক এইরকমই ঘটেনি।

মৌজুদ্দীনের জগ্‌দীপকে ছাড়িয়ে ওঠার কথাটা যথার্থ নয় এই হিসাবে যে, তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত হতে দেখে তাঁর মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি গান করতে পারেননি নিজের শক্তি অনুযায়ী। এই দেখে তিনি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন যে, আসর থেকে সঙ্গীতের অনুভব অন্তর্ধান করে দলাদলির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সামনের সারির অতি বিশিষ্ট শ্রোতারা বসে এমন বিরূপ ভাব প্রদর্শন করছেন যাতে অন্যান্য শ্রোতাদের জগ্‌দীপের গান সম্বন্ধে ধারণা লঘু হয়ে যাচ্ছে। গৃহস্বামী ব্যক্তিত্বহীন ও তরল প্রকৃতির বলে তাঁর স্বপক্ষে এবং এত বড় দলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না। তাঁর গানের প্রশংসা আসরের বিশিষ্ট গুণীরা একবারও করলেন না অথচ তাঁদের দলীয় গায়কের স্তুতিতে হলেন পঞ্চমুখ। এই বিসদৃশ অবস্থায় গানের মেজাজ একেবারে নষ্ট হয়ে যায় জগ্‌দীপের।

গুণ বা বিদ্যায় পরাস্ত হয়ে জগ্‌দীপ আসর থেকে মলিন মুখে বিদায় নেননি। তিনি বীতস্পৃহ হয়ে চলে আসেন এই কারণে যে, এখানে সঙ্গীতের চেয়ে দঙ্গল বড় ; এখানে সত্যকার গুণ ও বিদ্যার মর্যাদা নেই। শিল্পের যথার্থ আদর যেখানে নেই সেখানে তিনি মাত্র অর্থ উপার্জনের আশায় থাকবেন না। এই মনোভাব নিয়ে ত্যাগ করে যান শুধু দুলিচাঁদের আসর নয়—কলকাতাও।

উদ্‌ধৃত অংশে এবং আমাদের বিবরণীতে একটি পার্থক্য দেখা গেছে। সান্যাল মশায়, প্রধানত শ্যামলালজীর বিবৃতি অনুসারে জানিয়েছেন যে, জগ্‌দীপ ও মৌজুদ্দীনের প্রথম দিনের প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মৌজুদ্দীনের গান জমেনি এবং তাঁর আত্মাবমাননা ঘটেছিল সেই প্রথম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে মৌজুদ্দীন জগ্‌দীপকে পরাস্ত করেন।

কিন্তু অন্য সূত্রে শোনা যায় যে প্রথম দিন জগ্‌দীপের গান শুনে মৌজুদ্দীন আসর থেকে একেবারে চলে আসেন, গাইবার সাহস তাঁর হয়নি। পরের

দিন তাঁদের দু'জনের আসর এবং মৌজুদ্দীনের গান ভাল না হওয়া ইত্যাদি হয়ে থাকতে পারে। একই আসরে জগ্‌দীপ ও মৌজুদ্দীনের গান জমেছে বেশি, এমন ঘটনা একদিনের বেশি ঘটতে পারেনি। জগ্‌দীপের গান যদি আশানুরূপ ভাল কোনোদিন না হয়ে থাকে তা তাঁর কৃতিত্বের অভাবের জন্যে নয়, রেষা-রেষির সঙ্কীর্ণ পরিবেশ দেখে শিল্পী-সুলভ মেজাজ নষ্ট হওয়ার জন্যে। এবং সেই অভিজ্ঞতার পর দ্বিতীয় দিন আর সে আসরে গান করেননি এমন নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন তিনি। পর পর দু'টি আসরে মৌজুদ্দীন তাঁকে 'ছাড়িয়ে উঠবেন' এরকম গায়ক জগ্‌দীপ নন।

এই সব বিবরণ—যার কোন লিখিত প্রমাণ নেই—পাওয়া যায় বর্তমান বাঙলার অন্যতম প্রবীণ গুণীর কাছে। তিনি হলেন অনাথনাথ বসু, সুপরিচিত খেয়ালা-ঠুংরি গায়ক এবং তবলা-বাদকও। তিনি এই ঘটনার প্রধান পাত্র ক'জনকেই চাক্ষুষ করেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বয়োকনিষ্ঠ হলেও সমসাময়িক হিসেবে তাঁর মতামত এ ব্যাপারে গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ তিনি এই তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এবং এই বিতর্কিত আসরে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

দ্বৈত কণ্ঠের গানে অসামান্য গুণের জন্যে বাঙলার বুলবুল' নামে অভিহিত অনাথনাথ বসুর কিছু সাঙ্গীতিক পরিচয় 'অমৃতকণ্ঠ ধ্রুপদী' অধ্যায়ে পরে দেওয়া হবে।

বসু মশায় অতি তরুণ বয়সে সঙ্গীত-জীবন আরম্ভ করেছিলেন কলকাতায়। তখন থেকেই দুলিচাঁদের বাড়িতে ও জলসায় তাঁর যাতায়াত। শুধু শ্রোতা হিসেবে নয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু প্রতিশ্রুতিবান গায়করূপে সে মহলে সুপরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন।

জগ্‌দীপ ও মৌজুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে অনাথবাবু বলেন যে—গানের কোন বিষয়েই মৌজুদ্দীন জগ্‌দীপের চেয়ে বড় ছিলেন না। একজনের যদি হয় শুনে শুনে গাওয়া গান, আর একজনের রীতিমত শিক্ষা ও সাধনার ফলে অর্জন করা বিদ্যা। খেয়াল ইত্যাদি গানে এই দুয়ের তফাত অনেকখানি। পাঁচজনের কাছে শুনে শুনে তুলে নেওয়া গান গাইতে গেলে, গায়ক প্রতিভাধর হলেও, গানের স্ট্যাণ্ডার্ড কি করে থাকবে? এক এক দিন তা এক এক রকম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জগ্‌দীপের গান কিংবা গায়কীর বিষয়ে তেমন কথা কেউ কখনও বলেননি। মৌজুদ্দীন তাঁর গান শুনে প্রথম দিনেই

বুঝেছিলেন যে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবেন না কোনদিন। তিনি বলেন—হয় মৌজুদ্দীন থাকুক, না হয় আমি। দুজনের এখানে থাকা হতে পারে না। মৌজুদ্দীনকে তখন অপযশ থেকে বাঁচাবার জন্যে শ্যামলাল ক্ষেত্রীরা দল পাকিয়ে আসরে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেন যাতে জগদ্দীপের গান না জমে। তরল-স্বভাব আর ব্যক্তিত্ব-হীন দুলিচাঁদ দলহীন জগদ্দীপের হয়ে আঙুলটি পর্যন্ত তোলেননি। এইসব কাণ্ড দেখে জগদ্দীপের মন ছোট হয়ে যায়। গান-বাজনার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে, চক্রান্ত করলে যে-কোন শিল্পীর আসর নষ্ট করে দেওয়া যায়। তা ছাড়া কথাই আছে—রাগ, রসুই ঔর পাগড়ি, কভি কভি বন যায়। জগদ্দীপের গান যদি কোন একদিন এইসব রেষারেষির ব্যাপারের জন্যে না জমে থাকে, তা থেকে একথাই বলা চলে না যে মৌজুদ্দীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে তিনি চলে যান আসর থেকে। কিংবা মৌজুদ্দীন জগদ্দীপের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গায়ক।

জগদ্দীপ মৌজুদ্দীন সম্পর্কে বসু মশায়ের এই ধারণা ও মন্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট নয়। কারণ তিনি মৌজুদ্দীনের প্রতি বিদ্বিষ্ট কিংবা জগদ্দীপের সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বরং মৌজুদ্দীনের পক্ষে তাঁর সমর্থন থাকতে পারত। কারণ তিনি (অনাথবাবু) মৌজুদ্দীনের কাছে কিছুদিন ঠুংরি শিখেছিলেন মালকাজানের বাড়িতে। মৌজুদ্দীনকে তিনি তাঁর সাময়িক ওস্তাদ বলে মানেন এবং শিল্পীরূপে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু অপক্ষপাত বিচারে এবং জগদ্দীপের সঙ্গে তুলনায় বুঝতে পারেন মৌজুদ্দীনের কৃতিত্বের সীমাবদ্ধতা।

এইসব কারণে বসু মশায়কে এই বিতর্কের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ও নির্ভর-যোগ্য মনে করা যায়। আর তাঁর সুস্পষ্ট মত হোল—জগদ্দীপ মৌজুদ্দীনের চেয়ে বড় গায়ক বলেই মিশ্রজীকে চক্রান্ত করে সরিয়ে ফেলা হয় কলকাতার আসর থেকে।

যে নেপাল দরবারে জগদ্দীপ অতি মর্যাদার সঙ্গে আগে কয়েক বছর ছিলেন, এখন শান্তিতে বাস করবার জন্যে আবার সেখানে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু হিমালয়ের কোলে সেই সুদূর পার্বত্যরাজ্যে বাস করা আত্মগোপন করারই সামিল। বৃহত্তর সঙ্গীতজগৎ থেকে যেন স্বেচ্ছা-নির্বাসন। জগদ্দীপ মিশ্র নামে যে সেযুগে এতবড় এক গুণী ছিলেন সেকথা ক্রমে বিস্মৃত হয়ে গেল কলকাতা তথা উত্তর ভারতের সঙ্গীত-সমাজ। আর সেই বিশেষ যুগটির

শ্রুতি-স্মৃতির রেশ পরবর্তীকালে এইভাবে এল যে, সেকালের অদ্বিতীয় গায়ক-প্রতিভা ছিলেন মৌজুদ্দীন খাঁ।

॥ এক মধুকণ্ঠী ধ্রুপদী ॥

গঙ্গার ধারে রমণীয় নিকেতন। সুন্দর প্রশান্ত পরিবেশ। কেয়ারি করা ফুলবাগান। তার মধ্যে ছবির মতন বাড়ি। সামনে গঙ্গা। তার ওপারে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দৃশ্য।

ভাগিরথীর পশ্চিম ধারে, বালির বিবেকানন্দ সেতুর পাশেই সেই বাগান-বাড়ি। যখনকার কথা, তখন অবশ্য বালির এই বিরাট পুল তৈরি হয়নি। আরো শান্তিময় শ্যামলিমা ছিল সেখানে।

বালির গঙ্গাতীরে স্যার ওঙ্কারমল জেঠিয়ার সেই বাগানবাড়ি। পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা।

বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এ্যানড্রু ইউল কোম্পানীর অংশীদার স্যার ওঙ্কারমল।

সেই এ্যানড্রু ইউলের ইউল সাহেবকে খাতির জানিয়ে ওঙ্কারমল জেটিয়া গঙ্গার ধারের বাগান বাড়িটির নাম রাখেন ইউল ব্যাঙ্ক। এই নামেই সেকালের অনেকে স্যর ওঙ্কারমলের বাড়িকে জানতেন।

সেদিনকার ইউল ব্যাঙ্কে সেদিন বিরাট আসর।

সেদিন দোলের উৎসব। আর সেই উপলক্ষে বড় জলসার আয়োজন করেছেন ওঙ্কারমল। সারাদিন ধরে হোলির আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে গান-বাজনার মজলিস।

সকাল থেকেই উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। গানের আসরও বসেছে তখন থেকে। রাত প্রথম প্রহর পর্যন্ত চলবে।

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কম নয়। সকাল থেকেই তাঁদের আসা-যাওয়া চলেছে। সারাদিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্যে তাই অনেক খরচ করে আনা হয়েছে বেশ কয়েকজন গুণীকে। গানের যেন কোন সময় বিরতি না ঘটে।

একের পর এক তাঁদের গানের পালা চলেছে। শ্রোতাদের মধ্যে আছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। স্যার ওঙ্কারমলের ব্যবসায় জগতের নিমন্ত্রিত মাড়োয়ারি,

সাহেব-সুবো থেকে আরম্ভ করে নানা জাতির অতিথিবর্গ। বাঙালীও কিছু আছেন। কিন্তু সঙ্গীতের রসজ্ঞ ও বোদ্ধা শ্রোতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বেশির ভাগই ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক, তার মধ্যে কিছু আবার বিদেশী।

তবে প্রকাণ্ড আসর। কারণ বহু জনসমাগম হয়েছে এবং সঙ্গীত-শিল্পীও আছেন কয়েকজন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই হোরি, ঠুংরি ও গজল গানের শিল্পী।

এই ধরনের শ্রোতাদের মুখ চেয়েই বোধ হয় ভারি চালের গানের আয়োজন করা হয়নি। কোন ধ্রুপদী কিংবা খেয়াল গায়ক আমন্ত্রিত হয়ে আসেননি সে আসরে। যদিও সেকালে এ ধরনের আসরেও ধ্রুপদ গান বিলক্ষণ হত। সাধারণ সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতারাও ধ্রুপদের রস আস্বাদন করতেন বহু আসরে।

সেই পঞ্চান্ন বছর আগেও ধ্রুপদের গৌরবের যুগ শেষ হয়নি। কোন আসরে ধ্রুপদ অনুষ্ঠান না হলেই বরং ব্যতিক্রম মনে হত। অন্তত বেশির ভাগ আসরেই ধ্রুপদ পরিবেশন করার রেওযাজ ছিল অন্য রীতির গানের আগে।

এই আসরে যে ধ্রুপদের ব্যবস্থা করা হয়নি তেমন সেযুগে বড় একটি দেখা যেত না, শ্রোতারা যেমনই হন। এ জন্যেই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করতে হল।

যা হোক, সে আসরে সকাল থেকে গান-বাজনা হয়ে, তখন প্রায় বিকাল গড়িয়েছে। সমস্তই হোরি, ঠুংরি, গজল ইত্যাদি গান। আসরে উপস্থিত ছিলেন পাখোয়াজ-বাদক সন্ন্যাসীচরণ রায়। তিনি তখন তরুণ হলেও ভাল পাখোয়াজ বাজাতেন। দ৺ীবাবু নামে সুপরিচিত ধ্রুপদ-পাখোয়াজী সতীশচন্দ্র দত্তর তিনি পাখোয়াজে শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

সন্ন্যাসীবাবু এতক্ষণ আসরে থেকেও বাজাবার সুযোগ পাননি বলেই হোক কিংবা সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে ধ্রুপদ গানের পরিচয় দেবার জন্যেই হোক, উঠে এসে ওঙ্কারমলকে বললেন,—অনেক হোলি ঠুংরি হয়েছে। এবার একটু অন্য রকম গান হলে হয় না?

গৃহকর্তা জানতে চাইলেন, কি রকম গান? তারপর সম্মত হয়ে সন্ন্যাসী-বাবুর ওপরই ভার দিলেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্যে।

সন্ন্যাসীবাবু কলকাতা থেকে এক ধ্রুপদ-গায়ককে নিয়ে এলেন। তিনি খেয়ালও গাইতেন, কিন্তু প্রধানত ধ্রুপদী রূপেই তাঁর পরিচয় ছিল তখনকার

সঙ্গীত-সমাজে। নাম আশুতোষ রায়। পরবর্তীকালের সঙ্গীত-জগতে সে নাম বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কিন্তু সে কালের আসরের শ্রোতারা বিমুগ্ধ ছিলেন তাঁর অসামান্য কণ্ঠ-মাধুর্য ও গায়কীর জন্যে।

সে আসরে তিনি যখন এসে বসলেন, তাঁর দিকে বিশেষ কারুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল না। দর্শনে আকর্ষণ করবার মতন কিছু ছিল না তাঁর মধ্যে। বেশভূষায় দারিদ্র্য প্রকট। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে হলেও অপুষ্ট, শীর্ণ শরীর। অতি সাধারণ বাঙালী কাঠামো।

আসরে তখন গান গাইছিলেন মেটিয়াবুরুজের বিখ্যাত গায়ক পিয়ারা সাহেব। দাদ্‌রা, ঠুংরি, গজল ইত্যাদি গানের জন্যে সে যুগে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। পিয়ারা সাহেবের কয়েকটি গান গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি অবাঙালী হয়েও বাংলা গান মাঝে মাঝে শোনাতেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গান পর্যন্ত।

একবার স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত একটি বড় জলসায় পিয়ারা সাহেব রবীন্দ্রনাথের 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' গানখানি গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া যে সুরে গানটি শোনা যায়, সে সুরে গাননি পিয়ারা সাহেব। তিনি ঠুংরি করে গেয়েছিলেন। সেযুগে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বহির্ভূত গায়কদের পক্ষে নির্দিষ্ট সুরের খুব কড়াকড়ি ছিল না, দেখা যায়। অন্তত একাধিক গায়ক-গায়িকা রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গান রবীন্দ্র-নির্দেশিত সুরের এদিক ওদিক করে গেয়েছেন, কিন্তু কোন দিক থেকে তার প্রতিবাদ হয়নি একথা সুবিদিত। অধিক দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গীক, শুধু সুপ্রসিদ্ধা গহর জানের গাওয়া 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না, পথের শুকনো ধুলি যত' গানটির উল্লেখ করি। গায়িকা এই সুপরিচিত গানখানিতে সুরের শুধু হের-ফের করতেন না, প্রথম লাইনের শেষাংশের ভাষা পর্যন্ত বদলে ফেলতেন গাইবার সময়। কাজটি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এ সবের কোন প্রতিবাদ তখন করা হত না, এ এক আশ্চর্য এবং লক্ষণীয় ব্যাপার।

এখন সেকথা থাক। পিয়ারা সাহেবের গানের কথা যে হচ্ছিল সে প্রসঙ্গে একটি সংবাদ জানাবার আছে। তাঁর রেকর্ড থেকেও জানা যায় এবং তিনি সব আসরেই গাইতেন মিহি গলায়। ঈষৎ তীক্ষ্ণ হলেও 'নারীকণ্ঠে' পিয়ারা সাহেব বরাবর গেয়ে গেছেন। কেউ কেউ বলেন – ওটি তাঁর কৃত্রিম

স্বর। ঠুংরি গানে নারীভাব ফোটাবার জন্যে 'নারীকণ্ঠে' গাইতে আরম্ভ করেন। আবার অনেকে বলেন, মিহি গলাই পিয়ারা সাহেবের স্বাভাবিক কণ্ঠ। কোন মতটি প্রমাণিক তা সঠিক জানা যায় না। তবে পরে তিনি গজল, দাদ্‌রা ইত্যাদি সব রীতির গানই ওই মিহি গলায় গাইতেন এবং আসরে ওইটিই তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠ বলে শ্রোতাদের কাছে সুপরিচিত হয়ে যায়। আগের অধ্যায়ে যে অনাথবাবুর কথা বলা হয়েছে, তাঁর কথাও এ প্রসঙ্গে বলা উচিত প্রখ্যাত দ্বৈত-কণ্ঠের গায়ক অনাথনাথ বসু পিয়ারা সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই ঠুংরি গান অমনি 'নারীকণ্ঠে' গাইতে আরম্ভ করেন। বসু মহাশয়ের সেই মিহি গলাও কৃত্রিম। অনাথবাবু তাঁর স্বাভাবিক পুরুষকণ্ঠে খেয়াল গেয়ে থাকেন এবং 'নারীকণ্ঠে' গান ঠুংরি। বাংলার বুলবুলের এ এক দুর্লভ দক্ষতা! এবং পিয়ারা সাহেবকে তিনি এক হিসাবে অতিক্রম করে গেছেন যে, একই আসরে তিনি দু-রকমের কণ্ঠেই গান শোনাতে পারেন। কিন্তু পিয়ারা সাহেব কোন আসরে কখনো পুরুষ-কণ্ঠে গাইতেন না, গাইতেন শুধু 'নারীকণ্ঠে'।

পিয়ারা সাহেবের গানের স্বর অবশ্য অস্বাভাবিক শোনাত না। বেশ মিষ্টিই লাগত। তাঁর সেই গলায় গানের নিদর্শন ধরা আছে গ্রামোফোন রেকর্ডে। তাঁর গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বলেন যে, পিয়ারার গান অন্তরাল থেকে শুনলে মনে হত কোন মহিলারই গান হচ্ছে। পুরুষের গলা বলে বোঝবার উপায় ছিল না অ্যব তা ছাড়া এমন তার মিষ্টত্ব যে আসর মাৎ-করা গাইয়ে বলেই নাম ছিল পিয়ারা সাহেবের···

ওঙ্কারমল জেঠিয়ার সেই জলসায় আশুতোষ রায় যখন উপস্থিত হলেন, তখন পিয়ারা সাহেব তাঁর সেই মনোরম কণ্ঠের ঠুংরিতে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। মুন্সিয়ানার সঙ্গে ঠুংরি গাইছিলেন পিয়ারা সাহেব এবং সুমিষ্ট ঠুংরি গান তাঁর। প্রাণ মাতানো তাঁর সেই সব গান মধুবর্ষী মনে হল অনেক শ্রোতারই কানে। বাস্তবিকই পিয়ারা সাহেবের গান অনিন্দ্য হয়েছিল।

তাঁর গানের পর এল আশুতোষ রায় মশায়ের পালা। আর তিনি ধ্রুপদ গাইবেন। সুতরাং অবস্থাটি তাঁর পক্ষে কত কঠিন দাঁড়াল তা সহজেই বোঝা যায়। পিয়ারা সাহেবের ঠুংরির তরল আমেজে তখনও মেতে আছেন শ্রোতারা। এফ্‌ শার্পে নারীকণ্ঠে এতক্ষণ ধরে গেয়েছেন পিয়ারা সাহেব,

সেই চড়া সুরে আসর রিন্ রিন্ করছে। সেই স্কেলের পর্দায় পর্দায় যেন তখন বাঁধা হয়ে গেছে আসরের জীবন্ত আবহ।

আশুবাবু এফ্ শার্পে বিশেষ গাইতেন না। সাধারণতঃ ডি-তে গাওয়াই তাঁর অভ্যাস। এখন তাঁর গানের জন্যে তানপুরা ও পাখোয়াজ বাঁধতে হবে। এ অবস্থায় স্কেল নামিয়ে নিয়ে গানের জন্যে নতুন করে তানপুরা বাঁধলে দোষ দেওয়া যায় না গায়ককে। অন্য অনেক গায়ক হলে তা-ই করতেন। আসরের কেউ কেউ তাঁকেও বললেন নামিয়ে বাঁধতে।

কিন্তু আশুবাবু রাজি হলেন না স্কেল নামাতে। তাতে আসরের সুরের পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হবে। তিনি বললেন, 'না। নামিয়ে দরকার নেই। সুর যা বাঁধা হয়ে আছে, তা-ই থাক।'

তিনি এফ্ শার্পেই গাইতে মনস্থ করলেন। এবং সামান্য আলাপ করেই গান ধরে নিলেন। শ্রোতাদের দেখেই বুঝেছিলেন দীর্ঘ আলাপের আসর এ নয়।

বসন্তের সেই মধুর সন্ধ্যায় হোলি উৎসবের আসরে তিনি চৌতালে হিন্দোল রাগ ধরলেন। এ জন্যে কতখানি কণ্ঠকৃতির প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। একে এফ্ শার্প, তাতে উত্তরাঙ্গ প্রধান হিন্দোল রাগ, যার ধৈবত পর্যন্ত তারা সপ্তকে বার বার পৌঁছাতে হবে। উপরন্তু পিয়ারা সাহেবের চিত্তাকর্ষক ঠুংরিতে তখনও শ্রোতাদের মন বিগলিত হয়ে আছে। এই পরিবেশে ভারি চালের ধ্রুপদ গান? অনেক ধ্রুপদী হয়ত গান ধরতেই ইতস্তত করতেন এমন আসরে। জলসা জমানো তো দূরের কথা।

কিন্তু আশুবাবু শুধু গেয়ে চললেন না। আসরের হাওয়া বদলে দিলেন। অসাধ্য সাধন করতে লাগলেন, বলাও যায়। তাঁর সেই অসামান্য সুরেলা ও উদাত্ত কণ্ঠে গান যতই এগিয়ে চলল, শ্রোতারা ক্রমে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন তাঁর গানে।

কিছু সমঝদার যাঁরা ছিলেন তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর গান শুনতে লাগলেন। লক্ষ্য করলেন—মাধুর্যময় অথচ শক্তিশালী সেই কণ্ঠ যেমন অবলীলায় তারা গ্রামে বিচরণ করে তেমনি অনায়াসে অবরোহণ করে আসে। তাঁর কণ্ঠ-সম্পদে ও গীতিরীতিতে, তাঁর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে গেল সমস্ত আসরের আবহ। পূর্বেকার পরিবেশের স্থানে গাঢ় সুরের আবেদনে আসর নতুন রসে সঞ্জীবিত হল।

বিদেশী এবং পশ্চিমা শ্রোতাদের অনেকের কাছেই ধ্রুপদের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সমস্ত আসর এই মোহন-কণ্ঠ ধ্রুপদীর হিন্দোলে আবিষ্ট হয়ে পড়ল। শুদ্ধ সুরের স্পর্শে শ্রোতাদের অভিভূত করে সে গান শেষ হল এক সময়ে। তখন যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গায়কের উদ্দেশে শোনা যেতে লাগল, পিয়ারা সাহেবের গানের পর তেমন শোনা যায়নি।

শুধু প্রশংসা নয়। আসরের সামনে রুপোর একটি প্রকাণ্ড থালায় আবির ফাগ রাখা ছিল হোলির জন্যে। সেই থালার ওপর শ্রোতাদের দরাজ হাত থেকে টাকা পড়তে লাগল। গায়কের জন্যেই প্রীতির উপহার সেসব।

সে রাত্রে আসর থেকে যখন আশুবাবু ফিরলেন তখন সে টাকা তাঁকেই দেওয়া হল।...

কণ্ঠে এমনি যাদু ছিল তাঁর। সাধারণত তিনি ধ্রুপদ গাইতেন এবং খাণ্ডারবাণী রীতিতে। কিন্তু সেই সুর সমৃদ্ধ তাঁর কণ্ঠস্বরের এমন হৃদয়স্পর্শী আবেদন ছিল যে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হতেন। তাঁর সুরের মায়া-প্রভাবের আরও অদ্ভুত দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হবে এখানে।

যাদবপুরে তাঁর একটি আসরে আগেকার আর একটি আসরের অদ্ভুত বিবরণ পাওয়া যায়। যাদবপুরে তখন তাঁর গানের আসর হয়েছিল :তখন জায়গাটির আদিম অবস্থা থেকে রূপান্তরের সূত্রপাত হচ্ছিল। নাগরিক উন্নতির সেই প্রাথমিক যুগে যাদবপুরের পল্লী-দৃশ্য তখনও দেখা যেত ইতস্তত। এখানে সেখানে খোলা মাঠ, গাছপালা, এমনকি জঙ্গলের অংশ পর্যন্ত।

যাদবপুরের যেখানে তাঁর সেদিন গানের আয়োজন হয়েছিল সেটি একটি নতুন বাড়ি। কাছাকাছি অনেকখানি জায়গা ফাঁকা ছিল। আশপাশে গাছপালা, ঝোপঝাড়। আশুবাবুর এক ছাত্র কোন আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁর এই গানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আসরে গান আরম্ভ করবার আগে ছাত্রকে তিনি বললেন, 'সাবধানে থেক। যেরকম জায়গা দেখছি গানের সময় সাপ আসতে পারে।'

কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে তখনই জানা গেল, আগেকার একটি আসরে সাপের গান শুনতে আসার কাহিনী। ছাত্রের কথায় আশুবাবু ঘটনাটি বিবৃত করেন মাত্র, তাঁর গানের অসাধারণত্ব প্রকাশের জন্যে নয়। কারণ তাঁর স্বভাব ছিল নিরহঙ্কার, সরল।

আগেকার সে আসর হয়েছিল বাঙলার বিখ্যাত সঙ্গীতকেন্দ্র বিষ্ণুপুরে।

আশুবাবু বিষ্ণুপুরে মাঝে মাঝে গাইতে যেতেন। সেদিন তাঁর আসর বসেছিল সেখানকার একটি চণ্ডীমণ্ডপে। তার পিছন দিকে একটি বাগান মতন ছিল।

ধ্রুপদ গানের আসর। আশুবাবু দরবারি কানাড়া গাইছিলেন। জয়জয়ন্তী, ইমন কল্যাণ, মালকোষ ইত্যাদির মতন তিনি দরবারি কানাড়াতেও সিদ্ধ। এটি তাঁর অন্যতম প্রিয় রাগও।

চণ্ডীমণ্ডপের সেই আসরে খানিকক্ষণ তাঁর গান চলবার পর হঠাৎ শ্রোতাদের কয়েকজনের নজরে পড়ল—আসরের পিছন দিকে মণ্ডপের একটি উঁচু জানলায় এক প্রকাণ্ড সাপ ফণা ধরে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে, যেন গানেরই সঙ্গে। এই দৃশ্য দেখে আসরের অনেকে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন।

তখন একজন বললেন, 'ভয় পাবেন না, চুপ করে বসে থাকুন। গান চলুক।'

গান হ'তে লাগল পূর্ববৎ। সাপও তেমনি ভাবে যেন একাগ্র হয়ে শুনতে লাগল।

তারপর আশুবাবু যখন গান শেষ করলেন, সেই ভীষণ-দর্শন শ্রোতাও জানলা থেকে নেমে গেল নিঃশব্দে। শ্রোতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এমনি সুরেলা গলা ছিল আশুবাবুর। বাঙলার যে গুণীরা অসাধারণ কণ্ঠসম্পদের জন্যে চিহ্নিত ছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট একজন। প্রতিভা ও সাধনার যুগ্ম ফল তাঁর সঙ্গীতকৃতি।

কিন্তু তাঁর তুল্য প্রতিভাবান শিল্পীর উপযুক্ত সম্মান বা অর্থ তিনি কি জীবনে পেয়েছিলেন? সেকালে এই শ্রেণীর সঙ্গীতচর্চায় বাঙালীদের উল্লেখ্য উপার্জন কিছুই হত না। অনেক আসরে অনেক বাঙালী গুণীর মতন বিনা পারিশ্রমিকেই গাইতেন তিনি।

নির্দিষ্ট আয় সামান্য। দারিদ্র্য তাই নিত্যসঙ্গী। এমন অভাব অনটনের সংসার যে উপযুক্ত আহারও অনেক সময় হত না। হয়ত তারই ফলে যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে ৪২।৪৩ বছর বয়সে (১৯২৫ খ্রীঃ)। কিন্তু সে দারিদ্র্যকে প্রসন্নচিত্তে বরণ করে নিয়েছিলেন সঙ্গীতচর্চার জন্যে। সরল স্বভাবের মানুষ, অল্পেই সন্তুষ্ট ছিলেন। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কখনও অভিযোগ করতে শোনা যায়নি তাঁকে।

বাঙলা দেশে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদচর্চার একটি সমৃদ্ধ ধারার অংশীদার তিনি।

খাণ্ডারবাণী রীতির যে তিনি সাধক ছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বনামধন্য ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁর রীতি-প্রকৃতি বা চালের তিনি একজন যথার্থ ধারক ও বাহক ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদুনাথ রায়ের মতন।

মুরাদ আলী খাঁর বিলম্বিত লয়ের বিশিষ্ট চাল এবং তাঁর সঙ্গীত-জীবনের বিস্তৃত পরিচয় 'সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। এখানে শুধু উল্লেখ করা যায় যে, ময়ূরভঞ্জ-রাজের সভাগায়ক যদুনাথ রায়, উত্তর কলকাতার বেনেটোলার কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় (কর্মসূত্রে তমলুক-নিবাসী এবং বিখ্যাত বিপ্লবী যাদুগোপাল ও আমেরিকা-প্রবাসী সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা), গোয়াবাগানের অবিনাশ ঘোষ (এঁর বাড়িতেই মুরাদ আলীর দেহান্ত ঘটে), প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ রায় প্রমুখ তাঁর শিষ্যরা ওস্তাদের ধ্রুপদের এই ধারাকে ধারণ ও বহন করেছিলেন। অঘোর চক্রবর্তীও মুরাদ আলীর কাছে শিখেছিলেন কিছুকাল। আশুতোষ রায় তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ।

তবে আশুবাবুর ওস্তাদ শুধু মুরাদ আলী নন, জ্যেঠামশায় যদুনাথের শিক্ষাও তিনি ভালভাবেই পেয়েছিলেন। বলতে গেলে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের গঠন হয়েছিল যদুনাথ রায়ের হাতে। তাঁর শিক্ষার আরম্ভও জ্যেঠামশায়ের কাছে ময়ূরভঞ্জে, যেখানে যদুনাথ সুদীর্ঘকাল রাজদরবারে গায়ক নিযুক্ত থেকে ৯৪ বছর বয়সে গত হন।

তাঁদের আদি নিবাস ছিল হাওড়া ও হুগলী জেলার সীমানার কাছে, চাঁপাডাঙ্গা ও আরামবাগের মধ্যবর্তী একটি গ্রামে। পরে আশুবাবুর কলকাতায় বাসা ছিল এবং যদুনাথ রায় ময়ূরভঞ্জ রাজাদের সভাগায়ক হয়ে বিষয় সম্পত্তি লাভ করে সেখানেই বসবাস করেন।

আশুতোষ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই সুধীর রায় জ্যেঠামশায় যদুনাথের কাছে ছেলেবেলা থেকে পালিত হন, গান শিখতে থাকেন। ক্রমে প্রকাশ পায় আশুতোষের অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভা ও অনুপম কণ্ঠের ঐশ্বর্য। ১১।১২ বছর বয়স থেকে যদুনাথ রায়ের কাছে তাঁর রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ। পরে তিনি যদুনাথের ওস্তাদ মুরাদ আলীর কাছেও তালিম নিতে আরম্ভ করেন।

ওস্তাদজী এবং জ্যেঠামশায় দু'জনের কাছেই যুগপৎ চলতে থাকে আশুবাবুর শিক্ষা। বছরের বেশির ভাগ সময় ময়ূরভঞ্জে যদুনাথের কাছে শিখতেন এবং ৩।৪ মাস কলকাতায় গোয়াবাগানে থাকবার সময় অবিনাশ ঘোষের বাড়িতে

মুরাদ আলীকে পেয়ে তাঁর কাছে তালিম পেতেন। মুরাদ আলীর কাছে যখন আশুতোষ শিখতে আরম্ভ করেন, তার বহু বছর আগে থেকে ওস্তাদজীর কাছে যদুনাথ শিখেছেন এবং তখন তাঁর শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বলা যায়। কারণ যদুনাথও ছিলেন একজন যথার্থ প্রতিভাশালী ধ্রুপদ শিল্পী, সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী।

এমনিভাবে এক বিচিত্র সঙ্গীতশিক্ষা ও দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কে গড়ে উঠল মুরাদ আলী, যদুনাথ ও আশুতোষকে নিয়ে। এ পর্বের শেষ দিকে মুরাদ আলীর সঙ্গে যদুনাথের বেশি দেখা হত না। কারণ ওস্তাদ থাকতেন কলকাতায় আর যদুনাথ থাকতেন ময়ূরভঞ্জে। তবে আশুবাবু পালাক্রমে দু'জনের মধ্যে একটি যোগসূত্র রেখে দিতেন।

একবার একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটল আশুবাবুর তালিম উপলক্ষে। দ্বৈত শিক্ষার এক বিচিত্র কাহিনী। তিনি তখন গোয়াবাগানের বাসায় থাকতেন। সেদিন ওস্তাদের কাছে শিখতে যেতে মুরাদ আলী তাঁকে দরবারি কানাড়ার একটি গান দেন, একবার শুনিয়ে। তখন আশুবাবু গানটি আরও খুঁটিয়ে শুনে স্বরলিপি করে শিখতে চাইলে, মুরাদ আলি বললেন, "যদুর কাছে এটা শিখে নিও।"

তার পরের বার যখন আশুবাবু ময়ূরভঞ্জ গেলেন, দরবারি কানাড়ার সেই গানটি মুরাদ আলী যে তাঁকে শেখাবার কথা বলেছেন সে কথা জ্যেঠামশায়কে বলতে যদুবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এ গান তো ওস্তাদজী আমায় দেননি।' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'তবে তিনি যখন বলেছেন, শেখাব তোমায়। ওস্তাদজী বোধ হয় আমায় পরীক্ষা করছেন।'

সেবার আশুবাবু ময়ূরভঞ্জে ছ'মাস থাকেন এবং যদুবাবু তাঁকে সুসম্পূর্ণ করে শেখান দরবারি কানাড়ার গানখানি। তারপর কলকাতায় ফিরে এলে মুরাদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদু শিখিয়েছে তোমায় দরবারির সেই গানটা?'

'হ্যাঁ, ওস্তাদজী।'

'তা হ'লে শোনাও তো।'

আশুবাবু দরবারী কানাড়ার গানখানি সম্পূর্ণ গাইলেন।

মুরাদ আলী নির্বাক হয়ে শুনে বললেন, 'আবার গাও।

তিনি পুনরায় শোনালেন সমস্ত কাজকর্ম সমবেত, ঠিক যদুনাথ যেমনটি

শেখান তেমনিভাবে।

নিবিষ্ট হয়ে শুনে ওস্তাদজী বললেন, 'আমি নিজে শেখালেও এমন করে পারতুম না। যদু যা শিখিয়েছে তাতে কোন খুঁত নেই। আর কিছু বাতাবার নেই এই গানে। যদু দেখছি তৈরি হয়ে গেছে। আমার কাছেও এ গান এমন করে পেতে না।'

মুরাদ আলীর তারিফ থেকে বেশ বোঝা যায়, তখন যদুনাথ রীতিমত তৈরি হয়েছিলেন। তারপর আবার তৈরি করেছিলেন আশুবাবুকে।

মুরাদ আলীর বিলম্বিত লয়ের ধ্রুপদের চাল—যা গমক ও মীড়ের সূক্ষ্ম কারুকর্মের জন্যে বিশিষ্ট ছিল—যদুবাবুর মতন আশুবাবুর সাধনাতেও রূপায়িত হত। আশুবাবুর সেই ধ্রুপদ গানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন সুর ফুটে উঠে চুঁইয়ে পড়ত। দরাজ অথচ অতি সুরেলা গলার মধ্যেই সাধারণত তাঁর আসর মাৎ হত, রাগরূপ বুঝতেন ক'জন শ্রোতা?

গলা তাঁর এমন উদাত্ত ছিল যে এযুগে তার বর্ণনা করতে গেলে গল্প কথাই মতন শোনাবে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার গ্রামের আসরে আশুবাবুর গান শুনেছেন। তিনি বলেন যে, রাতের আসরে আশুবাবুর গান পাশের গ্রাম থেকে পর্যন্ত শোনা যেত। এমন দরাজ গলা।

কলকাতার নানা আসরে আশুবাবুর গান সেকালে হত তার মধ্যে একটি আসর ছিল মধ্য কলকাতায় মতি মিত্র মশায়ের বাড়ি। মতিবাবু যদুনাথ রায়ের কাছে কিছুদিন গান শিখেছিলেন বটে, কিন্তু গান গাওয়ার চেয়ে দামী গান শোনার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। যেমন দিলদরাজ, তেমনি ধনীর পুত্র। সঙ্গীতপ্রেমী হিসেবে তাই মুক্তহস্তে গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। পৈতৃক আটটি বাড়ির মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতপ্রেমের বাস্তব কারণে সে সবই জলাঞ্জলি দেন একে একে। সেকালের হাজার টাকা মুজ্‌রো দিয়েও পশ্চিমাঞ্চলের গুণীদের তিনি নিয়ে এসেছেন। তার চেয়ে অল্প মূল্যের মুজরোর তো কথাই নেই।

কলকাতার এই সব আসর ছাড়া কলকাতার বাইরে থেকেও মাঝে মাঝে আশুবাবুর ডাক আসত। সেসব জায়গায় পারিশ্রমিক পেতেন, কিন্তু সেকালে তার সংখ্যা ও পরিমাণ তেমন উল্লেখ্য নয় তাঁর দারিদ্র্য তাতে দূর হয়নি।

কয়েকজন মাত্র ছাত্র ছিলেন আশুবাবুর। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতের যথার্থ উত্তরাধিকারী কেউ ছিলেন না। সে ছাত্ররা হলেন— মেদিনীপুরের মাস্তবাবু,

কলকাতার বিভূতিভূষণ সেন (ইনি সাতকড়ি মালাকরেরও শিষ্য হয়েছিলেন), অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

একথা অনেকেরই জানা নেই যে, পরবর্তীকালের ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং সমালোচনা-সাহিত্যের সুপণ্ডিত লেখক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম জীবনে পাঁচ বছর সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন। সেই পাঁচ বছর (১৯১৫ থেকে ১৯২০) তিনি ছিলেন আশুবাবুরই শিক্ষাধীনে। প্রথমে খেয়াল ও পরে ধ্রুপদ শিখতেন। কিন্তু তাঁর সে সঙ্গীতশিক্ষার সূচনা হয় অন্য কারণে এবং সঙ্গীতশিক্ষারই জন্যে নয়!

ঘটনা এই যে, শ্রীকুমারবাবু প্রথম অধ্যাপনা করেন রিপন কলেজে এবং সেখানকার ১৫০।২০০ ছাত্রের এক একটি ক্লাসে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দেবার ফলে তিনি কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। Throat trouble-এর জন্যে কণ্ঠ অনেক সময় রুদ্ধ হয়ে যেত, শ্লেষ্মা জমে অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। নানা চিকিৎসাতেও রোগের উপশম না হওয়ার পর কেউ কেউ পরামর্শ দেওয়ায় সঙ্গীতচর্চা তথা কণ্ঠচর্চা আরম্ভ করলেন আশুবাবুর কাছে। তাঁর নির্দেশে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিয়মিত কণ্ঠসাধনা। ফলে ক্রমেই সেই Throat trouble কমে যেতে লাগল। বছরখানেক পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। তার পরও চার বছর আশুবাবুর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় করেছিলেন। সেজন্যে সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি নিতান্ত অনধিকারী নন।

এখন আশুবাবুর আর একটি আসরের উল্লেখ করে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করি। শ্রীকুমারবাবু যখন সঙ্গীতচর্চা করতেন এটিও সে সময়ের ঘটনা। তিনি তাঁর এক বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী হয়ে যান, সেখানে আশুবাবুর গানের আসর বসে।

গৃহস্বামী বিবাহ উপলক্ষে সে আসরে বাঈজীর গানেরও আয়োজন করেছিলেন। আশুবাবু সেখানে সঙ্গতকার নিয়ে যাননি। খেয়াল গাইবেন, সুতরাং বাঈজীর তবল্‌চিও ও তবলাতে সঙ্গত হবে, এই ভেবেছিলেন।

আসরে প্রথমেই আশুবাবুকে গান গাইতে অনুরোধ করা হল। তবল্‌চি তবলা নিয়ে বসলেন তাঁর সামনে। কিন্তু তবলা-বাঁধা আছে জি শার্পে।

সে বাঈজীর চড়া গলার সঙ্গে মিলিয়ে জি শার্পেই বরাবর বাঁধা থাকে, তবল্‌চি জানালেন। তবলা নামিয়ে বাঁধবার কথা একবার হল বটে, কিন্তু তবলাবাদক রাজি হলেন না—'নামালে ভাল আওয়াজ দেবে না, বরাবর এই স্কেলেই বাঁধা হয়ে এসেছে।'

'আচ্ছা, থাক তা হ'লে,' বলে জি শার্পেই আশুবাবু গান আরম্ভ করলেন। প্রথমে ধরলেন মালকোষ। সেই অত্যন্ত চড়া স্কেলেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রঞ্জিনীশক্তির কোন অভাব দেখা গেল না। তিনি পর পর কয়েকটি গান গাইলেন দু'ঘণ্টা ধরে।

বিবাহ বাড়িতে সমবেত এই আসরের শ্রোতারা মুগ্ধ চিত্তে তাঁর গান শেষ পর্যন্ত শুনলেন। বাঈজীও শুনছিলেন সেখানে বসে।

আশুবাবুর গানের পর বাঈজীর পালা এল। গৃহস্বামীর পক্ষ থেকে তাঁকে গাইবার জন্যে বলতে তিনি কিন্তু সম্মত হলেন না। অনেককেই অবাক করে দিয়ে আশুবাবুর উদ্দেশ্যে জানালেন, 'অপূর্ব এঁর গান। এর পরে আমি আর কি গাইব ?'...

এমন গলা ছিল আশুতোষ রায়ের। এমন গান তিনি গাইতেন। অথচ সে যুগটা ছিল কি রকম! এত বড় গুণী গায়কের ভাগ্যে অর্থ, সম্মান, যশ কিছুই প্রায় আসেনি। অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত অবস্থায় দারিদ্র্য ও রোগের বলি হয়ে বিদায় নিয়েছেন ইহজগৎ থেকে। প্রায় অকালেই বলা যায়, কারণ মৃত্যু সময় মাত্র ৪২ বছর বয়স হয়েছিল। তাঁর নামও প্রায় মুছে গেছে সঙ্গীত-জগৎ থেকে।

তিনি নিজেও তাঁর প্রতিভার বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। অতিশয় সরল, উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। গ্রামোফোন রেকর্ডে গান গাইবার জন্যে কয়েকবার তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়, কিন্তু তিনি সম্মত হননি। তিন মিনিটে আবার ধ্রুপদ গান কি হবে ? রাজি না হওয়ার জন্যে কিছু টাকা থেকে বঞ্চিত হবেন, সেও ভাল।

একবার রাঁচিতে গিয়েছিলেন। মোরাবাদী পাহাড়ের বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর গান শোনেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানের শেষে মুগ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় তাঁকে একটি ভাল প্রশংসাপত্র দিতে চাইলেন।

কিন্তু আশুবাবু তার কোন প্রয়োজন মনে করলেন না। গান শিখেছি, গান গাইব। লোকের ভাল লাগে এই তো আনন্দের কথা। কি হবে সার্টিফিকেট নিয়ে ? নিজের গলাই তো সার্টিফিকেট!

॥ দৃষ্টিহীনের সুরজগৎ ॥

দৃষ্টি প্রদীপ জ্বলেনি বটে, কিন্তু অন্তরে আর এক আলোকের রাজ্য। ছন্দোময় সুর তার সেই আলো। সুর-সাধকের মনের চোখে তাইতেই এক অপরূপ বিশ্ব বিরাজ করে। নিজেরই নিঃসারিত সুরধারায় সে জগৎ ধরা দেয় তার অন্তরে। সেই সঙ্গীতধ্বনিতে তার সমগ্র চেতনা উদ্‌ভাসিত হয়ে থাকে।

দৃশ্যমান বহির্বিশ্ব তার কাছে লুপ্ত। কিন্তু সুরের সুরধুনীতে জেগে থাকে সেই অদৃশ্য দীপের আলো।

বাহ্য দৃষ্টির অভাব পূর্ণ করে নেয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি। মন অতিশয় অন্তর্মুখী হয়। প্রায় একান্ত করে তোলে অন্তর জগৎকে। দর্শনের নানা কার্য-কারণ থেকে অবসর পেয়ে তার মানসলোক আপন ভাবুকতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দেখা যায় সঙ্গীত-নৈপুণ্য ও স্মৃতি, মননশীলতা ও সৃষ্টিশক্তির উৎকর্ষতা।…

বাঙলার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমন কয়েকজন গুণীর জীবন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হয়ে আছে। সুর জগতের প্রতিভা তাঁরা। যেমন—খেয়াল গায়ক শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈদ্যনাথ মিশ্রের শিষ্য), সব্যসাচী গীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে, ধ্রুপদী ও টপ্পা-গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, খেয়াল ও টপ্পা-গুণী সাতকড়ি মালাকর প্রভৃতি।

তবে তাঁদের সকলের নাম সাধারণ্যে সুপরিচিত হতে পারেনি, নানা কারণে। সাতকড়ি মালাকর এমনি এক সঙ্গীত-প্রতিভার নাম।

তাঁর তুল্য এমন সত্যকার প্রতিভা এবং রীতিমত শিক্ষিত শিল্পী আমাদের দেশে বেশি দেখা যায়নি। কিন্তু এই দৃষ্টিহীন, বিত্তহীন সুরের সাধক তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীত-জীবনে বিশেষ সমাদর ও যশ লাভ করেননি দেশবাসীর কাছে। ধ্রুপদাচার্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মালাকর মশায়ের পরিণত বয়সে তাঁর সম্বন্ধে দুঃখ করে বলতেন—'বাঙলা দেশের একটা সম্পদ। এতবড় গুণী এখন বাঙলায় আর কোথায়? এঁকে কেউ চিনলে না।'

লোকে তাঁকে চিনলে না, তাঁর তুল্য গুণীর প্রাপ্য মর্যাদা দিলে না। এমন কি বাস্তব জীবনের কোন সুখভোগও তাঁর ভাগ্যে মেলেনি। আমৃত্যু একনিষ্ঠভাবে সঙ্গীত-ব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে

বিদায় নিয়েছেন ইহজগৎ থেকে। তাঁর গুণপনার কথা দেশের ক'জন জেনেছে ?

কিন্তু জানাবার যোগ্য ছিল তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা। অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর জীবনের সাধনা, তাঁর সঙ্গীত-সাধনা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন। শুধু অব্যাহত রাখা-ই নয়, যে উচ্চ মানের সাঙ্গীতিক আদর্শ তিনি অনুসরণ করতেন, তার থেকে বিচ্যুত হননি কোনদিন। সঙ্গীতের মান ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য কখনও তিনি ক্ষুণ্ণ করেননি।

সেকালের নিষ্ঠা ও আদর্শবোধ তাঁরও মজ্জাগত ছিল। চিরদিন দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করেও সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে তিনি ছিলেন পরম আদর্শবাদী। তাঁর সমকালে রাগসঙ্গীতের অনুশীলন পেশা হিসেবে খুব অর্থকরী ছিল না। উপরন্তু তিনি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, তায় অন্ধ। এই সব এবং আনুসঙ্গিক নানা কারণে সামাজিক প্রতিপত্তি না থাকায় বাস্তব জীবনের অনেক সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আর্থিক সাফল্যের তোরণ পার হবার পথে বাধা তাঁর বিস্তর। তাই জীবনের শেষ ক'বছর চরম দুর্গতি ভোগ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর যেমন কণ্ঠসম্পদ ছিল, হালকা ধরনের গান অন্তত যদি উপার্জনের জন্যে গাইতেন, তা হ'লে তাঁর কষ্টের অনেক লাঘব হত, সুখের মুখ দেখতে পেতেন। তিনি নিজেও বুঝতেন এ কথা।

কিন্তু জনপ্রিয় গায়ক হয়ে অর্থোপার্জন করা তাঁর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। যে রীতির সঙ্গীতকে শ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু বলে গ্রহণ করেছিলেন অন্তরের শিল্প-প্রেরণায়, সে বিষয়ে কোনরকম সুবিধাবাদ ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। এ সম্পর্কে কথা উঠলে তিনি বলতেন- -'আমি মরে যাব সেও ভাল, কিন্তু সস্তা গান গেয়ে নিজেকে কিছুতেই খেলো করব না।'

হায়, শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছিল। লঘু-সঙ্গীত পরিবেশন করে রোজগারের ধান্দায় নিজের সাঙ্গীতিক মান নমিত করেননি বটে, কিন্তু চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যে এমন কি অর্ধাসনেও তাঁর অনেক দিন কেটে যায় শেষ বয়সে। এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রায় ভিখারির মতন নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়।

অথচ তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত গুণী। খেয়াল ও টপ্পা গানে রীতিমত ওস্তাদ ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করে খেয়ালে উচ্চাঙ্গের শিল্পী। টপ্পা-গুণী-রূপে তাঁর পরিচয় বাইরে প্রকাশ পায়নি, কারণ প্রকাশ্য

আসরে টপ্পা তিনি গাইতেন না।

টপ্পা শোনাতেন ঘরোয়া আসরে কিংবা ছাত্রদের সঙ্গীত শিক্ষা দেবার সময়। ছাত্রদের টপ্পা শেখাতেন বিচক্ষণভাবে. এবং টপ্পার সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও ছিল খুব শ্রদ্ধার। টপ্পা শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে এই মত প্রকাশ করতেন যে,—টপ্পায় দখল না হলে খেয়ালের ভিত্ কখনও পাকা হয় না। টপ্পাকে ভিত্তি কর, দেখবে খেয়াল কেমন তৈরি হবে।

তাঁর গায়ন-পদ্ধতি কঠিন সাধনাসাপেক্ষ ছিল, সেজন্যে অনেকে তা দুরূহ বলে শিক্ষা করতে পারতেন না। কিন্তু আসরে শিল্পীরূপে তিনি যথার্থ গীত-রসিকদের পরিতৃপ্ত করতেন রীতি-সঙ্গত পরিবেশনে।

একদিকে যেমন তিনি সত্যকার সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেন, খেয়াল ও টপ্পা গানে রসসৃষ্টি করতে পারতেন, অন্যদিকে তেমনি তাল ও লয়ে ছিলেন অসামান্য নিপুণ এবং অভ্রান্ত। বিলম্বিত লয়েই তিনি মুন্সিয়ানা দেখাতেন বেশী।

সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতের ভাণ্ডার অসাধারণ সমৃদ্ধ ছিল। বিপুল সঞ্চয় ছিল তাঁর, বিশেষ অপ্রচলিত রাগের, সুপরিচিত রাগগুলির তা বটেই। সেই সব অচলিত রাগের গান তিনি অতি সাবলীলভাবে গেয়ে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিতেন।

তাঁর এই একটি মনোহারী বৈশিষ্ট্য দেখা যেত যে, যে তালের যে ছন্দ তা গানের মধ্যে এবং তানের মধ্যেও তার রূপ ফোটাতেন সুসঙ্গতভাবে।

খাড়ব ও ঔড়ব জাতীয় রাগের ওপর তাঁর ঝোঁক দেখা যেত অনেক সময়। অর্থাৎ বিবাদী বা বর্জিত স্বর যে সব রাগে আছে তা তিনি পছন্দ করতেন এবং বেশি গাইতেন। সে সব গানেও প্রকাশ পেত তাঁর শিক্ষিত পটুত্ব ও গুণপনা।

তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি ও আসরের কথা আরও কিছু জানবার আছে, এ প্রবন্ধের শেষদিকে সে সব উল্লেখ করা হবে। তার আগে তাঁর রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার কথা জানান দরকার। শিক্ষার সুযোগ তিনি কিভাবে ঘটনাচক্রে পেলেন এবং আপন প্রতিভায় কেমন করে সেকালের এক শ্রেষ্ঠ গুণীর কাছে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হল, সে সব কথা কৌতূহল উদ্দীপক। সে সব প্রসঙ্গে বাঙলার বিগত যুগের আরো কয়েকজন গুণী এবং তখনকার সঙ্গীত-জগতের কিছু কিছু তথ্যও পাওয়া যাবে।

এখন সাতকড়ি মালাকরের গোড়ার কথা। তাঁদের বংশে তাঁর আগে সঙ্গীত-চর্চা কখনও দেখা যায়নি। তাঁদের জীবনের বৃত্তি বা জীবিকা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সঙ্গীতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তাঁদের ছিল না। তাঁর মধ্যে দৈবাৎ প্রকাশ পায় সঙ্গীত-প্রতিভা। তার জন্যে কোন পরিবেশ বা পটভূমি সেখানে রচিত হয়নি।

তাঁদের আদিনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার ভেদে নামক এক অখ্যাত গ্রামে। কিন্তু সেখানে তাঁদের পরিবারের অন্নসংস্থান হয়নি। তাঁর বাবা কাকা সেখানে থেকে কলকাতায় চলে আসেন জীবিকার সন্ধানে। মালাকর পদবীতেই যা প্রকাশ পায়, তাঁদের পারিবারিক বৃত্তি ছিল সোলার কাজ, ফুলের কাজ, মালা গাঁথা ইত্যাদি এবং সেই সব বিক্রয় করে সংসার নির্বাহ।

আগেই বলা হয়েছে, তাঁরা দরিদ্র ছিলেন। ওই সব কাজ করে তাঁদেয় কোনক্রমে দিন চলত, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। বর্ধমান থেকে তাঁরা এসে থাকতেন উত্তর কলকাতার মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটের একাংশে। সেকালে জায়গাটির নাম ছিল্ কাটমার বাগান। সেখানেও ওই সোলা ও ফুলেব কাজ করে তাঁদের দিন চলত।

দরিদ্র বৃত্তি-জীবীর ঘর। উপরন্তু সাতকড়ির শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ তাঁর বিশেষ হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে কাকার সঙ্গে নিতে হয়েছিল বংশের ওই পেশা।

দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর আরও দুর্ভাগ্য যুক্ত হয়েছিল। জন্মান্ধ ছিলেন না, বালক বয়সে ভীষণ বসন্ত রোগে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন চিরদিনের জন্যে বসন্তের সেই আক্রমণের চিহ্নগুলি তাঁর মুখময় পরিণত বয়সেও দেখা যেত।

মালাকর পরিবারের সেই অন্ধ ছেলেটির গান গাইবার ক্ষমতা কেমন করে প্রকাশ পায় কেউ জানে না। কিন্তু তাকে গান গাইতে শোনা যেত। যে কোন গান শুনে তা সে গাইতে পারত নির্ভুলভাবে। আর গলাটিও ছিল ভাল। তার ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করার সময় পাড়ার লোকে তার গান শুনত। অন্য কেউ এ পাড়ায় এ[illegible]ও শুনতে পেত বালকের মিষ্টি গলার বাংলা গান।

ছেলেটির পাশের বাড়িতে থাকতেন বীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক। বীরেন্দ্রবাবুর বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন তাঁর এক

আত্মীয়, তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। তুলসীবাবু রীতিমত সঙ্গীতজ্ঞ—বেহালা-বাদক এবং গায়কও। সঙ্গীত জগতে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর কথা এ প্রসঙ্গে জানান দরকার।

তুলসীদাস ছিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত সঙ্গীতগুণী পরিবারের সন্তান। কলকাতার আদি ধ্রুপদী এবং স্বনামধন্য যদুভট্টের সঙ্গীতগুরু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র তিনি।

যে সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে—অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষদিকে, ১৮৯০ কিংবা তার কাছাকাছি সময়—গঙ্গানারায়ণ তার অনেক আগেই পরলোক গমন করেছেন। পিতামহের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ পাননি তুলসীদাস। তিনি শিখেছিলেন প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার খ্যাতিমান গায়ক কেশবলাল মিশ্রের কাছে। কেশবলাল হলেন প্রসিদ্ধ খেয়াল ও টপ্পা গায়ক রামকুমার মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র এবং লছমীপ্রসাদের দ্বিতীয় অগ্রজ।

এই মিশ্র পরিবারের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বংশের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ও পরিচয় গঙ্গানারায়ণের সময় থেকেই। মনোহর ও প্রসদ্দু (বা হরিপ্রসাদ মিশ্র) ভ্রাতাদের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তারপর মনোহর মিশ্রের পুত্র রামকুমার মিশ্রও দীর্ঘকাল কলকাতায় অবস্থান করবার সময়ে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বলরাম দে স্ট্রীট ভবনে বাস করেন অনেক দিন। পরে রামকুমারের দ্বিতীয় পুত্র কেশবলাল মিশ্রের কাছে তুলসীদাস সঙ্গীত শিক্ষা করেন। চট্টোপাধ্যায় মশায় তাঁর বিখ্যাত স্বরলিপি পুস্তক 'সরল স্বরলিপি শিক্ষা'র প্রথম ভাগটি উৎসর্গও করেন তাঁর সঙ্গীতগুরু কেশবলাল মিশ্রের উদ্দেশে।

বেহালাবাদক এবং গায়ক তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত-জগতে একটি অবদান রেখে যান, যা উল্লেখযোগ্য। তা হল তার 'সরল স্বরলিপি শিক্ষা' নামক চার খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং অন্যান্য রচয়িতাদের সেকালে প্রচলিত বহু বাংলা ও হিন্দী গানের স্বরলিপিই শুধু প্রকাশ করেননি ; বিভিন্ন জাতির অনেক গৎও স্বরলিপির সঙ্গে দিয়েছেন। তা ছাড়া স্বরলিপি শিক্ষা সম্পর্কে নানা নির্দেশও আছে গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে।

এই স্বরলিপি পুস্তকগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে যে রীতিমত সমাদর লাভ করে তা বহু সংস্করণেই প্রকাশ—প্রথম ভাগের দশম সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগের

পঞ্চম সংস্করণ, তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংস্করণ ও চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেকার আমলে সঙ্গীত পুস্তকের (শুধু সঙ্গীত কেন, যে কোন বিষয়েরই বাংলা বইয়ের) এত প্রচার দুর্লভ ব্যাপার ছিল; সন্দেহ নেই।

সে যা হোক, তুলসীদাসবাবু তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে যাতায়াত সূত্রে বালক সাতকড়ি মালাকরের গান শুনতেন। শুনে বুঝতে পারলেন যে, ছেলেটি সুকণ্ঠ। তারপর একদিন গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন; সামনে বসে তার গান শুনলেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন যে, আরও গান শিখতে ইচ্ছে আছে কি না।

ছেলেটির সম্মতি জেনে তিনি তিন-চারটি গান শেখালেন। সে সব গানের ভাষা বাংলা হলেও রাগ সঙ্গীত পর্যায়ের বলা যায়। প্রথমে শেখান সোহিনীর একটি সেকাল-প্রচলিত গান। (গানটি তাঁর 'সরল স্বরলিপি শিক্ষা'র চতুর্থ ভাগে পাওয়া যায়)—

তোমারে ভালবেসে অবশেষে কাঁদিতে হল
নিরাশায় হৃদি ঘেরিল ;
কেন জীবন বিফল হল ॥
ভেবেছিনু দিয়ে প্রাণ ;
পাব প্রেম প্রতিদান ;
সে আশায় নিরাশ হয়ে
কেন জীবন রহিল ॥

এই গান ক'খানি শেখাতে গিয়ে তুলসীদাসবাবু লক্ষ্য করলেন—বালকের কণ্ঠ রাগসঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে যেমন উপযুক্ত তেমনি তার গ্রহণ করার শক্তি ও সঙ্গীত-শিক্ষার আগ্রহ। তিনি তখন তার পদ্ধতিগতভাবে শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। এ এক অভাবনীয় সুযোগ সেই অবস্থার একটি ছেলের পক্ষে। তার বয়স তখন বছর পনের হবে।

কারণ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তার রীতিমত শেখবার বন্দোবস্ত করে দিলেন তখনকার এমন একজন নেতৃস্থানীয় আচার্যের কাছে, যেখানে উপস্থিত হওয়া তখন সাতকড়ি মালাকরের পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক; একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা-গুণী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে তুলসীবাবু তাকে নিয়ে গেলেন উক্ত বীরেন্দ্রবাবুর সহযোগিতায়। চক্রবর্তী মশায় তাঁদের অনুরোধে

ছেলেটিকে তৈরি করে দেবার দায়িত্ব নিলেন। শুধু তাই নয়; তাকে তিনি আশ্রয় দিলেন, নিজের কাছে রেখে রীতিমত শিক্ষা দেবার জন্যে। এমন গুরু তখনও এদেশে দেখা যেত।...

তবে অতি কষ্টসাধ্য ছিল গোপালচন্দ্রের শিক্ষাদানের পদ্ধতি। শুধু রাগে নয়; সেই সঙ্গে তাল ও লয়ে তিনি শিষ্যদের দুরস্ত করে দিতেন যে রীতিতে, তেমনিভাবেই এই প্রতিশ্রুতিবান তরুণকে শেখাতে লাগলেন। শিক্ষার্থীও তা আয়ত্ত করতে লাগল দৃষ্টিহীনের একাগ্র সাধনায়।

এমনিভাবে ছ-বছর ধরে অনন্যকর্মা সাতকড়ি মালাকর গুরুর কাছে শিক্ষা করলেন। তিনি শিখলেন প্রধানত খেয়াল, সেই সঙ্গে টপ্পা অঙ্গও কিছু।

তারপর চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

আচার্যের মৃত্যুর কিছুদিনের মধেই শোভাবাজারের মণীন্দ্রনারায়ণ দেব মশায়ের আনুকূল্য ভাগ্যক্রমে লাভ করলেন সাতকড়িবাবু। বিখ্যাত দেব পরিবারের মণীন্দ্রনারায়ণ রাধাকান্তদেবের প্রপৌত্র, অতিশয় সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং নানা সঙ্গীতজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করে তিনি তাঁদের সঙ্গীতচর্চার পথ সুগম করে দেন। সঙ্গীতের জন্যে দেব মশায় বহু অর্থব্যয় করেছেন সেকালের মেজাজে।

চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পর সাতকড়িবাবুর সেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে মণীন্দ্র-নারায়ণ মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি দিয়ে তাঁর বিশেষ সহায়তা করেন। শুধু তাই নয়। শোনা যায়, তাঁর সঙ্গীতচর্চার পক্ষে আরও এক মহা উপকার করেন মণীন্দ্রনারায়ণ। তিনিই না কি সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা যাদুমণির কাছে শ্রীমালাকরের সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ করে দেন। নচেৎ যাদুমণির কাছে শিক্ষা করবার জন্যে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। কারণ যাদুমণির তখন বর্ণাঢ্য নটি-জীবনের মধ্য পর্ব। সঙ্গীত শিক্ষা করা দূরের কথা, তাঁর সামনে পৌঁছানও নিতান্ত ধনী ভিন্ন অসম্ভব ছিল।

এই দুর্লভ সুযোগ পেয়ে সাতকড়িবাবু বেশ কয়েক বছর শিখলেন যাদুমণির কাছে। যাদুমণির শিক্ষায় তিনি প্রধানত টপ্পার বিপুল সঞ্চয় লাভ করেছিলেন।

যাদুমণির কাছে শেখবার শেষদিকে কিংবা তার অব্যবহিত পরে আর একজন আচার্যস্থানীয় গুণীর কাছেও শিখেছিলেন তিনি। তাঁর এই তৃতীয় গুরুর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী, সেকালের বাঙলার একজন বহুমুখী সঙ্গীত প্রতিভা। তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় 'সঙ্গীতের আসরে' পুস্তকে

দেওয়া হয়েছে। এখানে পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর নানা রীতি-সমৃদ্ধ সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে সাতকড়িবাবু যে বিশেষ লাভবান হন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছেও তিনি কিছু শেখেছিলেন, শোনা যায়। পরিণত বয়সে একদিন একটি সকালবেলার আসরে মালাকর মশায় একটি খট্ তোড়ির খেয়াল শুনিয়েছিলেন। গান শেষ হতে তিনি বললেন, 'এই খট্ তোড়ি গোঁসাইজীর কাছে নেওয়া।'

এই হল সাতকড়িবাবুর শিক্ষা তথা সাধনাপর্বের রূপরেখা। সর্বসমেত ১৫-১৬ বছরের কম হবে না। সুতরাং বোঝা যায় যে তাঁর সঙ্গীত-জীবন কত দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাঁদের কাছে তিনি শিখেছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন উত্তর জীবনে, তাঁদের প্রসঙ্গে কথা হলে। কিন্তু বেশি করে বলতেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী আর যাদুমণির সম্পর্কে। বলতে গেলে তাঁর সঙ্গীতজীবন এঁদের দুজনের শিক্ষাতেই গঠিত হয়েছিল। সে জন্যেও হয়ত এঁদের কথা বেশি বলতে পারেন।

বিশেষ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা। তাঁকে সাতকড়িবাবু মান্য করতেন সব চেয়ে বেশি। তাঁর নাম না করে 'কর্তা' বলে তাঁকে উল্লেখ করতেন। বলতেন, 'কর্তাকে এই ডান হাত দিয়েছি। এ হাত আর কাউকে দিতে পারব না।' অর্থাৎ সবচেয়ে বড় গুরু জ্ঞান করতেন চক্রবর্তী মহাশয়কেই। আর কাউকে তাঁর আসনে বসাতে পারবেন না!

সেই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুরুর কৃতি ও রীতি-নীতি গভীর প্রভাব ফেলেছিল তাঁর সঙ্গীত-জীবনে, গান গাইবার ধরনের ওপর। পরিণত বয়সেও গুরুর সঙ্গীত-ধারাকে অনেকাংশে অনুসরণ করতেন। সেই সব ছন্দের কাজ, তানের বৈচিত্র্য আর সুরবিহার। আর সে সব মনোমুগ্ধকর ছোট ছোট তান। আট মাত্রা, বারো মাত্রার টুকরো তান। সম থেকে ফাঁক কিংবা সম্ থেকে প্রথম তাল পর্যন্ত তাদের গতি। চমৎকার সৌন্দর্য সৃষ্টি হত সেই সব টুক্‌রো তানে। খুইব শিল্প-সুন্দর (artistic)—টুক্‌রো তানের রূপ যেমন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে, তেমনি যাদুমণির কাছেও পেয়েছিলেন, বলতেন।

সাতকড়িবাবু বিলম্বিত লয়ে খেয়াল বেশি গাইতেন আর তাইতেই তাঁর মুন্সিয়ানা আর সুরের বাহার দেখা যেত বেশি। মধ্য লয়েও গাইতেন,

তবে দ্রুত লয়ে বিশেষ নয়। তালের মধ্যে আড়া ঠেকা আর তেওটেই বেশি গাইতেন।

মীড়ের কাজ তিনি বেশি করতেন, গমকের তানও দিতেন খুব। সুরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে গানের ভাষার অন্তর্গত ভাবকে ফোটাতেন। টপ্পা গাইবার সময় দানাগুলির মধ্যেই মাত্রার হিসেব থাকত অঙ্গাঙ্গী।

তাঁর গানের আর এক বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, স্থায়ীতেই বেশি কাজ দেখাতেন। সুরের বিচিত্র্য বিবরণে এই অংশেই রাগের রূপ প্রদর্শন করতেন বেশি করে। অন্তরায় দু-এক বার মাত্র যেতেন। টুক্‌রোর বাহারে পুনরাবৃত্তি ঘটত না কখনও। এক-একটি রকম একবারই ব্যবহার করতেন। কত রকমের ছটায় চমক সৃষ্টি হত তাঁর গানে আর সেসব গানের চাল ছিল অতি আকর্ষক। যেমন তানে তেমনি সুরেও তিনি বৈচিত্র্য ভালবাসতেন। যেমন অপ্রচলিত তেমনি অন্য অনেক রাগও গাইতেন আসরে। তবু তারই মধ্যে খেয়াল অঙ্গে বোধ হয় তাঁর বেশি প্রিয় ছিল ললিত, ভৈরব, দরবারি কানাড়া, বসন্ত, পূরিয়া; সোহিনী।

রাগের রূপ বিষয়ে তাঁর চিন্তা ছিল; গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রাগের গঠন সম্বন্ধে ছাত্রদের লক্ষ্য করতে শেখাতেন; বলতেন; 'কোন্ কোন্ রাগ মিশে কোন্ রাগ হয়েছে বুঝতে চেষ্টা করো।'

ছাত্রদের তিনি স্বাভাবিক গলায়; অর্থাৎ আওয়াজ বেশি না চড়িয়ে, রেওয়াজ করতে ও গাইতে বলতেন। চড়া স্কেলে গাইলে অনেকের গলার স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে; এই ছিল তাঁর মত। সেজন্যে তিনি শিক্ষার্থীদের বি-ফ্ল্যাটে স্বাভাবিক গলায় শেখবার নির্দেশ দিতেন।

তাল লয়ে নিজে যেমন অটুট ছিলেন, ছাত্রদেরও তেমনি হুঁশিয়ার করে দিতেন। গান গাইবার সময়ে তালে সজাগ থাকবার উপায় শেখাতেন ছাত্রদের। সুরের সঙ্গে তাল লয়েরও সাধনা। বাঁ হাতে তবলায় ঠেকা; ডান হাতে তানপুরা। শিক্ষার এই পদ্ধতি বোধহয় তিনি প্রথম সঙ্গীতগুরু চক্রবর্তী মশায়ের কাছে পেয়েছিলেন।

দু-একজন তবলচি সম্পর্কে তাঁর নিজের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তবলাবাদক গানকে ছাপিয়ে উঠে গানের সুরের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয় অনেক সময়। সেজন্যে তিনি ছাত্রদের সতর্ক করে দিতেন; 'তবলচিকে কখনও মাথায় চড়তে দেবে না।'

ছাত্র তাঁর কয়েকজন ছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তাঁরই শিক্ষায় গঠিত শিষ্য বিশেষ কেউ হননি। সুপরিচিত গায়ক তারাপদ চক্রবর্তী প্রথম জীবনে তাঁর কাছে কিছুকাল শিখেছিলেন। বিখ্যাত টপ্পা-গায়ক বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়ও মালাকর মশায়ের শিক্ষা বেশ কিছুদিন লাভ করেন, যদিও আগে-পরে অন্য ওস্তাদের কাছেও শেখেন তিনি। তা ছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, বিভূতিভূষণ সেন, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি আরও ক'জন ছাত্র তাঁর ছিলেন।

সাতকড়িবাবুর কণ্ঠ ছিল সুরেলা, মিষ্ট। বাজখাঁই নয়। বোলন্দ অর্থাৎ স্বাভাবিক গলার মাধুর্যে তিনি গাইতেন। গমকের সময় গলা ভরাট হত তাঁর। আর দানাগুলি দেখাবার সময় গলাকে মিষ্টি করে নিয়ন্ত্রণ করতেন, দরকার মতন।

বড় আসরের মধ্যে তিনি গেয়েছিলেন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ স্থাপিত ও পরিচালিত 'নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন'-এ। এ্যালফ্রেড থিয়েটারে সেবার ওই সম্মেলনের এক আসরে তিনি বাগেশ্রী গেয়ে শুনিয়েছিলেন। শুধু বাঙলা দেশের নয়, কয়েকজন সর্বভারতীয় অবাঙালী গুণীও উপস্থিত ছিলেন তাঁর গানের সময়। এবং তাঁরা সকলেই তাঁর খেয়াল শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, কি বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্য বলা যায় না, তিনি তাঁর উপযুক্ত সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেননি। তাঁর চেয়ে অনেক অল্প পুঁজির লোককে বাঙলার বড় বড় আসরে গেয়ে, দাপটের সঙ্গে মর্যাদা ও মোটা দক্ষিণা আদায় করে নিতে দেখা গেছে। 'খাঁ সাহেব' এই নামের মহিমাতেও কার্যোদ্ধার হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। কিন্তু এই দৃষ্টিশক্তিহীন, সম্পদহীন বাঙালী গুণী বেশির ভাগই ঘরোয়া কিংবা ছোটোখাটো আসরে বিনা পারিশ্রমিকে সুর সৃষ্টি করে গেছেন।...

কি হৃদয়স্পর্শীভাবে গাইতেন তিনি সদারঙ্গের সেই ভৈরব রাগের খেয়ালটি—

তোর সঙ্গ জাগি মতওয়া মোরি।
বালম আওয়ো, মোর সঁইয়া সদারঙ্গ রঙ্গিলে॥
তোম্ বিনা তরস গয়িরি দরশন বেগ বাতাউ।
লেহো গলইয়া সদারঙ্গ রঙ্গিলে॥

নিতান্ত ঘরোয়া আসর হলে কিংবা কোন ছাত্রের বাড়ি তিনি কখনও কখনও টপ্পা গাইতেন। অতি চিত্তাকর্ষক হত তাঁর সুরেলা কণ্ঠে টপ্পা গান, কি হিন্দুস্থানী, কি বাংলা। শোরি মিঞা, হাম্‌দুন প্রভৃতি টপ্পা-গায়কদের ঘরানা টপ্পার সঞ্চয় তাঁর ছিল, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী এবং যাদুমণির প্রসাদে। মেজাজ হ'লে তবেই টপ্পা তিনি গাইতেন।

শোরি মিঞার সেই ভৈরবীর টপ্পাটি যখন ধরতেন—

নি মড্‌না যো কঁরুদা।
নাজক নাজ মিঞা জম্‌জম্ রে ॥
সুরক পেঁচু জরিদা শোরি-নু
আজু বন্দে দা জমক রে ॥

সে গান এমন মিষ্টি শোনাত যেন মনে হ'ত ঠুংরি গাইছেন। কিন্তু ঠুংরি নয়, রীতিমত টপ্পা।

ভৈরবীরই আর একটি চমৎকার টপ্পা তিনি এক একদিন গাইতেন, তার প্রথম লাইনটি হ'ল—

মানি লে বসন্ত্ ইয়ার রে।...

হাম্‌দুন রচিত একটি ঝিঁঝিট-খাম্বাজের টপ্পাও তাঁর গলায় শোনবার মতন বস্তু ছিল—

দিল লাগা রোঁদ ইয়্যার তঁুযে বিনা করল।
ইস্‌ক বি চৈন আপনা হেরা ফেরা ॥
সাদ কে কিচি জিন্দা ছুঁড়বে হাম্‌দুন।
ইথে তুয়ানি চল্ ফেরা ॥

আর একখানি টপ্পা গাইতেন গারা-সিন্ধুতে, তার রচয়িতার নাম জানা যায় না—

বে ছয়লা সলিকা
হাঁ জরদে ভাঁদে মাড়ু।
তাঁড়ে নয়নু দে ॥
বেখন কারণ সুরতে মহবুব
লিয়া অঙ্গ বহুত মলয়া ॥

আর একটি লুম্ ঝিঁঝিটের টপ্পা গাইতেন, তারও রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। গানখানির আরম্ভ এই রকম—

মিল্ যা যান বে।
জিন্দা তুড়া ইঁহো
ড়সা জড়না লবে ॥

হিন্দুস্থানী টপ্পার পরিপূর্ণ অঙ্গে মুর্কি জম্‌জমার কারুকর্মখচিত নিপুণ অলঙ্কারে তিনি এই সব গানে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতেন, তা শুষ্ক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়!

এক একদিন বাংলা টপ্পাও গাইতেন। বিশেষ নিধুবাবুর টপ্পা। ঝিঝিট খাম্বাজে নিধুবাবুর (কোন কোন মতে শ্রীধর কথকের রচনা) এই টপ্পাটি অপরূপ গাইতেন, জম্‌জমাগুলি যেন ফুলঝুরির ফুটন্ত ফুল্‌কির ধারায় ঝরে পড়ত—

যায় যায় চায় ফিরে সজল নয়নে।
ফিরা গো ফিরা গো তারে প্রবোধ বচনে ॥
হেরে তারে ম্রিয়মান দূরে গেল অভিমান,
অস্থির হতেছে প্রাণ প্রতি পদ পদার্পণে ॥

যেমন ওস্তাদ তেমনি যথার্থ শিল্পী ছিলেন তিনি। তাই কারুশৈলীর চাপে গানের ভাব-মাধুর্য কখনও তাঁর নষ্ট হত না, বরং তা বহুমূল্য অলঙ্কার হয়ে তার শোভা বর্ধন করত। সঙ্গীতরস সত্যই মূর্ত হত তাঁর কণ্ঠে।

ঘরোয়াভাবে অন্য রীতির গানও গাইতেন। গানই ছিল তাঁর জীবনে একমাত্র অবলম্বন, প্রাণের আরাম। তাই অন্তরের প্রেরণায় নানারকমের গান এক একদিন গাইতেন গানের ভাবের আকর্ষণে। সে সব সময় মনে হত গানের সাঙ্গীতিক প্রক্রিয়ার জন্যে নয়, তার অন্তর্নিহিত ভাবের আবেদনই উদ্‌বুদ্ধ করছে তাঁকে। যেমন একদিন তাঁর এক ছাত্রের (বিভূতিভূষণ সেন) বাড়ি একলা বসে গাইছিলেন। সে ঘরে তখন অন্য কেউ ছিল না। কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, সে তাঁর নিজেরই প্রাণের গান, তবু এমন শ্রুতিমধুর হচ্ছিল যে বড় আসরে তা সবাইকে শোনাবার মতন—

এ জগমে স... হি ভালা,
ম্যায় বুরা বহুৎ বুরা হু।...

(শেষ মোগল বাদ্‌শা বাহাদুরশাহ রচিত?) এই গানখানি তিনি গজলের ঢঙে গাইতে লাগলেন। অন্ধ গায়কের বিফল জীবনের মর্মন্তুদ অভিমান যেন গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে লাগল গানের ভাষার আর সুরের প্রতিটি মোচড়ে।...

এই শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি তাঁর বাস্তব জীবনের দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করে এনেছিলেন। এই সময় পর্যন্ত কলকাতার এখানে-সেখানে তাঁকে দেখা যেত, ছেলের হাত ধরে খালি পায়ে আস্তে আস্তে পথ চলতে। অতি মলিন বেশবাস। পায়ে জুতো পর্যন্ত রাখবার সঙ্গতি নেই। ক্লিষ্ট মুখ।

তাঁর শেষ জীবনের সেইসব দিনের কথা মনে করে তাঁর এক অনুরাগী শ্রোতা (ইনি তাঁকে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করতেন) দুঃখ করে এমন কথা বলেন, 'সাতকড়িবাবুর কথা ভাবলে মনে হয় এ দেশে যেন কেউ গান না শেখে।'

ভাগ্যের শত বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা তিনি সারা জীবনই সহ্য করেছেন, ভুলে থেকেছেন সঙ্গীতের সাধনার মধ্যে। কিন্তু এক এক সময় বোধ হয় সহ্যের সমস্ত সীমা হারিয়ে যেত, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতেন। যেমন একদিন সেই অবস্থায় তাঁর আর এক 'ছাত্রের এণ্টালির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে অধীর কণ্ঠে বলেন, 'ওরে, তোরা থাকতে কি আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব ?'

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। শিল্পীর মর্যাদা দূরের কথা, সাধারণ একটি মানুষের মতনও তাঁকে বাঁচান যায়নি। জৈব মানুষের সহ্যের একটি সীমা আছে। তাই চরম পর্যায়ে তাঁকে অবশেষে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়ে।

সেখানেই একদিন দৃষ্টিহীনের সুরজগৎ চিরকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়।

॥ রানাঘাটের কোয়েল ॥

গলায় এত অপরূপ মিষ্টতা। এমন পঞ্চম সুরে গান। আর সেই সঙ্গে রীতিমত শিক্ষিত-পটুত্ব।

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষ্য পদ্মবাবুর সম্পর্কেও বেশ প্রয়োগ করা যায়। রানাঘাটের কোকিল-কণ্ঠ পদ্মবাবু। পোশাকী নাম নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু সঙ্গীতের জগতে পদ্মবাবু নামেই অমর হয়ে আছেন। আর প্রবাদ বাক্য হয়ে আছে তাঁর অনুপম কণ্ঠ-মাধুর্যের কথা। কত জায়গার আসরে তাঁর কত গানের শ্রুতি-স্মৃতি।

কত বড় বড় ওস্তাদেরও তারিফ। ভারত বিখ্যাত সেই সব কলাবতদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তাঁর গলার আর গানের কত সমাদর। তাঁর হিন্দুস্থানী খেয়াল গান। হিন্দুস্থানী ও বাংলা টপ্পা অঙ্গের গান। পশ্চিমা গুণীদের বাংলা গান শুনিয়ে মোহিত করার কত দৃষ্টান্ত। আসরে সাড়া-জাগানো তাঁর সেই সব গানের গল্প। একসঙ্গে সাধারণ ও বোদ্ধা শ্রোতাদের রঞ্জন-করা সেই কিন্নর-কণ্ঠের কথা।...

কাশীর সেই ঘরোয়া আসরটিও তো গল্প কথার মতন হয়ে আছে। রাস্তার ধারে দোতলার ঘরে পদ্মবাবু গাইছেন। বয়স তখন্ বাইস-তেইশের বেশি নয় তাঁর। গুরু নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সামনে রয়েছেন। আর তাঁর পাশে আচার্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী। আসরে আরো শ্রোতাও আছেন।

পদ্মবাবুর গানের মেজাজ সদা প্রস্তুত। গাইতে বসলেই তাঁর গান প্রাণ পায়। জমে যায় আসর।

এখানেও তিনি প্রথমে খেয়াল গেয়ে টপ্পা ধরেছেন। আর তাঁর গানে কি উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে, তার সাক্ষ্য চক্রবর্তী মশায়। সেই প্রবীণ সঙ্গীত বিশারদ (এখনকার উপাধি নয়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে) অঘোরনাথ অশ্রুভরা চোখে পদ্মবাবুর গান শুনছেন। এক একবার চোখ মুছছেন গান শুনতে শুনতে। সেই সঙ্গে সাবাস দিচ্ছেন আর ভট্টাচার্য মশায়কে বার বার উদ্ভাসিত হয়ে জানাচ্ছেন তাঁর শিষ্যের ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল।

ঘরের মধ্যে যখন এই রকম চলেছে তখম আসরের নীচে রাস্তায় আর এক ব্যাপার। কাশীর এক প্রসিদ্ধ শানাই-বাদক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন শিষ্য। পদ্মবাবুর গান কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন ওস্তাদজী।

খানিকক্ষণ তন্ময় হয়ে শোনবার পর তিনি ওপরের মজলিসে যাবার জন্যে দরজা খুঁজতে লাগলেন। তাই দেখে তাঁকে পথ বলে দিলেন রাস্তারই আর একজন শ্রোতা। শানাইদার দোতলার আসরে এসে বসে পদ্মবাবুর বিস্তর তারিফ করলেন।

তারপর তিনি ফরমায়েশ করতে লাগলেন একটির পর একটি রাগ। আর

তাঁর কথা মতন পদ্মবাবু পর পর গেয়ে গেলেন। আসরের সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন পদ্মবাবুর ললিতকণ্ঠে সেই সব ফরমায়েশী রাগের গান। ওস্তাদজী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন—গায়ক প্রত্যেক রাগে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। রাগের রূপে কোন খুঁত নেই, অথচ এমন মাদকতা গানে। তিনি গভীর তৃপ্তি পেলেন। তারপর গান শেষ হতে অজস্র প্রশংসা করে শির-চুম্বন করলেন পদ্মবাবুকে।······

প্রায় সেই সময়েই স্বনামধন্য টপ্পা-গুণী রমজান খাঁ পদ্মবাবুর গান প্রথম শুনেছিলেন। খাঁ সাহেব সেদিন তাঁর গুরুভাই নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসে পদ্মবাবুর টপ্পা শোনেন। গান শুনে রমজান খাঁ তারিফ করলেন বিচিত্র রকমে। পদ্মবাবুর সঙ্গীত-গুরু নগেন্দ্রনাথের উদ্দেশে তিনি উচ্ছাস প্রকাশ করলেন ঃ ভাট্চায্, আপনে কেয়া বানায়া।

আর যা বললেন তার মোদ্দা কথা হল—এই পদ্মের জন্যে তামাম হিন্দুস্থান ভট্টাচার্য মশায়কে এক সেরা ওস্তাদ বলে মানবে।···

তার বেশ কয়েক বছর পরের কথা। পদ্মবাবু সেদিন ট্রেনে ফিরছেন কলকাতা থেকে রানাঘাটে।

পৌঁছতে তখনো কিছু দেরি। বিকেল গড়িয়ে গেছে। দিনের আলো কমে গিয়ে সন্ধ্যের ছায়া নামছে পুব দিগন্তে। পদ্মবাবু জানলার ধারে বসেছিলেন। কামরায় বেশি লোক নেই।

আপন মনে পদ্মবাবু গান ধরলেন। বাংলা গান। বোধ হয় গানখানি তাঁর গুরুরই রচনা। পূরবী রাগিণীর একখানি গান। পদ্মবাবু দানা-দার গলায় আরম্ভ করলেন—

দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন !

পদ্মবাবুর একটু দূরে একজন যাত্রী বসেছিলেন। শীর্ণ চেহারার এক বৃদ্ধ মুসলমান। বেশভূষায় বোঝা যায়, পশ্চিমাঞ্চলের লোক। কিন্তু চুড়িদার পাজামা, জামা কিছুই ধোপ-দুরস্ত নয়। টুপিটিও মলিন। তবে চোখ দুটি যেন কিসের ধ্যানে বিভোর।

পদ্মবাবুর গান আরম্ভ হতে সেই বৃদ্ধ একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। পদ্মবাবু গাইছেন—

দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন !
উত্তরিতে ভবনদী, করেছ কি আয়োজন ?

পশ্চিমা বৃদ্ধটির চোখে একাগ্রতার ভাব জাগল। তিনি সচকিত হয়ে শুনতে লাগলেন পদ্মবাবুর গান—

আয়ু সূর্য অস্তে যায়,
দেখিয়া দেখ না তায়,
ভুলেছ কি মোহ মায়ায়,
হারায়েছ তত্ত্ব জ্ঞান ॥

গান শেষ হবার আগেই সেই বৃদ্ধ শ্রোতা হঠাৎ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

পদ্মবাবু তদ্‌গত ছিলেন, আচম্‌কা বাধা পেয়ে গান থামালেন আশ্চর্য হয়ে।

তিনি বিরক্ত হয়ে চীৎকারের জিজ্ঞেস করতে, পশ্চিমা শ্রোতাটি জানালেন—এমন চমৎকার গানটা মাটি হয়ে গেল রাগ ভুল করে!

—রাগ ভুল? কি ভুল হয়েছে? আপনি রাগের কি জানেন?

বৃদ্ধ একটু হেসে জবাব দিলেন—থোড়া থোড়া জান্‌তা হ্যায়। পূরবীমে শুধ্‌ ধা কাহে লাগাতা?

পদ্মবাবু বুঝিয়ে বল্‌লেন—বাঙলাদেশে গানের ধারা একটু আলাদা রকম আছে। কোন কোন রাগের রূপে পশ্চিমের সঙ্গে ঠিক মেলে না। তেমনি এই পূরবীতেও শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার হয়, কোমল ধা লাগে না। তাতে খারাপ শোনায় না কিছু। আপনি শুনুন, গানটা শেষ করি—

নিজ হিত যদি চাও, তাঁহারি শরণ লও,
ভব কর্ণধার যিনি, শমন-ভয়-বারণ ॥

গান শুনে পশ্চিমা শ্রোতা বার বার আন্তরিকভাবে প্রশংসা করলেন। কিন্তু জানালেন যে, রাগটা ভুল রয়ে গেল।

পদ্মবাবু পুনরায় বল্‌লেন—বাঙলাদেশে এই রকম পূরবীরই চলন। হিন্দুস্থানী গান গাইলে আমি পূরবীতে কোমল ধৈবত দিই। কোমল ধা লাগাতে আমি জানি। আচ্ছা শুনুন—বলে একটি হিন্দী খেয়াল অঙ্গের গান গাইলেন কোমল ধৈবত ব্যবহার করে।

বৃদ্ধ এবার পঞ্চমুখে তারিফ্‌ করলেন। অপূর্ব গান হয়েছে পূরবীর। তাঁর আর কিছু অভিযোগ নেই।

পদ্মবাবু তাঁর নাম জানতে চাইলেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—বাদল খাঁর নাম জানা আছে ?

পদ্মবাবু চমৎকৃত হলেন। নিশ্চয় জানেন। গুরুদেবের মুখেই শুনেছেন কয়েকবার।

—আপনিই তাহলে বাদল খাঁ ?

—হাঁ। তোমার ওস্তাদ কে ?

নগেন্দ্রনাথের নাম শুনে বল্‌লেন—তাঁর সঙ্গে একদিন আলাপ হলে বেশ হয়। তা তুমি যদি চাও, আমার কাছেও শিখতে পারো। তোমার যা গলা তুমি সারা হিন্দুস্থানে বিখ্যাত হবে চেষ্টা করলে।

পদ্মবাবু সবিনয়ে অক্ষমতা জানালেন। তিনি কলকাতায় থাকেন না এবং দ্বিতীয় কোন গুরুর তাঁর প্রয়োজন বা ইচ্ছাও নেই। তবে তাঁর এক গুরুভাই আছেন—নগেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ভট্টাচার্য মহাশয়ের শিষ্য হলেও অন্যান্য ঘরানায় চীজ্‌ সংগ্রহের খুব ঝোঁক। তিনি শিখতে পারেন। চাকুরি সূত্রে তিনি বাসও করেন কলকাতায়।

ওস্তাদ বাদল খাঁর সঙ্গে এই ভাবে পদ্মবাবুর আলাপ পরিচয়ের পর দত্ত নগেন্দ্রনাথ খাঁ সাহেবেরও শিষ্য হয়েছিলেন। আর খাঁ সাহেবের আগ্রহের জন্যে তাঁর সঙ্গে ভট্টাচার্য মশায়ের সাক্ষাৎকারও ঘটিয়ে দেন পদ্মবাবু।

বাদল খাঁ তখন নগেন্দ্রনাথ (ভট্টাচার্য)-কে অভিনন্দন জানান পদ্মবাবুর মতন শিষ্য তৈরি করবার জন্যে। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি নগেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করে এইরকম বলেন—অন্য ওস্তাদের দশজন শিষ্যের সমান আপনার এই এক শিষ্য (পদ্মবাবু)। শিষ্য তৈরি করতে হলে এমনি করাই উচিত। আপনার দরদকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দরদ ছাড়া এরকম শিষ্য হতে পারে না। আপনার পরে এই পদ্ম আপনার নাম বাঁচিয়ে রাখবে।...

রানাঘাটের পাল-চৌধুরীদের বাড়িতে তখনো অনেক বড় বড় মজ্‌লিস বসত। আর সেখানে গাইবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে, যেতেন পদ্মবাবু। কখনো গুরুর সঙ্গে, কখনো একা।

সেবার পূর্ণিমা সম্মিলনীর বড় আসর সেখানে। কোজাগরী পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ বার্ষিক অনুষ্ঠান। অনেক নামকরা ওস্তাদ আর বাঈজীদের আগমন হয়েছে পাল-চৌধুরীদের এই জল্‌সায়। তাঁদের মধ্যে একজন বাঈজীর নাম দিল্‌জান।

পশ্চিমা এই নটী সে সময় নৃত্য ও গীত দুয়েই অতি প্রসিদ্ধা। রানাঘাটের এই দরবারে দিল্‌জান অনেকবার মুজ্‌রো করে গেছেন। আর সেই সূত্রে তাঁর কাছে সঙ্গীত-বিষয়ে উপকৃত হয়েছেন বামাচরণ ভট্টাচার্য—'শিল্পী বড়' অধ্যায়ে যাঁর সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দিল্‌জানের কাছে বামাচরণ যখন সংগ্রহ করতেন তখন দিল্‌জানের প্রথম জীবন। কিন্তু যে ঘটনার বিবরণ এখন দেওয়া হবে সে সময় দিল্‌জান পরিণত বয়স্কা।...

পদ্মবাবুর সঙ্গীত-জীবনের প্রথম দিকের কথা।

পূর্ণিমা সম্মিলনীর সেই আসর সন্ধ্যার পরে শুরু হয়ে তখন বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলছে। অনেকের গান হয়েছে, অনেকের তখনো বাকি। তখন জলসায় খানিক বিরতির সময়। ওস্তাদ ও বাঈজীরা ভেতরের ঘরে আহার করতে গেছেন।

আসরে আছেন পদ্মবাবু। তাঁর তখন গাইবার কথা নয়। কিন্তু শ্রোতারা তাঁকে দেখে ছাড়লেন না। তাঁদের অনুরোধে গান আরম্ভ করলেন পদ্মবাবু।

আসর ছাপিয়ে তাঁর গলা শোনা যেতে লাগল ভেতরের সেই ঘরে যেখানে পশ্চিমা শিল্পীরা আহারে বসেছিলেন।

অন্য সকলের সঙ্গে দিল্‌জানও শুনতে লাগলেন পদ্মবাবুর অপরূপ কণ্ঠের সুর। কিন্তু সবার মধ্যে একটি জিনিসের প্রতিক্রিয়া একইরকম হয় না। দিল্‌জানের মনেও পদ্মবাবুর এই গানের প্রভাব হল ভিন্ন প্রকার।

তাই দেখা গেল, আহার সেরে নিয়ে অন্য সকলে আসরে ফিরে এলেন। পদ্মবাবুর গান শেষ হয়ে গেছে আগেই। কিন্তু দিল্‌জান তখনো সেই খাবার ঘরে বসে। আসরে তাঁকে আসতে না দেখে তাঁকে ডাকতে যাওয়া হল।

—আপনি এবার আসুন। পদ্মবাবর গান শেষ হয়েছে।

আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন দিল্‌জান। আহারের পরে হাত পর্যন্ত ধুতে যাননি, দেখা গেল। যিনি ডাকতে গিয়েছিলেন তাঁর কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন দিল্‌জান। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ও গান শেষ হয়ে গেছে? আমার মনে হচ্ছিল, এখনো গান চলেছে।

পদ্মবাবুর মধুকণ্ঠ থেমে গেলেও বো!॰ স্য় তাঁর সৃষ্ট সুরের স্পন্দন পরিপূর্ণ রেখেছিল দিল্‌জানের চৈতন্য মণ্ডল।

পদ্মবাবুর গানের এমনি সব গল্প ছড়িয়ে আছে। সব সংগ্রহ করা যায় না। শৌখীন অর্থাৎ অপেশাদাব গায়ক ছিলেন তিনি। কিন্তু গানের জন্যে কম

নামও ছড়ায়নি। যে আসরে একবার গেয়েছেন, সাড়া পড়ে গেছে। দ্বিতীয়বার সেখানে গানের সময় মুখে মুখে রটে যেত তাঁর কথা আর আসর ভরে যেত শ্রোতার ভিড়ে। ঘর ভেঙ্গে পড়া, আসর ভেঙ্গে পড়া এমনি একটা কথা আছে। তেমনি একটি ব্যাপার সত্যিই ঘটেছিল পদ্মবাবুর গানের উপলক্ষে।

তেলিনীপাড়ার কালোবাবুর বাড়ির ঘটনা।

চন্দননগর-তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জিতেন্দ্রনাথ অর্থাৎ কালোবাবু নিজে একজন সেরা টপ্পা গাইয়ে ছিলেন। রমজান খাঁর অতি উপযুক্ত শিষ্য তিনি। তাঁর মতন মিষ্টি গলাও সেকালে কম শোনা যেত।

বাড়িতে প্রায়ই গান বাজনার আসর বসাতেন কালোবাবু। পদ্মবাবুর তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং পদ্মবাবুও এবাড়ির আসরে মাঝে মাঝে গেয়ে গেছেন। এ অঞ্চলে যাঁরা গেন ভালবাসেন তাঁদের মধ্যে অসামান্য জনপ্রিয় হয়ে পড়েন পদ্মবাবু। তাঁর গান কালোবাবুর বাড়িতে শেষ যে-বার হয়, এটি তখনকার ঘটনা।

সে আসরের অনেক দিন পরেও কালোবাবু সঙ্গীত জগতের লোকদের কাছে কথাটা শোনাতেন। বাড়ির এদিকের পাঁচিল খানিকটা ভাঙ্গা। আঙুল তুলে সে জায়গাটা দেখিয়ে কালোবাবু বলতেন—সেবার পদ্মবাবুর গান হল আসরে। গান শোনবার জন্যে এত ভিড় বাড়তে লাগল যে লোকের চাপে ওই পাঁচিলটা ভেঙ্গে পড়ল। ওখানটা অমনিই রেখে দিয়েছি, মেরামত করাইনি। ভাঙ্গা পাঁচিলটা থাক—পদ্মবাবুর গানের কথা মনে পড়বে।

রানাঘাট স্টেশনের একদিনের ঘটনা।

দিনের বেলা। একটি আপ-ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

পদ্মবাবু কোথায় যাবেন বলে স্টেশনে এসেছেন। কিন্তু তখনো তাঁর গাড়ি আসতে কিছু দেরি। স্টেশন মাষ্টার দেখতে পেয়ে তাঁকে পাকড়াও করে নিজের আফিস ঘরে নিয়ে এসেছেন। গান গাইবার জন্যে ধরেছেন। গান গাইতে বললে কখনো 'না' বলতে জানেন না পদ্মবাবু। তাই স্টেশন মাষ্টারের ঘরে গান আরম্ভ করে দিয়েছেন।

এখন যে ট্রেনটা এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল তাতে ছিলেন নাটোর রাজ-

জগদিন্দ্রনাথ রায়। সঙ্গীতজ্ঞ এবং নানা গুণে গুণী জগদিন্দ্রনাথের পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার নেই। 'সঙ্গীতের আসরে'-র অনেক জায়গায় তাঁর সঙ্গীত-প্রসঙ্গ বর্ণনা করা আছে।

রানাঘাট স্টেশনে ট্রেন থামবার একটু পরেই তাঁর বিশিষ্ট কামরায় বসে জগদিন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন এক আশ্চর্য কণ্ঠের গান। কিছুক্ষণ গাড়িতে বসেই উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন। তারপর আর গাড়িতে বসে তৃপ্তি পেলেন না। বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ তিনি। বেশ বুঝতে পারলেন—শুধু সুমিষ্ট নয়, এ কোন সঙ্গীত-সাধকের কণ্ঠ। গায়কের নিকটস্থ হবার জন্যে তিনি ট্রেনের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে স্টেশন মাস্টারের ঘরে উপস্থিত হলেন। এবং সেখানে বসেই শুনতে লাগলেন পদ্মবাবুর গান।

এদিকে সময় কতক্ষণ কেটে গেছে সেদিকে তাঁদের কারুর খেয়াল নেই। জগদিন্দ্রনাথের ট্রেনটা লেট হয়ে গেল। স্টেশন মাস্টারের খেয়াল ছিল ঠিকই। কিন্তু নাটোরের মহারাজার প্রতি সম্ভ্রম বশত তিনি তাঁকে কিছু বলতে পারছিলেন না। আর তাঁকে এই অবস্থায় বসিয়ে রেখে ট্রেনটাকে চলে যাবার ব্যবস্থা করতেও সঙ্কুচিত বোধ করছিলেন বেচারা। ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা। সুতরাং সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা বিশেষ আশ্চর্যের নয়। সে যুগে এমন কাণ্ড ঘটত।

শেষ পর্যন্ত পদ্মবাবু গান থামালেন এবং স্টেশন মাস্টার সঙ্কটমুক্ত হলেন। ট্রেনে ফিরে এলেন জগদিন্দ্রনাথ। তারপর চল্‌ল গাড়ি।......

পদ্মবাবুর গুরু নগেন্দ্রনাথের গানের আসর বেশি হত গোবরডাঙার মুখুজ্যে-বাড়িতে, নাটোর রাজ-বাড়িতে, পাল-চৌধুরীদের বাড়িতে অথবা মুক্তাগাছায়। সেবার তাঁর মুক্তাগাছায় গাইতে যাবার কথা।

কিন্তু তিনি কি কারণে যেতে পারলেন না। পদ্মবাবুকে পাঠালেন সে আসরে গাইতে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়, রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর বাড়ির জলসায়।

জগৎকিশোর শুধু সঙ্গীতপ্রেমী নয়, স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞও। তাঁর দরবারে নানা সময়ে হিন্দুস্থানের অনেক গুণীর গান-বাজনা হয়েছে। রানাঘাটের সঙ্গীতাচার্যেরও অসংখ্য আসর বসেছে এখানে। কারণ জগৎকিশোরের সুহৃদ তিনি, গোবরডাঙার জ্ঞানদাপ্রসন্নের মতন। এই তিনজনকে এ

অঞ্চলের সঙ্গীত জগতের ত্রয়ী বলা যায়। অনেক দিনের অনেক আসরের কাহিনী এই ত্রয়ীর কথায় প্রচলিত আছে। তেমনি মুক্তাগাছার নানা আসরের গল্প। সেসব কথায় এখানে কায নেই। এখানে শুধু বলে রাখা যায় যে, পুত্র জিতেন্দ্রকিশোরের সঙ্গীতশিক্ষার জন্যে প্রসিদ্ধা শ্রীজান বাঈকে জগৎকিশোর দীর্ঘকাল নিযুক্তা রেখেছিলেন।

সেবার নগেন্দ্রনাথের বদলে মুক্তাগাছার আসরে গান শুনিয়ে পদ্মবাবু যথাসময়ে ফিরে এলেন। গুরুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন রানাঘাটে এসেই। সঙ্গে এক ছড়া সোনার হার আর এক গাছা পৈতে। মুক্তাগাছার মজ্‌লিসে পাওয়া দুটি উপহার।

সেখানে পদ্মবাবুর গান শুনে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এক বয়স্ক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলেন—বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ। তোমার এই অপূর্ব গানের কিছু পুরস্কার না দিয়ে পারছি না। কিন্তু আমার আর কোন সম্বল নেই তোমাকে উপহার দেবার। শুধু এই পৈতেটি আছে। এটিই তোমাকে দিলুম। আসল ব্রাহ্মণত্বই তোমায় দিলুম। আর আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও।...

সোনার হারটি উপহার দেন জগৎকিশোর নিজে। পদ্মবাবু তাই হার ছড়া গুরুকে প্রণামী দিতে নিয়ে এসেছেন। এ তো গুরুরই প্রাপ্য।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ কিছুতেই সে হার নেবেন না। আর পদ্মবাবুও ছাড়ছেন না। কোন মীমাংসা হচ্ছে না দুজনের মধ্যে।

এই অবস্থা দেখে নগেন্দ্রনাথের এক দৌহিত্র বললে—আপনাদের কেউ যখন হারটা নিতে চাইছেন না, তখন ওটা আমি নিই।'

পদ্মবাবু হাসতে হাসতে তাকে হারটি দিলেন। ভট্টাচার্য মশায়ও আর আপত্তি করতে পারলেন না।...

আচার্য নগেন্দ্রনাথ রানাঘাটে যে সঙ্গীত সম্প্রদায় গড়ে তোলেন, পদ্মবাবুই তার মধ্যমণি। সহজাত তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা। সুললিত কণ্ঠও স্বভাবদত্ত। পরে সেই সঙ্গে যুক্ত হয় আদর্শ গুরুর নির্দেশ এবং নিজের ঐকান্তিক সাধনা।

রানাঘাটেরই সন্তান নির্মলচন্দ্র। ছেলেবেলা থেকেই গান গাইতে ভালবাসতেন আর বড় মিষ্টি গলা। একটু বড় হতে ক্রমে পাড়া-প্রতিবাসী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রানাঘাটবাসীদের মধ্যে তাঁর গানের খ্যাতি রটে

যায়। যে শোনে সেই মুগ্ধ হয় তাঁর গানে।

রানাঘাট অঞ্চলে শখের থিয়েটারে, যাত্রায় তিনি অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। তাঁকে না পেলে সেসবের আসর জমে না। তাঁর এই সব গানই শুনে শুনে শেখা। আঠার-উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবে চলে।

তারপর নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন নগেন্দ্রনাথ ভট্টাযার্যের অধীনে। এর আগে বা পরে অন্য কোন গুরু নির্মলচন্দ্রের ছিল না। নগেন্দ্রনাথের শিষ্য হয়ে তিনি রীতিমত কণ্ঠ-চর্চা করতে থাকেন। গুরুও তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে শিক্ষা দেন মন প্রাণ ঢেলে।

এমনিভাবে স্বভাবসিদ্ধ শক্তিতে, সাধনায় ও উপযুক্ত শিক্ষালাভের ফলে পদ্মবাবু গুণী গায়ক হয়ে সঙ্গীত-সমাজে সম্মানের স্থান করে নেন। সঙ্গীত জগতে রানাঘাটের দ্বিতীয় গৌরব বলে নাম হয় তাঁর। গুরুর সঙ্গে কলকাতা ও অন্যান্য অসংখ্য আসরে গুণপনার স্বীকৃতি লাভ করেন।

কিন্তু, সেকালের অধিকাংশ হিন্দু গুণীর মতন, সঙ্গীতচর্চাকে উপার্জনের বৃত্তি হিসেবে নেননি, যদিও সঙ্গীত অধিকার করেছিল তাঁর সমগ্র সত্তা। সে যুগের আদর্শে—জীবিকার সঙ্গে শিল্পের সংস্পর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলতেন, নিজের গুরুরই মতন।

একটি সোনা-রূপার দোকান তাঁর রানাঘাটে ছিল। সেইটিই অর্থকরী কায। সোনা কিনতে মাসে তিন-চার বার কলকাতায় আসতেন। সোনা কেনার সূত্রে সেদিন কলকাতা থেকে ফেরবার সময়েই বাদল খাঁর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ।

গুরুর সঙ্গে অনেক আসরেই যোগ দিতে যেতেন। যখন রানাঘাটে থাকতেন, দিনলিপি তাঁর ছিল অনেকটা এই রকম ঃ—

অতি প্রত্যুষে উঠে কুস্তী করতেন। শরীর ছিল ব্যায়াম-বলিষ্ঠ। শরীর-চর্চার পর চূর্ণি নদীতে স্নান করে আসতেন। তারপর উপস্থিত হতেন গুরুর বাড়িতে। এখানেই জলযোগ সমাধা করে সঙ্গীত-চর্চা চলত।

ঘণ্টা দুয়েক গানের পর দোকানে যেতেন কাযকর্ম দেখতে। দোকান থেকে বেলায় বেরিয়ে মিষ্টান্নের দোকানে আর এক বার ভালরকম জলযোগ। অমিতাহারী ছিলেন। একসের দেড়সের রসগোল্লা পান্তোয়া নেহাৎই জলখাবার। তাঁকে সে সময় আসতে দেখলেই মিষ্টির দোকানদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব জাগত কে আজ পদ্মবাবুকে নিজের দোকানে বসাতে পারে।

এই পর্বের শেষে চূর্নি নদীতে আর এক দফা স্নান। তারপর বাড়ি ফিরে আহার ও বিশ্রাম। বিকালে একবার নিজের দোকান থেকে ঘুরে এসে সন্ধ্যার পর পুনরায় গুরুগৃহে। সেখানে সন্ধ্যার পরে থেকে রাত পর্যন্ত সঙ্গীতের আসর। শ্রোতাদের জন্যে সেখানে অবারিত দ্বার।

এমনি করে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে দিন চলে যেত।

জীবনের শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ছিলেন গুরুর কাছে। নগেন্দ্রনাথের যেমন অফুরন্ত সঞ্চয় ও অকৃপণ স্নেহের দান, শিষ্যেরও তেমনি গ্রহণ শক্তি। আসরের পর আসরে যখন পদ্মবাবু গানে মাতিয়ে তুলছেন তখনো গুরুর কাছে তেমনি সবিনয়ে নিয়মিত সঙ্গীত-চর্চা। সেই সঙ্গে পরম নিরহঙ্কার গানের বিষয়ে।

এর জনপ্রিয় গায়ক হলেও যে-কোন লোক যে-কোন সময়ে গান শুনতে চাইলেই শুনিয়েছেন। আর যখনি গাইতে বসেছেন তখনি তাঁর গানের মেজাজ। যে গান গেয়েছেন তাইতেই মুগ্ধ হয়েছেন শ্রোতারা। সাধারণ এবং বিদগ্ধ, সকলেই। বাঙলা গান শুনিয়েও ভাল ভাল আসর মাৎ করেছেন। তাঁর কণ্ঠের-নিমেষের দেখা যদি পাই তোমারি 'টপ্পা অঙ্গের' এই গানখানি পরিতৃপ্ত করেছে অসংখ্য শ্রোতাদের। অনেক বড় বড় গায়ক এমন কি মুসলমান ওস্তাদকে পর্যন্ত পদ্মবাবুর মুখে গানটি শোনবার ফরমায়েশ করতে শোনা গেছে। তাঁর আসরে বাঙলা গানের কথা উঠলেই ফরমায়েশী গান হত 'নিমেষের দেখা যদি পাই তোমারি'। এমন এক সময় ছিল।

তিনি যদি উত্তর ভারতের নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনগুলিতে যোগ দিতে পারতেন আর পরিণত আয়ু পেতেন তাহলে নাম রেখে যেতে পারতেন হিন্দুস্থানের সঙ্গীত-জগতে। কিন্তু তার কিছুই হয়নি।

পদ্মবাবুর একরকম অকাল-মৃত্যু হয়েছিল, বলা যায়। কারণ মৃত্যুর সময়ের বয়স হয় মাত্র ৪৫ বছর।

তাঁর মৃত্যু আরো বেশি দুঃখের এই কারণে যে, উপলক্ষটা সামান্য ছিল। ছিপে মাছ ধরছিলেন। একটা ভারী মাছকে টেনে তুলতে গেলে মাছটা বেরিয়ে যায় আর ছিপের বঁড়শি ঘুরে এসে বিঁধে যায় পদ্মবাবুর পিঠে। বঁড়শিটা বার করে নেওয়া হল, কিন্তু আর কোন চিকিৎসার প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। আপাত নিরাময়তার আড়ালে ক্ষতি হয়ে যেতে লাগল অপূরণীয়।

তার ওপর আর এক উপলক্ষ ঘটল। তার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি নিমন্ত্রিত হলেন শান্তিপুরে। শরীরের একটা অসুস্থতা বোধ হচ্ছিল, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করলেন না। আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ট্রেনে গেলেন শান্তিপুর।

সঙ্গীদের অনুরোধে ট্রেনে বরাবর গান গাইতে গাইতে চললেন। তারপর শান্তিপুরে ভূরি ভোজন করে সেই রাত্রের গাড়িতেই ফিরলেন রানাঘাট। ফেরবার ট্রেনেও সকলের কথায় আগাগোড়া গানে গানে মাতিয়ে রাখলেন।

বাড়ি পৌঁছবার পরই প্রকট হল সর্বনাশ। একদিকের অঙ্গ সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেল। আর কয়েকদিন পরেই মৃত্যু। (তাঁর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় গুরু নগেন্দ্রনাথের আকস্মিক দেহত্যাগের কথা যথাস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে।)

পদ্মবাবুর অকালে মৃত্যু তাঁর পরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ মহলের বুকে কিভাবে বেজেছিল তার একটি চিহ্ন রেখে গেছেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত। পদ্মবাবু ভিন্ন নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সব চেয়ে কৃতী শিষ্য বোধহয় দত্ত নগেন্দ্রনাথ। তাঁর কথাও ভট্টাচার্য মহাশয়ের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এখানে শুধু যোগ করা হবে যে, গুরুভাই হলেও পদ্মবাবুর মধুকণ্ঠের জন্যে তাঁর প্রতি একটু অসূয়ার ভাব ছিল দত্ত নগেন্দ্রনাথের মনে। একথা উল্লেখের কারণ—পদ্মবাবুর মৃত্যুতে দত্ত নগেন্দ্রনাথের এই শোক গাথা যে অতি আন্তরিক তা ধারণা কর।

দত্ত নগেন্দ্রনাথ কোনদিন লেখক ছিলেন না। তিনি সারা জীবন সঙ্গীতের চর্চায় কাটিয়েছিলেন। তবু পদ্মবাবুর মৃত্যু-শোকে তাঁর অন্তরের আবেগ প্রকাশ করেন একটি রচনায়। 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা পাত্রিকা'য় [গুরুভাই কিন্নরকণ্ঠ পদ্মবাবু (নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) (১৮৮৮-১৯৩৩ খ্রীঃ) ১৩৩৯, মাঘ] প্রকাশিত সেই লেখাটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্‌ধৃত করে পদ্মবাবুর কথা সমাপ্ত করা হল :

'স্মৃতি তর্পণ'

বসন্ত তো বরষে বরষে আসে—ধরণীর বুকে অজস্র আর শোভা আনন্দ বিলিয়ে দেয়; কিন্তু যে কোকিল এই বসন্তকে মূর্ত করে তোলে—সে কোথায়?

কোন্ সুরসভায় তার ডাক এসেচে! অপমানাহতা উর্বশী নন্দনের বনে কেঁদে ফিরছে! জয়মাল্য পারিজাতের মালা কার কণ্ঠলগ্ন? মুখর সুর-সভা স্তব্ধ আকুল—তৃপ্ত!...

মর্তের সুর-রসিকদের কানে যে মধুর ঝঙ্কার সে ঢেলে দিয়েছিল, আজ তারও রেশ সহস্র শব্দ বিক্ষোভেও কানে আসে—নিমেষের দেখা যদি পাই তোমারি।

বন্ধু, আজ গান গাইতে গিয়ে তোমাকেই মনে পড়ে—কণ্ঠে সুর বেসুরো হয়ে ওঠে। তোমার সুরে আমার সুর দিক হারা হয়ে কেঁদে মরে।

স্বাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত।'

॥ বিদায়, ধ্রুপদ ॥

কলকাতার আসর থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের মূল রীতি যখন চলে যাচ্ছিল, তখনকার গল্প। ধ্রুপদ গান এবং এক মহান ধ্রুপদীর বিদায় নেবার কাহিনী। আজ থেকে প্রায় ৩৫।৪০ বছর আগেকার কথা। দু'টি ব্যাপার প্রায় একই সঙ্গে ঘটেছিল, সামান্য আগে পরে। আর তাদের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

কলকাতার সঙ্গীতচর্চায় তখন একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা লক্ষ্য করবার মতন দেখা যাচ্ছিল—ধ্রুপদ গানের আসর আর জনপ্রিয় থাকছে না। ধ্রুপদের আসর শুধু জমছে না, তাই নয়। ধ্রুপদ আর শ্রোতাদের প্রাণে সাড়া জাগতে পারছে না, আকর্ষণ করা দূরের কথা। ধ্রুপদ আর সত্যি বলতে কি, সাধারণ লোকের ভাল লাগছে না। দেশের শ্রেষ্ঠ গায়করা গাইলেও, না। যে ধ্রুপদীর উদাত্ত মধুর কণ্ঠের গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসরে চলেছে আর সকলে একাগ্রচিত্তে শুনেছে মন্ত্রমুগ্ধের মতন, তাঁর গানও লোকে আর এখন পছন্দ করছে না, যদিও তাঁর সঙ্গীতের মান এতটুকুও নেমে যায়নি। আর তিনি অভিমানে সঙ্গীত-জগৎ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দূরে, নিভৃত লোকে। অগণিত শ্রোতার পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল আসর থেকে পল্লীগ্রামের অবসর জীবনে। তাঁর এককালের অসংখ্য গুণগ্রাহীদের পক্ষ থেকে তাঁকে আসরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে এখন আর কোন আগ্রহ নেই!

একটার পর একটা ধ্রুপদের আসর বসছে আর ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—কখনও শ্রোতাদের অভাবে, কখনও বা শ্রোতাদের সহানুভূতির অভাবে'। অথচ ধ্রুপদীদের মধ্যে, তখনও এমন কয়েকজন ছিলেন, শ্রেষ্ঠ গায়কদের মধ্যে যাঁরা গণ্য হবার যোগ্য। রাগবিদ্যায়, পরিপাটি পরিবেশনে এবং কণ্ঠ-সম্পদে।

তবু কলকাতার সঙ্গীতাকাশ থেকে ধ্রুপদের ভাগ্য অস্তাচলে নেমে যাচ্ছিল। আর ধ্রুপদীরা জনপ্রিয়তা হারিয়ে, অবসৃত হয়ে চলেছিলেন সঙ্গীত জগৎ থেকে। বলতে গেলে, কলকাতা থেকে বিদায় নেওয়া মানে আমাদের সঙ্গীত-ক্ষেত্রের এক রকম শ্রেষ্ঠ মঞ্চ (platform) থেকেই বিদায় নেওয়া। কারণ (ক্যাল্‌কেশিয়ান অপবাদ পাবার আশঙ্কা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে) আধুনিক কালে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে বাঙলার সংস্কৃতি-চর্চার অন্যান্য অঙ্গের মতন সঙ্গীতেরও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হল কলকাতা।

যে প্রক্রিয়া সমগ্র দেশে দেখা দেবে তার পূর্বাভাস অনেক সময় কলকাতাতেই দৃশ্য হয়। আর কলকাতায় যা ঘটে, অচিরকালে তা বিস্তৃত হয় দেশের অন্যান্য অংশে। কলকাতায় যা' সম্মান পায়, পরে তা পেয়ে থাকে অন্যত্র। কলকাতার যা জনপ্রিয়তা হারায় অন্যসব কেন্দ্রেও তার যশোভাগ্য অনেক সময় মন্দ হয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক জগতের অনেক ব্যাপারের মতন ধ্রুপদের বেলাও এই রকম দেখা গেল।

কয়েক বছর আগে থেকেই হয়ত এই প্রক্রিয়া সঙ্গীতক্ষেত্রের অন্তঃস্থলে চলেছিল। কিন্তু তা প্রকট হয়ে উঠল এই সময়ে, ১৯৩২/৩৩/৩৪ সালে। পর পর কয়েকটি আসরে তখন লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল যে, ধ্রুপদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখন কলকাতা থেকে বিদায় নেবে, ক্রমে অন্যান্য জায়গার আসর থেকেও। কিংবা হয়ত অন্যান্য আসর থেকে বিদায় নিয়েছে, এখন কলকাতার আনুষ্ঠানিকভাবে তার মৃত্যু ঘোষিত হবে। গানের আসরে ধ্রুপদের দিন ফুরিয়েছে।

ধ্রুপদ গান যে তারপর থেকে কলকাতায় একেবারে লোপ পেয়ে যায় তা নয়। প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে তখনও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী কলকাতার আসরে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান করতেন বটে। কিন্তু তা হত খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত ভাবে। কখনও হয়ত অন্যান্য রীতির গানের আগে মুখপাত হিসেবে হত। কখনও নিতান্ত ঘরোয়া আসর বসত কোন অনুরাগী বা শিষ্যের বাড়িতে।

সাধারণের জন্যে কোন বিরাট আসরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ধ্রুপদ গান অর্থাৎ ধ্রুপদের জন্যে প্রকাশ্য ও প্রধান আসর আর বিশেষ দেখা যেত না। সঙ্গীত-জগতে ধ্রুপদের যে প্রাধান্য ও মর্যাদার আসন এই সময়ের কয়েক বছর আগে পর্যন্তও ছিল, তা রীতিমত টলে যায় আর তা ফুটে ওঠে এই সময়কার কয়েকটি আসরের ঘটনায়।

আসরের সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে ধ্রুপদ গানে যেমন অনীহা থাকে, তেমনি অন্যান্য কয়েকটি কারণও যুক্ত হয়ে যায় এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে। তা হল, নেতৃস্থানীয় কিংবা জনপ্রিয় বেশ কয়েকজন ধ্রুপদগুণীর ইহজগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ, ধ্রুপদের সম্মেলন আর আসরের সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি।

যে সময়টির উল্লেখ করা হয়েছে তার কয়েক বছর আগে থেকে এবং কিছু পরে পর্যন্ত এই কার্য-কারণ সূত্রটি লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি নতুন ধারা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করতে যে সময় লাগে, কিছু লুপ্ত হতে গেলেও তেমনি। একটি দেশের একটি ঘটনায় হঠাৎ কোন বড় পরিবর্তন ঘটে যায় না। দৃশ্য বা অদৃশ্য হয়ে নানা উপলক্ষ্য ও ঘটনা কার্য করতে থাকে একটি প্রক্রিয়ার মূলে। তারপর ফল যখন ঘটে, তখন সকলে সচকিত হয়ে জানতে পারে। ধ্রুপদের অবলুপ্তির এই ব্যাপারটিও অনেকেরই অলক্ষ্যে চলেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে।

সকলের চোখে পড়ে অবশ্য ওই সময়টিতে। ক'জন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীর জীবনাবসানের কথা বলা হয়েছে, তা ওই সময়ের ১২।১৪ বছর আগে থেকে ঘটতে থাকে। রাধিকাপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং অতি মাধুর্যময় কণ্ঠসম্পদের অধিকারী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও, আচার্য রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী, অমৃতকণ্ঠ আশুতোষ রায়, স্বনামধন্য লছমীপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি দশ বছরের মধ্যে (১৯১৯-২৯) বিদায় নিলেন এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করে।

প্রায় এই সময়েই বন্ধ হয়ে যায় বিখ্যাত বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন—'শঙ্কর উৎসব।' পাখোয়াজ-গুণী দীননাথ হাজরা, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা উদ্‌যোগ করতেন বলে 'শঙ্কর উৎসবে'র কয়েক বছরের আসরগুলিতে ধ্রুপদের মুখ্য স্থান থাকত। এই উৎসব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাঙলায় ধ্রুপদীদের একটি বড় আসর উঠে যায় কলকাতা থেকে।

তারপর লালচাঁদ উৎসবের নামও করা যায়। লালচাঁদ বড়াল মশায়ের তিন পুত্র কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ ও রাইচাঁদ তাঁদের পিতার স্মৃতিরক্ষার জন্যে এই নামে যে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করতেন, তার তিন দিনের অধিবেশনের মধ্যে প্রথমটি নির্দিষ্ট থাকত ধ্রুপদের জন্যে। বাকি দু'দিন হত খেয়াল, ঠুংরি ইত্যাদি। লালচাঁদ উৎসব আসলে ছিল উচ্চ মানের নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের তুল্য এবং কলকাতার পরবর্তীকালের পেশাদার

নিখিল ভারত সম্মেলনগুলির অপেশাদার পথ-প্রদর্শক।

এই উৎসবের ধ্রুপদের আসরে বাঙলা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীরা গান শুনিয়ে গেছেন। লালচাঁদ উৎসব বন্ধ হয়ে যায় ঠিক ওই সময়টিতে, যখন একটির পর একটি সাধারণ আসরে শোনা যেতে থাকে ধ্রুপদ ও ধ্রুপদীদের পূরবীর মূর্ছনা।

তার অব্যবহিত পরের কথাও একটু বলা যায়। পরের কয়েক বছরের মধ্যেই বিদায় নেন অন্ধ-গুণী নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, মধুকণ্ঠধ্রুপদী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদাচার্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এক অমৃতকণ্ঠ ধ্রুপদগায়ক ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কম্বু অথচ ললিতকণ্ঠ ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহলোকের আসর থেকে। আর বিদায় নেন মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য।

দুর্লভচন্দ্র শুধু ধ্রুপদ-সঙ্গীতের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার ছিলেন না। তিনি কলকাতায় ধ্রুপদ গানের আসরের একজন মহৎ সংগঠক। তাঁর সংগঠিত 'মুরারি সম্মেলন' কলকাতা তথা বাঙলায় ধ্রুপদ-সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখতে অনেক সহায়তা করে। তা ছাড়া তিনি তাঁর বিরাট মৃদঙ্গী শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে তিনি স্বয়ং এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হন এবং সেই প্রতিষ্ঠান ধ্রুপদ নির্ভর। সুতরাং ধ্রুপদ গায়কদের সঙ্গে ধ্রুপদের সঙ্গতকারের মৃত্যুও প্রায় তুল্যমূল্য।

ধ্রুপদীদের অবর্তমানে যে ক্ষতি হোল তাও পূর্ণ হবার নয়। আবার সেই সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের মৃত্যুতে সঙ্গীতের মহা অভাব শুধু নয়, সুদীর্ঘ ৩০ বছরের অধিককালের বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনেরও মৃত্যু ঘটল। তাঁর গুরু মুরারিমোহন গুপ্তের স্মৃতিতে দুর্লভচন্দ্র কয়েকদিন ব্যাপী যে মুরারি সম্মেলনের আয়োজন প্রতি বছর করতেন তার মধ্যে বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই হত ধ্রুপদ।

বাঙলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীরা তো তাতে যোগ দিতেনই, বাঙলার বাইরে থেকেও কোন কোন ধ্রুপদী মাঝে মাঝে সেসব আসরে অংশ নিয়েছেন।

মুরারি সম্মেলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শঙ্কর উৎসব বা লালাচঁদ উৎসবের চেয়ে ধ্রুপদের বিষয়ে ক্ষতি হোল বেশি। কারণ এতকাল ধরে অনুষ্ঠানের ফলে এই সম্মেলনের কল্যাণে কলকাতার ধ্রুপদের আসরের একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল।

উত্তর কলকাতার শিবনারায়ণ দাস লেনে দুর্লভচন্দ্রের বাড়ির কাছেই দুটি রাস্তার মোড়ে বিরাট মণ্ডপ তৈরী করে বসত সম্মেলনের আসর। সারা রাত

ধরে গান-বাজনা চল্‌ত। উচ্চশ্রেণীর গান শুনত সাধারণ শ্রেণীর শ্রোতারা।

সে মঞ্চ যখন ভেঙ্গে গেল, ধ্রুপদচর্চার যে ক্ষতি হোল তা বেশি করে বল্‌বার নেই।

এমনি সব ঘটনা-পরম্পরা একটি বিস্তৃত পটভূমি রচনা করেছিল প্রায় দু'যুগ ধরে। আর সেই সঘন পশ্চাৎপটে একটি বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়ে চলেছিল—ধ্রুপদ বিদায়।

তার কেন্দ্রীয় দৃশ্যাবলী যা নাটকটিকে অনিবার্য ট্রাজেডির দিকে চালনা করছিল—দেখা যায় ১৯৩২, ৩৩, ৩৪ সালের কয়েকটি আসরে।

তাদেরই কিছু বিবরণ এবার দেওয়া যাক।

প্রথমটি ছাত্রদের সভা। কোন কলেজের বার্ষিক মিলন কিংবা ওই রকম কোন উপলক্ষে ছাত্রেরা তার আয়োজন করেছিল। ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়। মধ্য কলকাতার কোন সভা-গৃহ।

তরুণদের সেই আনন্দ-সম্মিলনীতে প্রধান অনুষ্ঠান ছিল সঙ্গীত। আর সেজন্যে তখনকার খ্যাতনামা গুণী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। তিনি ধ্রুপদী, সুতরাং ধ্রুপদ গাইবেন জেনেই নিয়ে আনা হয় তাঁকে। উদ্‌যোক্তা আর শ্রোতা সকলের তা জানা ছিল।

অনেকদিন ধরেই কলকাতায় এ রকম রেওয়াজ চলে আসে। ভাল গানের আসর হলে বেশির ভাগ তা হয়ে থাকে ধ্রুপদেরই। সাধারণ শ্রোতাদের সঙ্গীতের তত্ত্বকথা জানা না থাকলেও ধ্রুপদ ভাল লাগতে, ধ্রুপদ গানে রাগের যথার্থ রূপায়ণে মুগ্ধ হতে, খাঁটি স্বরের প্রভাবে মনে সাড়া জাগতে কোন বাধা ছিল না। আর সেসব যুগে বাঙলাদেশ বরাবরই শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে সুকণ্ঠ ধ্রুপদী।

মধুরকণ্ঠ ধ্রুপদীর অভাব বাঙলায় কোনদিনই হয়নি। যা' রঞ্জন করে তাই রাগ আর রঞ্জনী শক্তির অধিকারী ধ্রুপদ-গুণীরা যুগের পর যুগ ধরে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে এসেছেন ধ্রুপদ অঙ্গে রাগ পরিবেশন করে।

বিশেষ ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন ধ্রুপদী। এমন উদাত্ত অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠ বেশি ধ্রুপদগুণীর ছিল না। রাগবিদ্যাও তিনি আয়ত্ত করছিলেন দীর্ঘ কালের সাধনায় আর প্রতিভাগুণে। ওজস্বী কণ্ঠের অধিকারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গীতকণ্ঠ বেশি স্ফূর্তি লাভ করত উত্তরাঙ্গ-প্রধান স্থানে, অর্থাৎ, যে সব রাগে তারা গ্রামে কায বেশি হত। যেমন আড়ানা, বসন্ত, সুরট,

হাম্বির, হিন্দোল, বাগেশ্রী, দেশ ইত্যাদি। তাঁর কণ্ঠে এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে অনেক শ্রোতারা গানের বিষয়ে তেমন না বুঝলেও এসে যেত না, তাঁর ধ্রুপদে তৃপ্তিলাভ ঘটতই। গানকে বা রাগকে লঘু না করেও জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন তিনি।

সুতরাং সে সভার উদ্‌যোগী ছাত্ররা ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যাকে সে আসরে গান গাইতে নিয়ে এসে অস্বাভাবিক বা ভুল কাজ কিছু করেনি। কিন্তু ফল হোল অন্য রকম। দেখা গেল, ছাত্রদের তাঁর গান ভাল লাগছে না। গাওয়া কিছুই খারাপ হয়নি, স্বভাবসিদ্ধ সুকণ্ঠেই তিনি গাইছিলেন। তবু আকর্ষণ করতে পারছিলেন না তরুণ শ্রোতাদের।

প্রথমে তিনি ইমন কল্যাণ গাইলেন। আগে চৌতালে, তারপর ধামারে। সে গান ছাত্রদের ভাল না লাগলেও তারা কোন রকমে ধৈর্য ধরে অর্থাৎ গোলমাল না করে গান দু'খানি শুনল। কিংবা বলা যায় যে, চুপ করে রইল।

কিন্তু তারপর যখন তিনি হাম্বির আরম্ভ করলেন, তখন আর ধৈর্য রাখতে পারলে না তারা। প্রথমে উশ্‌খুশ্‌ করতে লাগল নিজের মধ্যে। তারপর হাসাহাসি আরম্ভ করলে। গানে বিশ্রী বিঘ্ন।

শ্রোতাদের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন ভূতনাথবাবু গান গাইতে গাইতেই। তারপর অবস্থার পরিবর্তন হল না দেকে ক্ষুব্ধ চিত্তে নিজেই গান বন্ধ করে দিলেন।

উদ্‌যোক্তা বা শ্রোতা কারুর পক্ষ থেকেই আর তাঁকে সে আসরে গাইতে অনুরোধ করা হল না।

দ্বিতীয় আসর। বৌবাজারের হিদারাম ব্যানার্জী লেনের একটি বাড়ি। ১৯৩৩ সাল।

এই আসরের উদ্‌যোগ করেছিলেন পাখোয়াজী অরুণপ্রকাশ অধিকারী। সঙ্গীত-জগতে তিনি কেবলবাবু নামে সুপরিচিত। তাঁর পাখোয়াজের গুরু দীননাথ হাজরা। হাজরা মশায়ের নামে বার্ষিক স্মৃতিসভা কেবলবাবু করতেন সঙ্গীত-অনুষ্ঠান দিয়ে। কয়েক বছর যাবৎ তিনি গুরুর স্মৃতিতে আসর করতেন এবং কলকাতার বা বাঙলাদেশের প্রায় সব নাম করা ধ্রুপদীই সে আসরে কোন-না কোন বছর গান শুনিয়েছেন।

এবারেও উদ্‌যোগী হয়ে আসরের আয়োজন করেছেন কেবলবাবু। তখনকার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী আমন্ত্রিত হয়ে আসরে এসেছেন। তাঁদের

মধ্যে আছেন অমরনাথ ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু), যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। তা ছাড়া, হাওড়ার প্রবোধবাবু, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান শিষ্য পরেশচন্দ্র মিত্র, তাঁর আর এক কৃতী শিষ্য অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। একটি আসরের পক্ষে অতিরিক্ত রকমের আয়োজন বলা যায়।

এতজন গায়ককে নিয়ে বেশ বড় একটি ধ্রুপদ আসরের পরিকল্পনা কেবলবাবু করেছিলেন। আসরের স্থানও অতি প্রশস্ত।

কিন্তু আশ্চর্য, গান আরম্ভ হতে দেখা গেল—শ্রোতা বিশেষ কেউ এত বড় আসরে নেই। সে বাড়ির ছেলেরা মাঝে মাঝে আসরে আসা-যাওয়া করছে। খানিক হয়ত দাঁড়াচ্ছে। কিছু বাইরের কোন শ্রোতা উপস্থিত হয়নি, নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন শ্রোতাদের আবির্ভাব ঘটল না, তখন অগত্যা গায়করাই শ্রোতা হলেন। এবং গান আরম্ভ করে সকলে গেয়ে গেলেন একে একে। স্মৃতিসভা বলে সকলেই গান গাইলেন। তা ছাড়া বোধহয় তাঁদের একপ্রকার নম্রতার জন্যেও বটে। এ যুগে হলে আসরে গানের কি হত বলা যায় না।

তৃতীয় আসর। কল্‌কাতার সঙ্গীত ক্ষেত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হাওড়ার শিবপুর সঙ্গীতকেন্দ্র। ১৯৩৩ সাল। কলকাতার সুপরিচিত ধ্রুপদী এবং বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা মোহিনীমোহন মিশ্র এই আসরের উদ্‌যোক্তা।

মিশ্র মশায় সেসময় শিবপুরে থাকতেন, সেজন্যে সেখানে এই আসরের আয়োজন করেন। বসন্ত ঋতুর উপলক্ষ্যে বসন্ত-উৎসবের ব্যবস্থা। ধ্রুপদের আসর। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি সব অঙ্গের বহু যত্নে সঙ্গীত-চর্চা করলেও মোহিনীমোহন আসলে ছিলেন ধ্রুপদী। তাই ধ্রুপদীদেরই সে আসরে গানের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর কয়েকজন পাখোয়াজীকে।

গায়ক যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ গোস্বামী, অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। প্রত্যেকেই সুকণ্ঠের জন্যে জনপ্রিয়, বিশেষ প্রথম দুজন অসাধারণ এ বিষয়ে। মোহিনীমোহনের ক'জন শিষ্য গাইবার জন্যে আসরে আসেন। পাখোয়াজীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেবলবাবু।

সন্ধ্যার খানিক পরে আসর বসল। গান আরম্ভ করবার আগে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধ্রুপদের আসর, তাই ধ্রুপদ গানের সম্বন্ধেই বক্তৃতা। বক্তা এ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌তে আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু প্রথম থেকেই শ্রোতাদের আপত্তির জন্যে বক্তৃতা বেশি দূর এগোতে পারল না। বক্তৃতার বিষয়টাই ভাল লাগল না শ্রোতাদের। বক্তা গোড়া থেকেই বাধা পেলেও দম্‌লেন না। তিনি বলে যেতে লাগলেন। কিন্তু মাত্র ৩।৪ মিনিটের বেশি চলল না তাঁর ভাষণ। শ্রোতারা চীৎকার শব্দে তাঁকে একেবারে বসিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হল।

তাদের মতিগতি দেখে গান আরম্ভ করতে তৎপর হলেন মোহিনীমোহন। এখানে বলে রাখা যায় যে, সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে বরাবর শরীর-চর্চাতেও মিশ্র মশায় পারদর্শী ছিলেন। নিয়মিত ব্যায়াম করতেন এবং কুস্তি ইত্যাদি মল্লযুদ্ধে অনেক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতেন, বাঙলার বাইরেও। সুদৃঢ় শরীর ছিল তাঁর। আর মনেও ছিলেন তেমনি অকুতোভয়। সঙ্গীত-জগতের অনেকেই তাঁর পালোয়ানীর কথা জানতেন।

যা'হোক, এবার গান আরম্ভ হল আসরে। ভাল ভাল গায়ক। গানও ভালই হতে লাগল। কিন্তু শ্রোতাদের তা ভাল মনে হ'ল না আদৌ। ললিতবাবু, জ্ঞানবাবু, অনুকূলবাবু একে একে গেয়ে গেলেন। বেশির ভাগ সঙ্গত করলেন কেবলবাবু।

শ্রোতারা কিছু উঠে গেল। কিছু বসে রইল বটে, তবে ভাল লাগার জন্যে নয়। গান যে তারা পছন্দ করছে না, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। সুখ্যাতি করা দূরের কথা, মাঝে মাঝেই বিরক্তি প্রকাশ করেছে, এমন কি বাধাও দিয়েছে। তবে মোহিনীমোহনের শারীরিক শক্তির কথা স্মরণ করে কিংবা অন্য যে কারণেই হোক গান বন্ধ করিয়ে দিতে বা আসর একেবারে পণ্ড করতে পারেনি বটে। কিন্তু বাধা দিয়েছিল যথাসাধ্য এবং আসরও জমেনি।

মোহিনীমোহন অবশ্য আসরকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রায় বারোটা পর্যন্ত। কেবলবাবু প্রায় দশটা পর্যন্ত বাজান। তারপর পাখোয়াজ নিয়ে বসেন মোহিনীমোহন স্বয়ং। নেহাৎ তাঁর দৃঢ়তার জন্যে আসর শেষ পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু সঙ্গীতের দিক থেকে আসর ব্যর্থই হয়েছিল বলতে হবে,

কারণ শ্রোতারা সন্তুষ্ট হয়নি। গায়কের সঙ্গে শ্রোতার আত্মিক যোগাযোগে সার্থক হতে পারেনি সেদিনকার গান।...

চতুর্থ আসর। ওয়েলিংটন স্ট্রীটে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ি। ১৯৩৪ সাল।

এ আসরের উদ্‌যোগী ছিলেন পাখোয়াজী অরুণপ্রকাশ অধিকারী অর্থাৎ কেবলবাবু। উপলক্ষ্যও তাঁর গুরু দীনু হাজরা মহাশয়ের স্মৃতিবার্ষিকী।

প্রধানত ধ্রুপদের আসর। ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখরা ছিলেন। এবং টপ্পা-শিল্পী বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো কয়েকজন গায়ক। পাখোয়াজী এবং তবলা বাদক। সকলেই গুণী।

কিন্তু আসর বসতে দেখা গেল, শ্রোতা উপস্থিত হয়েছেন অতি সামান্য। ৪।৫ জন মাত্র। গায়ক ও সঙ্গতকার তার চেয়ে বেশি।

সেই নামমাত্র শ্রোতাদের নিয়ে আসর আরম্ভ হল। প্রথমে গাইতে বসলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। তিনি ধরলেন দরবাড়ী কানাড়া। এটি তাঁর বিশেষ প্রিয় রাগ এবং গম্ভীর, মনোমুগ্ধকর দরবারীর রাগালাপ ও গান গেয়ে তিনি আগে অনেক আসর মাৎ করেছেন।

একাধারে বীর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত তাঁর কণ্ঠস্বরে দরবারী কানাড়ার রূপায়ণ অতি হৃদয়গ্রাহী হত। দু'খানি গ্রামোফোন রেকর্ডে তিন মিনিটের বাঙলা গানেও তিনি তার স্মরণীয় নিদর্শন রেখে গেছেন—'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়' এবং 'বাজে মৃদঙ্গ বীণা।'

এ আসরেও তিনি চমৎকার গাইতে লাগলেন দরবারী কানাড়া। তালে গঠিত গান আরম্ভ করবার আগে রীতিমত পদ্ধতিগত আলাপচারি শোনাতে লাগলেন রাগের উদ্‌বোধন করে। তাঁর অনুপম কণ্ঠে আলাপ অতি চিত্তাকর্ষক শোনাচ্ছিল।

কিন্তু তাঁর আলাপচারী শেষ হবার আগেই অধৈর্য হয়ে উঠল সেই মুষ্টিমেয় শ্রোতারাও।

একজনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আর কতক্ষণ আলাপ চলবে ?

জ্ঞানবাবু বিরক্ত হয়ে গান থামালেন। ধ্রুপদ গানের আগে আলাপ করার রীতি ও বিধি নিয়ে তিনিও রাগতভাবে বললেন দু'চার কথা।

কথায় কথায় তর্ক বেধে গেল, বচসা আরম্ভ হ'ল। তর্কাতর্কি থামিয়ে দিলেন অন্যান্য গায়করা। কিন্তু আসর ভেঙ্গে গেল। গান আর না গেয়ে আসর থেকে চলে গেলেন জ্ঞানবাবু।

পঞ্চম আসর। উত্তর কলকাতার আহিরীটোলার একটি বাড়ি। এটিও ১১৩৪ সালের ঘটনা।

স্মৃতিসভা কিংবা অন্য কোন উপলক্ষ্যে এদিন গানের আয়োজন হয়নি। ধ্রুপদের হলেও এটি ছিল ঘরোয়া আসর। ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল গায়ক হিসেবে আসেন। দুর্লভচন্দ্রের শিষ্য পিয়ারীমোহন রায় হলেন সঙ্গতকার।

অল্প কয়েকজন মাত্র শ্রোতা।

ভূতনাথবাবু গৃহস্বামীর অনুরোধে গান আরম্ভ করলেন। সামান্য আলাপ-চারির পর চৌতালে কামোদের একটি ভাল বন্দেশী গান গাইতে লাগলেন তিনি।

শ্রোতার সংখ্যা বেশি না হলেও ভূতনাথবাবুর উৎসাহের অভাব ছিল না। গান তাঁর প্রাণের আরাম ছিল, যে-কোন আসরেই তিনি সঙ্গীতের উচ্চমান বজায় রেখে গেয়ে যেতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যতক্ষণ শ্রোতারা শুন্‌তে চায়। তাঁর তেজস্বী-মধুর কণ্ঠে গান শুন্‌তে শ্রোতাদেরও আগ্রহের অভাব দেখা যেত না, আগেকার কালে।

এ আসরেও সুমিষ্ট রাগ কামোদের গান তিনি যে ভাবে দরদ দিয়ে গাইছিলেন তা সকলেরই ভাল লাগবার কথা। কিন্তু আসরের শ্রোতাদের বেলায় তা দেখা গেল না। তারা এদিক-ওদিক চাইতে লাগল, হাই তুলতে লাগল কেউ কেউ। গান শোনবার দিকে কারুর মন নেই, স্পষ্টই বোঝা গেল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় উচ্চাঙ্গের শিল্পী হলেও আসরের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন প্রকৃতির বা আত্মভোলা নন। রীতিমত আসর-সচেতন গায়ক তিনি। যত আন্তরিকতার সঙ্গেই গান করুন, শ্রোতাদের দিকে তাঁর নজর থাকে। গান আরম্ভ করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রোতাদের অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করলেন তিনি। এবং গান সংক্ষেপ করে আনলেন।

তবু দেখলেন, কামোদ শেষ হবার আগেই আসরে তাস এসে গেছে। গান তখনও চলছে, কিন্তু তা শোনবার লক্ষণ না দেখিয়ে প্রকাশ্যেই তাস খেলতে আরম্ভ করলেন শ্রোতারা।

মর্মান্তিক অভিমানে ভূতনাথবাবু গানখানি শেষ করলেন, কিন্তু তাঁর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল না।

কামোদের পরই তিনি আর একখানি গান ধরলেন। এটি তাঁর তাৎক্ষণিক

রচনা। মনে মনে রচনা করেই গানটি গাইতে লাগলেন।

সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর অন্য একটি কৃতিত্ব এই ছিল যে, তিনি উৎকৃস্ট গান রচনা করতে পারতেন বাঙলা ও হিন্দী দুই ভাষাতেই। এবং অনেক আসরে স্বরচিত ব্রজভাষায় ধ্রুপদ শুনিয়ে শ্রোতাদের তিনি পরিতৃপ্ত করেন।

এ আসরে যে গানটি মুখে মুখেই রচনা ক'রে তিনি গাইতে লাগলেন, তা কোন সাধারণ গান অবশ্য নয়। গানখানি বিদ্রূপাত্মক। তাস খেলায় রত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে তিনি শোনাতে লাগলেন—

কোই নেহি সমঝ্‌তা
হাম্‌ কেয়া গাওয়ত,
খালি তাস খেলে।...ইত্যাদি

কাব্যমূল্য না থাকলেও গানখানি সাঙ্গীতিক মূল্যে দরিদ্র ছিল না। কারণ চিত্তাকর্ষক মিশ্র খাম্বাজে গঠিত করে তিনি গেয়ে চললেন তেওড়া জলদে। রীতিমত ঠমক দিয়ে ধ্রুপদের আসরের উপযুক্ত করে গানটি গাইতে লাগলেন।

শ্রোতাদের ধ্রুপদের প্রতি বিরূপ মনোভাবকে তীব্র তিরস্কার করবার উদ্দেশ্যে তিনি দস্তুরমত ধ্রুপদ পদ্ধতিই ব্যবহার করলেন, বলা যায়। এ গানখানিও শোনার মতন হয়েছিল, যদিও শ্রোতারা প্রথমটা বুঝতে পারেনি যে এই ব্রজভাষার গানে তাদেরই আক্রমণ করা হচ্ছে। ভূতনাথবাবু তাদের মৌখিক গদ্যে তিরস্কার না করে মারাত্মক বিদ্রূপ করলেন সাঙ্গীতিক প্রথায়— একথা সবাই বুঝতে পারলে গানখানি শেষ হবার পর।

সে রাত্রে সেখানে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আহারেরও নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু গান শেষ করে তানপুরা নামিয়ে রেখেই চলে গেলেন অভিমানী মন নিয়ে। শুধু আসর থেকে নয়, সে বাড়ি থেকেও।

তারপর আর কারুর গানও সে আসরে হয়নি।

এমনিভাবে ধ্রুপদের বিদায়-গাথা ধ্বনিত হ'তে লাগল আসরের পর আসর থেকে। এ বিষয়ে আর বেশি দৃষ্টান্তের বোধ হয় প্রয়োজন নেই।

অথচ তার কিছু বছর আগে পর্যন্ত ধ্রুপদ গানের কত অগণিত ও শ্রদ্ধা-পরায়ণ অনুরাগী শ্রোতা ছিল, আর কি উদ্দীপনায় ভরা সব আসর হ'ত এই কলকাতাতেই। কি ঐশ্বর্যময় ধ্রুপদ-চর্চা ছিল। আর তেমনি প্রাণবন্ত সে সব আসর।

আগেকার আমলের ধ্রুপদের সাফল্য আর বড় বড় আসরের অতি সজীব

আবহ সমস্তই নির্ভরশীল ছিল শ্রোতাদের রসবোধ ও সহযোগিতার ওপর। সমমর্মী ও সংবেদনশীল শ্রোতা না হলে আসরের সঙ্গীত কি সার্থক হ'তে পারে ?

বৃদ্ধ বরজলাল আর 'নবীন যুবা' কাশীনাথের দরবারে গান গাওয়ার হৃদয়স্পর্শী প্রসঙ্গ বর্ণনা করে 'গান ভঙ্গ' কবিতায় সেকথা অপরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে—
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।'

আগেকার শ্রোতাদের অনুরাগী অন্তরের যোগ ছিল ধ্রুপদ সঙ্গীতের সঙ্গে। সে জন্যেই ধ্রুপদের আসরের উচ্চ মান সম্ভব হয়েছিল। গায়কের কৃতিত্বের সঙ্গে শ্রোতাদের এই মানসিক সংযোগের কথা ভোলা যায় না।

বিগত যুগের সে সব আসরে কি উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকত সুর। তখনকার প্রায় সব শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সতেজ কণ্ঠে কি চড়া 'স্কেলে' অবলীলায় গান শোনাতেন। সেই ভাবেই তাঁদের গলা সাধা ছিল, সেই ভাবেই থাকত আসরে পর্দা বাঁধা। কারণ ধ্রুপদ গানে কণ্ঠ-সাধনার স্থান ও সম্মান অনেকখানি।

কে কোন্ শার্পে আসরে গাইতেন তা দেখাবার জন্যে কয়েকজন গুণীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। এ থেকে বোঝা যাবে, তখনকার ধ্রুপদীদের কি জীবনীশক্তি এবং আসরে কণ্ঠচর্চার মান (standard) ও মর্যাদা কতখানি ছিল।

আশুতোষ রায় গাইতেন এফ্ স্কেলে। মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এফ্-এ গাইতেন। ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশির ভাগ শোনাতেন এফ্-এ, কখনও কখনও ডি শার্পে। তার নীচে কখনও নয়। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গাইতেন ডি শার্পে। শুধু রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর গলা এঁদের তুলনায় একটু ঝিম্ ছিল বলে সাধারণত সি-তে গাইতেন। তাও তাঁর গুরুতর বসন্ত রোগের আক্রমণে কণ্ঠস্বর ঈষৎ সানুনাসিক হয়ে বসে যাবার ফলে হয়ত।

তাঁর প্রথম জীবনের গলার স্কেল কি ছিল জানা যায় না।

ব্যতিক্রম হিসেবে গোঁসাইজীর কথা বাদ দিলে, ডি-এর নীচে আসরে ধ্রুপদ গাইবার প্রথা বিশেষ ছিল না। গাইলে বিদ্রূপ ও সমালোচনার পাত্র হতেন গায়করা। বড় গাইয়েরা তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতেন—মর্দানা গায়ক নয়। অর্থাৎ পুরুষোচিত নয় তাঁর কণ্ঠ।

তাই সে যুগে উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগের আদর ও কদর আসরে বেশি ছিল। আর সেসব রাগই হত গায়কদের ও শ্রোতাদের বেশি প্রিয়।

সে যুগের অবস্থার সঙ্গে এখনকার তুলনা করলে দেখা যায়, গায়কদের বি-তে গাওয়ার রেওয়াজ এবং উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগচর্চার ঘাটতি। এখন যে কথা হচ্ছিল।

সেকালে ধ্রুপদীরা কণ্ঠ-সাধনার ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন আর তাঁদের জীবনীশক্তি হয়ত বেশি ছিল।' তাই আসরে রেওয়াজ দাঁড়িয়ে যায় মর্দানা ঢঙ্-এর গলায় গান। অর্থাৎ হারমোনিয়ামের স্কেল হিসেবে তা যেন ডি-র নীচে না নামে। সি-তে গাইলে সে গায়ক আসরে কণ্ঠকৃতির জন্যে মর্যাদা পেতেন না, তা তাঁর যত নামডাকই থাক।

অন্যে পরে কা কথা, রাধিকাপ্রসাদের তুল্য গুণী এবং আচার্যস্থানীয় গায়ককে গলার জন্যে সমালোচনার ভাগ হতে হয় কোন কোন আসরে, যেখানে কোন বিরুদ্ধপক্ষীয় উত্তরাঙ্গ কণ্ঠগায়ক উপস্থিত থাকতেন। এমন একটি আসরের কথা এখানে বলা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, গোঁসাইজী সাধারণত সি-তে গাইতেন। সেজন্যে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যতদিন জীবিত ছিলেন, কলকাতায় গুরুর প্রায় প্রত্যেকটি আসরে হাজির থাকতেন তাঁর সঙ্গে।

অতি দরাজ গলা ছিল মহীন্দ্রনাথের, এফ-এ তিনি গাইতেন। তাই আসরে গলা নিয়ে যদি কোন প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যেত, মহীন্দ্রনাথ মহড়া নিতেন প্রতিপক্ষের সঙ্গে। ভাবটা এইরকম প্রকাশ করা হত, যাঁর শিষ্য এমন উঁচুতে পর্দায় গান শোনাতে পারেন তাঁর গুরুর পক্ষে গলার আওয়াজের প্রশ্ন অবান্তর।

তা'ছাড়া, গোঁসাইজীর সি-তে গাওয়ার জবাবে আহ্বানকারী হয়ত ডি-তে গান শুনিয়ে দিলেন আসরে তাঁর ওপর টেক্কা দেবার জন্যে। তখন মহীন্দ্রনাথ এফ্-এ গেয়ে প্রতিযোগীকে অপ্রস্তুত এবং আসর মাৎ করলেন, এমনও হয়েছে।

মহীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা প্রায় সকলেই রাধিকাপ্রসাদের শিক্ষাধীনে চলে আসেন। ভূতনাথবাবুও। তখন থেকে রাধিকাপ্রসাদের কোন আসরে দরকার হলে ভূতনাথবাবু মহীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি নিতেন।

যে আসরে রাধিকাপ্রসাদের সি-তে গাওয়া নিয়ে একটি দৃশ্য অভিনীত হয়, সে আসরটি বসেছিল বেলেঘাটার একটি বাড়িতে। সেখানে গাইবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন রাধিকাপ্রসাদ এবং গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দু'জনের গানের গলায় যেমন পার্থক্য দেখা যেত, তেমনি তাঁদের স্বভাবেও। গোঁসাইজী ছিলেন সত্যিই বৈষ্ণব প্রকৃতির। নিরীহ, শান্ত স্বভাবের মানুষ, বিবাদ-বিসংবাদ সাধ্য মতন এড়িয়ে চলতেন। আর বারাণসীর সন্তান গোপালচন্দ্রের চরিত্রে অনেক সময় প্রকাশ পেত শাক্ত-সুলভ একটা আক্রমণাত্মক ভাব। রাধিকাপ্রসাদ ক্ষীণাঙ্গী। গোপালচন্দ্রের ব্যায়াম-বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ শরীর প্রথম জীবনে অনেক হিন্দুস্থানী পালোয়ানকেও মল্লযুদ্ধে ধরাশায়ী করেছে।

রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গীত-কণ্ঠের সমালোচক ছিলেন গোপালচন্দ্র এবং তাঁর মনোভাব প্রকাশও করতেন সঙ্গীতজ্ঞ মহলে। গোঁসাইজীর সঙ্গীত-প্রতিভা বা রাগবিদ্যায় অধিকার নিয়ে নয়, তাঁর গলার আওয়াজের জন্যেই বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁকে সুনজরে দেখতেন না।

বেলেঘাটার আসরটিতেও প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর সেই মনোভাব।

আসরে তাঁর গান আগে হ'ল। তিনি যথারীতি ডি-তে গেয়ে রাধিকা-প্রসাদকে চ্যালেঞ্জ করলেন সকলের সামনে। গোঁসাইজী সি-র্ চেয়ে উচু স্কেলে গাইতে পারেন না, এমন মন্তব্যও যেন করলেন।

রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে বসেছিলেন ভূতনাথ প্রভৃতি কয়েকজন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্যে ভূতনাথ গাইবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও নিরস্ত করলেন গোঁসাইজী।

বললেন—না, আমিই গাইব।

যদিও তিনি সাধারণত সি-তে গাইতেন, তা হলেও এমন প্রকাশ্য আসরে যখন গলা নিয়ে কথা উঠেছে, উত্তর যথাযোগ্য দিতে হবে। এড়িয়ে গেলে চলবে না, শান্তিপ্রিয় হলেও সাঙ্গীতিক ব্যাপারে পরাজয়ের মনোভাব ছিল না তাঁর। তাছাড়া, সেকালের এইসব ধ্রুপদের আসরে সম্মানের প্রশ্নটা বড়

বেশি করে থাকত। কণ্ঠ-সাধনার বড় মর্যাদা ছিল তখন। সুপ্রতিষ্ঠিত গায়করা সে বিষয়ে খাটো হ'তে চাইতেন না।

তাই ডি-তেই গান আরম্ভ করলেন রাধিকাপ্রসাদ। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এবং আসরের আরো অনেককে বিস্মিত করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সুদক্ষভাবে ডি-তে গেয়ে গেলেন। অভ্যাস না থাকলেও চ্যালেঞ্জের জবাব দিলেন ভালভাবেই। শ্রোতারাও এই সুস্থ সাঙ্গীতিক প্রতিযোগিতা রীতিমত উপভোগ করলেন।

এমনি ছিল ধ্রুপদের গৌরবের যুগের আসর। আর সে গৌরব তো একদিনে কিংবা মুখের কথায় হয়নি।

সুদীর্ঘ কাল ধরে, অসংখ্য ধ্রুপদ সাধকদের অবদানের ফলে এই মহান্ ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়। শতাব্দ পার হয়ে চলে এসেছিল তাঁদের ঐকান্তিক, নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার দ্বারা।

ধ্রুপদের দুর্দশা যখন আসরে আসরে প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার একশ' বছরেরও আগে থেকে কলকাতায় ধ্রুপদের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়ে দেওয়া যাক। কলকাতায় ধ্রুপদ ঐতিহ্য বিষয়ে না হলে সঠিক ধারণা করা যাবে না।

বিষ্ণুপুর তথা বাংলার আদি ধ্রুপদাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্যেরা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ প্রথম প্রচলন করেন। তাঁরা হলেন রামকেশব ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কেশবলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। একথা অনেকেরই জানা। কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না, তাঁরা কলকাতায় ধ্রুপদের আসর বসাবার প্রায় দু'-যুগ আগে থেকেই এখানে ধ্রুপদ গান শোনা যেত।

১৮২৮ সালে রামমোহন প্রথম যখন ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন সেখানে প্রতি সপ্তাহের অধিবেশনে গান গাইবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীকে। এই দুই ধ্রুপদী ভ্রাতা নদীয়া জেলার রানাঘাট অঞ্চলের সন্তান এবং কৃষ্ণনগর রাজ-দরবারের পশ্চিমা গুণীদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

ওই বছরে ব্রাহ্মসমাজে নিযুক্ত হবার পর থেকে তাঁরা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান এবং তাঁরাই হলেন কলকাতার প্রথম দুজন ধ্রুপদ-গায়ক। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র সুদীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বিষ্ণুচন্দ্রই তাঁর প্রথম সঙ্গীত-গুরু।

এখানে কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্রের সঙ্গীত-জীবন আরম্ভ হবার বছর দশেকের মধ্যে স্বনামধন্য ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আসরে আবির্ভাব। তিনিও নদীয়া জেলার আর এক অঞ্চলের সন্তান এবং ১৫।১৬ বছর বয়সে সেখান থেকে কলকাতায় চলে এসে রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষা করতে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করতে যান। সেখানে দশ-বারো বছর ধ্রুপদ শিখে ফিরে আসেন কলকাতায়। তিনি বেশির ভাগ এখানেই থাকতেন।

তার পরে তাঁর দুই প্রধান শিষ্য যদু ভট্ট ও হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সগৌরবে দেখা দেন ধ্রুপদের আসরে। যদু ভট্টের প্রথম গুরু বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য শিষ্যের ১৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলে যদু দু-বছর পরে কলকাতায় আসেন। কিছুকাল জীবন-সংগ্রামের পরে তিনি গঙ্গানারায়ণের আশ্রয় ও শিক্ষালাভ করে সুপ্রসিদ্ধ হন খাণ্ডারবাণী রীতির ধ্রুপদী-রূপে। পরে তিনি নানা দরবারে নিযুক্ত থাকেন। তার মধ্যে কিছুদিন ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজে এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গায়ক-রূপে।

গঙ্গানারায়ণ ও তাঁর অন্য কৃতী শিষ্য হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতায় অবস্থানের ফলে এখানে যে ধ্রুপদচর্চার ধারা প্রবর্তিত হয়, পরে সেই ধারায় দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে পাওয়া যায়।

কলকাতার আসরে গঙ্গানারায়ণ প্রথম খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ প্রচলন করবার পর বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ এখানে নিয়ে আসেন রামকেশব ভট্টাচার্য, ক্ষেত্র-মোহন গোস্বামী, কেশবলাল চক্রবর্তী প্রভৃতিরা, একথা আগেই বলা হয়েছে।

তাঁদের সামান্য কিছু পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক এবং কাশীর ধ্রুপদাচার্য গোপালপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্য গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর পশ্চিমা রীতির সমৃদ্ধ ধ্রুপদ কলকাতার আসরে শোনা গেল।

তাঁর পরে আলী বখ্‌স্‌ ও মুরাদ আলী খাঁর শিষ্য অঘোরনাথ চক্রবর্তীর ধ্রুপদ শিক্ষা পুরোপুরি এবং ধ্রুপদ সাধনারও অনেকখানি কলকাতায়।

বিষ্ণুপুরের সন্তান এবং বেতিয়া ঘরানার উত্তরাধিকারী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

রাধিকাপ্রসাদের আগে-পরে মুরাদ আলী খাঁর উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ পরিবেশন ও তাঁর বিভিন্ন বয়সী ধ্রুপদী শিষ্যদের ধ্রুপদ সাধনা। তাঁদের মধ্যে যদুনাথ রায় ও কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়কে কখনো কখনো কলকাতার আসরে দেখা গেলেও তাঁরা যথাক্রমে ময়ূরভঞ্জ ও তমলুকেই বেশিরভাগ ছিলেন।

মুরাদ আলীর অন্যান্য শিষ্যদের কলকাতার আসরেই প্রধানত পাওয়া যায়,—যথা, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ঘোষ এবং আশুতোষ রায়।

তারপর তাঁদেরই বয়োকনিষ্ঠ সমসাময়িক হিসাবে অঘোরনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরনাথ ভট্টাচার্য; বিশ্বনাথ রাওয়ের শিষ্য সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) এবং অমরনাথ ভট্টাচার্য; লছমীপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্যবর্গ ও রাধিকাপ্রসাদের শিষ্য-ধারার উল্লেখ করলে কলকাতায় ধ্রুপদ চর্চার পরিক্রমা আলোচ্য কালে পৌঁছে যায়।

মোটামুটি এই রূপরেখায় কলকাতার ধ্রুপদের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। এতদিন ধরে এত শিল্পীর সাধনায় ধ্রুপদ গান তার বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে এখানকার আসরে দেদীপ্যমান ছিল শ্রোতাদের সমমর্মিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে।

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ-রীতিকে বাঙালীর সঙ্গীত-মানস আপন ও আত্মস্থ করে নিয়েছিল এমন ভাবে যে, বাঙালীর সঙ্গীত-চর্চার তা অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। পশ্চিমের এই গীতি-পদ্ধতির সঙ্গে বাঙালীর এত অন্তরঙ্গতার জন্যেই বোধ হয় এত ধ্রুপদাঙ্গের গান রচিত হয় বাংলা ভাষাতেও।

বাঙলার বহু গায়ক, সুরকার ও গীতি-রচয়িতা বহু বাংলা ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করে বাঙলার সঙ্গীত-ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যময় করেছেন। অথচ এই গৌরবময় ইতিহাসের পরিণতিতে এক অচল অবস্থা দেখা গেল আসরে আসরে।

ধ্রুপদের শান্ত, গম্ভীর সৌন্দর্যের যাঁরা উপাসক, এই সঙ্গীতে রাগের ঋজু ও অবিকৃত রূপায়ণে যাঁরা মুগ্ধ, ধ্রুপদীদের পরিশীলিত কণ্ঠকৃতিতে যাঁরা আস্থাবান এবং ভারতীয় সঙ্গীতের এক মহৎ অবদান হিসেবে ধ্রুপদের চর্চা করে কলকাতার আসর সুসমৃদ্ধ হয়েছে বলে যাঁদের ধারণা—তাঁরা এই নতুন পরিস্থিতি দেখে ব্যথিত হলেন। আর যে শিল্পীরা ধ্রুপদের চর্চায় নিজেদের নিয়োগ করেছেন পরিপূর্ণভাবে, তাঁদের বিক্ষুব্ধ বেদনার সীমা রইল না।

এমনি একজন সত্যকার গুণী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুপদ যাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠ সাধ ও সাধনা। ধ্রুপদচর্চা বাদ দিয়ে তিনি যেন নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারেন না। বহুদিনের অনুশীলনের ফলে তাঁর জীবনে তা এখন সহজ সাধনও।

এই গানের জন্যে এতদিন কলকাতার আসরে কি সম্মান ও প্রতিষ্ঠা তিনি পেয়েছিলেন। আজ তাঁর গান শোনবার জন্যে আসরে শ্রোতা পাওয়া যায় না, কিন্তু একদিন তা শুনতে আসর সরগরম থাকত উৎসুক শ্রোতাদের ভিড়ে।

দরাজ অথচ মাধুর্যময় কণ্ঠে প্রাণের স্ফূর্তিতে যেমন অক্লেশে ঘন্টার পর ঘন্টা গেয়ে যেতেন, শ্রোতারাও তেমনি শেষ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে তাঁর গান শুনত।

ধৈর্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর, এত আকর্ষণ ছিল তাঁর কণ্ঠের, তাঁর গানের। মুরারী সম্মেলন, শঙ্কর উৎসব, নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদি বড় বড় আসর থেকে আরম্ভ করে নানা ছোটখাটো আসরেও তাঁর অনুরাগী শ্রোতার অভাব ছিল না। উত্তরাঙ্গের রাগে তিনি কৃতিত্ব দেখাতেন বেশি। সেই হিসেবে বসন্ত, হিন্দোল, গৌরী, আড়ানা, বাগেশ্রী, সুরট, বাহার, দেশ ইত্যাদি তাঁর প্রিয় রাগের রূপায়ণে স্মরণীয় ছিলেন।

হিন্দীতে অনেক ধ্রুপদ গান তিনি রচনা করেছিলেন এবং সেসব গান শুনিয়েছেন অনেক আসরে। এখানে তাঁর রচনার একটি নিদর্শন দেওয়া হল :

মালকোষ ॥ সুল ফাকতা

কৃষ্ণ আনন্দময় পুরুষ পুরুষোত্তম
পরাৎপর প্রেমময় পরমেশ্বর পীতাম্বর বনমালী ॥
মাধব মধুসূদন মুরারি মদনমোহন
মুকুন্দ শ্যামসুন্দর ময়ূরপুচ্ছধারী ॥
রাধাবল্লভ রাধানাথ রাধাপ্রাণ
রাধামোহন রাধিকা-রমণ রসরাজ রাসবিহারী
ভূতনাথকে দিজে প্রভু তুহারি চরণ
তুঁহি রাম তুহি শ্যাম তুহি দনুজ-দারী ॥

কোন কোন গায়ক এক একটি রাগ কিংবা গানের জন্যে আসরে চিহ্নিত থাকেন। আসর মাৎ-করা সেই গানের জন্যে তিনি বেশি পরিচিত হন শ্রোতাদের কাছে।

ভূতনাথবাবুরও তেমনি ছিল সুরটের একটি ধ্রুপদ। এই গানখানি যে কত আসরে ফরমায়েশে গেয়েছেন এবং মাতিয়েছেন শ্রোতাদের, তা বলা যায় না। সেই 'কাঁহারে গোপাল' বলে উদাত্ত দরদী কণ্ঠে যে গানটি (সুরট, চৌতাল) গেয়ে আসরে শ্রোতাদের অশ্রুসজল করতেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। গানটি যে তানসেনের রচনা তা ভনিতাতেই সুপ্রকাশ :

কাঁহা রে গোপাল নন্দলাল,
যশোদা-দুলাল ব্রজবালা প্রাণ।

রাধারমণ মদনমোহন কংস-নাশন,
মথুরেশ হরে ॥
গোকুল ছোঁড়ি কাঁহা গেঁই,
কাঁহা নন্দ যশোদা মাঈ কাঁহা,
গোপী ব্রজবালা কাঁহা প্যারে ॥
কাঁহা বংশী বট কালিন্দী তট,
কাঁহা নব নব নিহারী ঘট,
কাঁহা গোবর্ধন বংশী ধুন
যমুনা উলটি মধুরে বোলে ॥
তানসেন কহত নিঠুর
কাহে ছোড়ি ব্রজপুর
অব মধুপুর কুব্‌জা নাগর
এই সে ধরম তেঁরো ॥

অনেক শিষ্য গঠন করেছিলেন তিনি। পরেশ মিত্র, অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই দাস, শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্রের পুত্র, ইনি ললিত মুখোপাধ্যায়েরও শিষ্য ছিলেন) প্রমোদকিশোর মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন মজুমদার, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র পাড়ুই প্রভৃতি। বহুমুখী মনীষার আধার, অধ্যাপক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ভূতনাথবাবুর কাছে নাড়া বেঁধে প্রায় দু'বছর ধ্রুপদ শিখেছিলেন।

আরো অনেকে গান শিখতে আসতেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। তাঁর মতন আদর্শবাদী ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক আমাদের সঙ্গীতক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়নি। যেমন দরদী, তেমনি সুদক্ষ আচার্য।

মার্কাস স্কোয়ারের পূর্বদিকে তাঁর বাসায় প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছাত্রদের তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা দিতেন। বেশির ভাগই বিনা বেতনে। কিন্তু সেজন্যে আন্তরিকতা ও গুরুত্বের কোন অভাব ছিল না! নিপুণ ভাবে শেখাতেন প্রত্যেকটি ছাত্রকে। নতুন গান শেখাবার সময় গানটি লিখিয়ে গলায় একেবারে তুলে দিতেন। তারপর ছাত্র যদি গানখানি সঠিক প্রদর্শন করে উপরন্তু নিজস্ব কিছু প্রকাশ করত, তা হলে অত্যন্ত খুসী হতেন তিনি। তাকে বিশেষ করে উৎসাহ দিতেন।

শিক্ষার ওই দুদিনের মধ্যে তালিম দিতেন মঙ্গলবার। আর ছাত্রদের

নিয়ে বৃহস্পতিবার গানের আসর বসাতেন। সেদিন ছাত্রদের পাখোয়াজের সঙ্গে গাইতে হত, নিজেও গাইতেন তিনি। ছাত্রদের সঙ্গে বাজাবার জন্যে দুর্লভচন্দ্র, কেবলবাবুর মতন ধুরন্ধর সঙ্গীতকার আসতেন। দুর্লভচন্দ্র আবার কঠিন কঠিন বোল বাজাতেন ছাত্রদের তালে সুদৃঢ় করবার জন্যে।

ছাত্রদের জন্যে ভূতনাথবাবুর মমতা তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে যেমন প্রকাশ পেত, তেমনি তাঁর কথাবার্তা ও তাদের সঙ্গে ব্যবহারেও জানা যেত। তিনি বল্‌তেন, 'ছেলেদের মধ্যে আমরা বাঁচব বটে, কিন্তু তার বেশি করে বাঁচব ছাত্রদের মধ্যে।'

নিজের ব্যক্তি-জীবনের চেয়ে সঙ্গীত-জীবনকে যে বেশি প্রাধান্য দিতেন, তা এই কথা থেকে বোঝা যায়।

তাঁর সঙ্গীত-চর্চা কম বয়স থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, যদিও রীতিমত গান শেখেননি তখন। ছেলেবেলা থেকেই সুকণ্ঠ। শুনে শুনে বাংলা গান গাইতেন। সেসব গানও ভাল লাগত সকলের। পিতা বেণীমাধব গায়ক ছিলেন। তাঁর কাছেই উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ত পান গানের প্রেরণা।

হাওড়া জেলার জনাইয়ের কাছে বলুহাটিতে বাড়ি। সেখানকার উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পড়েন, কিন্তু এন্‌ট্রান্স পাস করা হয়নি। বাল্যকাল থেকে গানের প্রতি আসক্তি ছিল, তা আরো প্রকাশ পায় কলকাতায় কাজ করতে এসে। কলকাতায় তখনও যাত্রার আসর জীবন্ত ছিল আর সেখানে গানের একটি মুখ্য স্থান ছিল।

সুমিষ্ট কণ্ঠের জন্যে যাত্রা-দলের সংস্পর্শে আসেন ভূতনাথ। মাঝে মাঝে যাত্রার আসরে গেয়ে খুব প্রশংসা পেতেন। এইভাবে তখন তাঁর সঙ্গীত-চর্চা চলেছিল।

একদিন এক যাত্রার আসরে গান করবার পর তাঁকে অনেক তারিফ্ করলেন ধ্রুপদী-পাখোয়াজী দানীবাবু (সতীশচন্দ্র দত্ত)।

ভূতনাথকে তিনি বললেন—এমন সুন্দর গলা আপনার? ভাল করে গান শিখুন না।

কিন্তু তখন রীতিমত শিক্ষা করবার সেরকম তাগিদ অনুভব করলেন না তিনি। সতীশবাবুর কথাটা তেমন মনে লাগল না। বয়স তখন তাঁর ২০ বছরও হয়নি।

তারপর চাকরি পেলেন জেম্‌স্ ফিন্‌লেতে। আর মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটে

এক মেস বাড়িতে বাস করতে লাগলেন।

নানা রকমের বাংলা গান গাওয়াও চলেছে আগের মতন। এখন তাঁর গান শুনে সকলেই সুখ্যাতি করেন। কেউ কেউ আবার বলেন ভাল গান শিখতে। বেশি করে সে কথা বলেন মেসের সহবাসী নন্দলালবাবু।

নন্দবাবু রাগ-সঙ্গীতের একজন সমঝদার। ভূতনাথবাবু তখনও এফ শার্পে গাইতেন উদাত্ত কণ্ঠে। শুনে নন্দবাবু মাঝে মাঝেই বল্‌তেন—এমন সুন্দর চড়া গলা, বাংলা গান গেয়ে নষ্ট করছেন কেন ?

ভূতনাথবাবু তাঁর কথা মানতেন না, তর্ক করতেন তার সঙ্গে। রাগ-সঙ্গীত সম্বন্ধে তখন তাঁর ভাল ধারণা ছিল না। নন্দবাবুর কাছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন রাগ-সঙ্গীত্ নিয়ে।

এমনিভাবে দিন চলে নাচ্ছিল। তখন তাঁর ২১ বছর বয়স। এমন সময় একদিন ঘটনাচক্রে গান শুনতে এসে পড়েন মুরারি সম্মেলনে, শিবনারায়ণ দাস লেনে।

এখানে মধুকণ্ঠ ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান সেদিন শুনলেন। ধ্রুপদ গানকে এতদিন ব্যঙ্গ করে এসেছেন ভূতনাথ। কিন্তু মহীন্দ্রনাথের গানে তাঁর ধারণা একেবারে বদলে গেল। মহীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ শুনে তিনি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলেন বললেও ঠিক বলা হয় না। অভিভূত হলেন, বলা যায়।

সে গান শুনে মেসে ফিরে এলেন আচ্ছন্নের মতন। সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। গান এত গম্ভীর হয়েও এত মধুর হতে পারে ? এই তা হলে রাগসঙ্গীতের আসল নমুনা ? না জেনে এই গানকে এতদিন বিদ্রূপ করে এসেছেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মনের তারে ঝঙ্কার দিয়ে বাজতে লাগল মহীন্দ্রনাথের অমৃতকণ্ঠের গান।

পরের দিন নন্দবাবুকে ডেকে বললেন—ধ্রুপদ গান এত সুন্দর হতে পারে ? কি জিনিস শুনে এলুম কাল ওই লোকের কাছে, ওই জিনিস যদি শিখকে পারি, তবেই জন্ম সার্থক হয়। কিন্তু সে কি আমার বরাতে হবে ?

শুনে নন্দবাবুই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের লালমাধব মুখার্জী লেনে, মহীন্দ্রনাথের বাড়িতে। ভূতনাথবাবু সেখানে মনোবাসনা নিবেদন করলেন এবং তাঁর নিয়মিত সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা হল।

তারপর থেকে একাদিক্রমে মহীন্দ্রনাথের কাছে তিনি শিখতে লাগালেন ১২।১৩ বছর। মহীন্দ্রনাথের ৪৬ বছর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত। ভূতনাথের তখন

৩৪ বছর বয়স। গুরুর মৃত্যুর পর রাধিকাপ্রসাদের কাছেও কয়েক বছর শিখলেন।

মহীন্দ্রনাথের তিনি প্রিয়তম ও সর্বোত্তম শিষ্য ভূতনাথবাবু। মহীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিষ্য ধ্রুপদ-গুণী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত-জগতের ভাগ্যক্রমে আজো বিদ্যমান আছেন।

ভূতনাথের ওজস্বী কণ্ঠ এবং সঙ্গীত-প্রতিভা স্ফূর্তি লাভ করে' বিকাশের পথ পেলে ধ্রুপদ গানে। সাধনাও তাঁর আদর্শ ছিল, বলা যায়। প্রতিদিন ভোর ৪টা থেকে ৩।৪ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার পর থেকে রাতেও ৪।৫ ঘণ্টা। শুধু শিক্ষার সময়ে নয়, পরবর্তীকালেও এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেওয়াজ করতেন অসুস্থ হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত।

এত অফুরন্ত দম তাঁর ছিল যে আসরে অত বেশিক্ষণ শ্রোতাদের আবিষ্ট করে আর কেউ বোধহয় গেয়ে যেতে পারতেন না। আর মহীন্দ্রনাথের মতন তাঁরও গানের এই প্রভাব দেখা যেত যে, তাঁর গানের পরে আর কোন গায়কের পক্ষে আসর জমানো অতি কঠিন হত। সুরট, চৌতালে যেমন 'কাঁহারে গোপাল' গানখানি, তেমনি দেশ-এর ধামার 'রঙ্গ ঝরিলা' কিংবা ধোন্দি-কি-মল্লারের সেই গানটি শুনিয়ে তিনি কত আসর যে মাৎ করেছিলেন!

দেশের সঙ্গীত সমাজের দুর্ভাগ্য যে অমন ঐশ্বর্যময় কণ্ঠের কোন চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। তাঁর গুরু মহীন্দ্রনাথের মতন তিনিও রাজি হননি তিন মিনিটের গ্রামোফোন রেকর্ডে ধ্রুপদ গান ধরে রাখতে।...

এ হেন ধ্রুপদী ভূতনাথবাবু আসরে ধ্রুপদের হতাদর এবং তাঁকে অনাদর করতে দেখে কি মর্মাঘাত যে অনুভব করতে লাগলেন তা অনুমান করা যায়। সেই সঙ্গে আরও ক'টি এমন কারণ দেখা দিলে যে, অভিমানী শিল্পী কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন কিশোর-প্রতিভা মধুসূদন মজুমদার তাঁর কাছে শিক্ষা এবং ধ্রুপদ-চর্চা ত্যাগ করে অন্য রীতির গান শিখতে আরম্ভ করলেন। ওদিকে তাঁর গুরু-পুত্র ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পিতার প্রতিভা ও কণ্ঠসম্পদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উদীয়মান হলেন ধ্রুপদের আসরে।

ললিতচন্দ্র ভূতনাথবাবুর শুধু পরম স্নেহের পাত্র গুরু-পুত্রই নন, মহীন্দ্রনাথের কথায় কিছুদিন ভূতনাথবাবু তাঁকে শিখিয়েও ছিলেন। কিন্তু ললিতচন্দ্র যখন তাঁর অনিন্দ্য কণ্ঠ ও পূর্ণ প্রতিভা নিয়ে সঙ্গীতক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হলেন, আরম্ভ হল বাঙালীসুলভ একটি দলাদলির গুঞ্জরণ।

ললিতচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুরাগী ও শিষ্যদের যে গোষ্ঠী গঠিত হল, সে পক্ষীয় কেউ কেউ এমন রটনা করতে লাগলেন যে, ললিতচন্দ্রকে ভূতনাথ-বাবু প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন এবং প্রথমোক্তের উন্নতিতে অসূয়াপরবশ হয়েছেন ইত্যাদি।

নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ভূতনাথবাবুর দিক থেকে এরকম কোন মনোভাব ছিল না। ১৩।১৪ বছরের বয়োকনিষ্ঠ ললিতচন্দ্রকে তিনি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গীত জগতে সমাদর-লাভে আন্তরিক আনন্দিতই ছিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের বিপরীত মন্তব্য কানে গেলে তিনি বলতেন, ললিত আমার গুরুর ছেলে। তার উন্নতিতে হিংসে করব, আমি? আমি চাই তার আরও উন্নতি হোক। আমি কোন দিন তার পথের কাঁটা হব না।

কিন্তু নিন্দা প্রচার যাদের স্বভাব তারা সত্যের ধার ধারে না। আর এই সব অপপ্রচারে অতি মনোকষ্ট পেতে লাগলেন ভূতনাথবাবু। সেই সঙ্গে তাঁর মর্মপীড়ার প্রধান কারণটি যুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে বিদায় নেওয়া সাব্যস্ত করলেন। ধ্রুপদ গানের অনাদরে মন তাঁর ভেঙে গেয়েছিল একেবারে।

১৯৩৬ সালের শেষ দিকে কলকাতা ছেড়ে তিনি বলুহাটিতে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্যে ফিরে যান। তারপর কয়েকবার কলকাতায় এসেছিলেন, বিশেষ উপরোধে গান গাইতে বা অন্য কোন প্রয়োজনে। কলকাতার শেষ গান দুর্লভচন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে 'দুর্লভ সম্মেলনে' গেয়েছিলেন।

কলকাতার সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পরও তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয় কেউ কেউ পুনরায় প্রচার করতেন যে, তিনি ললিতচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে চলে গেলেন কলকাতা ছেড়ে, তাঁর গানের ক্ষমতা আর নেই।

কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার তখনও পূর্ণ পরিণত অবস্থা। শক্তিশালী কণ্ঠে অটুট গায়ন ক্ষমতা। বয়স ৫১ বছর। তাঁর বিরোধী কোন অভিযোগই সত্য নয়। তিনি বৃদ্ধ বরজলালের সঙ্গে তুলনীয় নন। তাঁর গানভঙ্গ ঘটেনি বয়সের ট্রাজেডীতে বা কালের চক্রান্তে। ধ্রুপদের জনপ্রিয়তা ম্লান হবার অভিমানে সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান ধ্রুপদের এই ঐকান্তিক সাধক।

দুর্লভ সম্মেলনে তাঁর শেষ গানেও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর প্রতিভার দীপ্তি।

তারপর দেশে গিয়ে যে দু' বছর সুস্থ ছিলেন, দিন-রাতের অধিকাংশ সময় গান গেয়েই তাঁর কেটে যেত। কোন কোন ছাত্র এখানেও তাঁর কাছে শিখতে আসত, বাকি সময় তিনি নিজের গানেই থাকতেন বিভোর হয়ে। অনন্ত মর্মপীড়া সঙ্গীতের মধ্যে ভুলে থাকতে চাইতেন এবং ভুলে ছিলেনও।

কিন্তু সে সুখেও বাদ সাধলেন বিধি। বছর দুয়েক পরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় প্রায় ৭ বছর সঙ্গীতহীন জীবনধারণ করে অবশেষে সব দুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বে চলে যান এই ধ্রুপদ-সাধক।

॥ শেষের গান ॥

মৃত্যুর ঠিক আগে কি গান গাওয়া সম্ভব? জীবন মরণের সীমানায় এসে কোন গায়ক কি গান গাইতে পারেন? আকস্মিক মৃত্যুর কথা নয়। কোন গায়কের গান গাইবার সময় অকস্মাৎ মৃত্যু হতে পারে, যেমন একাধিক পাখোয়াজী বা তবলাবাদকের মৃত্যু ঘটেছে আসরেই। সেক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষয়ে সচেতন থাকবার কোন প্রশ্ন আসে না।

কিন্তু অন্তিমকাল যেখানে অভাবিত নয়, মরণের ছায়া যখন ঘনায়মান হয়েছে শিয়রে, তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তখন কি সঙ্গীতসাধক শোনাতে পারেন জীবনের শেষ গান?

অবশ্য একথা সত্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু আসে যন্ত্রণা-কাতর রোগ-ভোগের শেষে, অস্ত্রোপচারের পর বিক্ষত দেহে, অজ্ঞান আচ্ছন্ন অবস্থায়, কিংবা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির নানা ধরনের বিকৃতি বা বৈকল্যের ফলে, ইত্যাদি। রামমোহন রায় যেমন সেই চরম ক্ষণটির কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর একটি বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীতে (রামকেলি—আড়া ঠেকা):

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥
যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর॥
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ি ক্ষীণ, হিমকলেবর॥

অতএব সাবধান ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥

এমন 'নিরুত্তর' ও 'কাতর' অবস্থায় গান করা যে সম্ভব নয়, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু শরীর-মনের সম্পূর্ণ বৈকল্য না ঘটিয়ে কখনো কখনো মৃত্যু আসে। কঠিন রোগযন্ত্রণা ভোগ না করেও যেমন ঘটে থাকে সজ্ঞানে মৃত্যু, হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে আসবার আগে সক্ষম-ইন্দ্রিয় মানুষ যখন বুঝতে পারে নিয়তির অমোঘ বিধান।

সেইভাবে মৃত্যু হবার আগে, কোন কোন ক্ষেত্রে জানা গেছে, মুমূর্ষু ব্যক্তি সঙ্গীতসাধক হলে সেই অন্তিম মুহূর্তে গান গেয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই গান করবার কথা আসে না; কিন্তু যিনি সারা জীবন সঙ্গীতের সেবায় সাধনায় আত্মনিমগ্ন ছিলেন, সঙ্গীত যাঁর সমগ্র সত্তা অধিকার করে বিদ্যমান, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষের নিরিখে তাঁর পরিচয় নয়। তিনি, সক্ষম থাকলে, জীবন-দেবতার চরণে জীবনের শেষ অঞ্জলি কখনো কখনো সঙ্গীতেই নিবেদন করেছেন।

এমন কয়েকজনের কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে যাঁরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থেকে, আজীবন সুর-সাধনার সমাপ্তিতে অর্ঘ্য দিয়েছেন সঙ্গীতের স্তবকে।

তাঁদের সকলের মৃত্যু অবশ্য একইভাবে হয়নি। এমন কি একজনের ইচ্ছামৃত্যুও ঘটেছিল বলা যেতে পারে। তাঁদের প্রত্যেকের পৃথক প্রসঙ্গে তার যথাসম্ভব বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে একে একে। এখানে শুধু বলা প্রয়োজন যে, তাঁদের জীবন ও সঙ্গীতকৃতি এক ধরনের ছিল না। বিভিন্ন রীতির গায়ক ও সঙ্গীতসাধক ছিলেন তাঁরা, এমন কি তাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গীত-জীবন ও ধর্মজীবন একাকারে মিলে গিয়েছিল স্বাভাবিক পরিণতিতে এবং সেজন্যে তাঁরা সাধক নামে সুপরিচিত ছিলেন দেশে।

তাঁরা সকলে বাঙালীও ছিলেন না। দু'জন ছিলেন অবাঙালী এবং অন্যেরা বাঙলার সন্তান।

এমন সাতজন গায়কের বিচিত্র মৃত্যুর বিবরণ যথাক্রমে দেওয়া হবে। তাঁরা প্রত্যেকে আপন আপন ক্ষেত্রে স্বনামপ্রসিদ্ধ। কালানুক্রমিকভাবে তাঁরা হলেন—কালীসাধক ও শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন, বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবর্তক ধ্রুপদী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, কালীসাধক ও শ্যামাসঙ্গীতের

রচনাকার কমলাকান্ত, নতুন পদ্ধতির পাঁচালী-স্রষ্টা দাশরথি রায়, টপ্পাশিল্পী রমজান খাঁ, ধ্রুপদী ও টপ্পা-গুণী অঘোরনাথ ভট্টাচার্য এবং খেয়াল ও ঠুংরী-গুণী আবদুল করিম খাঁ।

রামপ্রসাদ হলেন সর্বজ্যেষ্ঠ, তারপর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। রামশঙ্করের ১১।১২ বছরের বয়োকনিষ্ঠ হলেন কমলাকান্ত। কমলাকান্তের প্রায় ৩৫ বছরের বয়োকনিষ্ঠ দাশরথি বা দাশু রায়। এবং দাশরথিরও অনেক বছরের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন রমজান খাঁ। তারপর হলেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী এবং তাঁর চেয়েও বয়সে অনেক ছোট ছিলেন আবদুল করিম খাঁ।

প্রথমে সাধক রামপ্রসাদের কথা। ইচ্ছা মৃত্যু কথাটি যে আগে আলোচ্য ব্যক্তিদের কথায় একবার বলা হয়েছিল, তা একমাত্র রামপ্রসাদ সেনের অর্থাৎ সাধক রামপ্রসাদের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা যায়।

তিনি কোন রোগের তাড়নায় বা অসুস্থ দেহে প্রাণত্যাগ করেননি, এই প্রসিদ্ধি আছে। অন্য সকলেরই মৃত্যু হয়; কিন্তু রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক বলতে গেলে, বোধ হয় বলা উচিত যে, তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পূর্ব দিনে তিনি সেকথা সকলের কাছে জানিয়ে দেন আর সত্যিই তা ঘটে যায় হালিশহরের বহু লোকের চোখের সামনে।

সে মৃত্যুকাহিনী যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি কৌতূহল উদ্দীপক।

সেবারে শ্যামাপূজার সেই প্রথম দিন। রামপ্রসাদ অন্যান্য বছরের মতন পরম ভক্তিভরে তাঁর আরাধ্যা দেবীর পূজা করেছেন। গ্রামের অনেকেই পঞ্চবটীতে তাঁর কালীপূজার স্থানে উপস্থিত। এমন সময় রামপ্রসাদ হঠাৎ সকলের সামনে বললেন—কাল মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে আমারও বিসর্জন হবে।

তাঁর কথা শুনে সকলেই আশ্চর্য বোধ করলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে কোন কথা বললেন না, এ বিষয়ে। রামপ্রসাদ আপন মনে গাইতে লাগলেন—

তারা তরী লেগেছে ঘাটে,
যদি পারে যাবি মন আয় ছুটে
তারা নামে পাল খাটিয়ে,
ত্বরা তরী চল্ বেয়ে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
কি করবে আর বসে হাটে॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মন বাঁধরে এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটেছি ভবের মায়া কেটে॥

সবাই অতি দুঃখের সঙ্গে শুনতে লাগলেন রামপ্রসাদের পরপারে যাবার ইচ্ছার কথা। তিনি আবার গাইলেন:

সামাল ভবে ডুবে তরী,
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি, বইতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই করছে দাগাদারী॥
এনেছিলি বসে খেলি, মন মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব (করে) দিতে হবে (মন)
তখন তহবিল হবে হারি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় রে চুরি॥

তাঁর ইষ্টদেবীর প্রতিমার সামনে তিনি এমনি ভাবে একটির পর একটি গান গাইতে লাগলেন। ধীর, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তন্ময় মুখভাব। চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে প্রসারিত।

সেই তাঁর শেষ পূজা, কালীপূজার দিন। পূজা শেষ করবার পর রামপ্রসাদ উপস্থিত সকলকে যথারীতি আলিঙ্গন, আশীর্বাদ করলেন। তারপর সকলে ঘরে ফিরে গেল সেদিনের মতন। রামপ্রসাদের অপূর্ব ভক্তি-ভাব ও বৈরাগ্যের গানের রেশ তখনও সকলের মনে ভরে রয়েছে। এবং কাল বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দেহেরও বিসর্জন হবে—তাঁর এই আশ্চর্য কথা লোকের মুখে মুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।...

অমাবস্যার সে রাত প্রভাত হল যথাসময়ে। ক্রমে সকাল, দুপুর, বিকেল গেল। প্রসাদের ঘরের সামনে পঞ্চবটীতে তখন অসংখ্য লোকের ভীড়। কুমারহট্টের বালক বৃদ্ধ যুবক দলে দলে এসে উপস্থিত হয়েছে পূজার প্রাঙ্গণে। বিসর্জনের বাজনা আকাশ-বাতাস বিষন্ন করে তুলেছে। রামপ্রসাদ রয়েছেন দেবীমূর্তির সামনে।

সন্ধ্যার একটু আগে প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন শেষ হল। রামপ্রসাদ

মাথায় তুলে নিলেন মৃন্ময়ী প্রতিমা। গ্রামের সকলে মিলে বিরাট্ শোভা-যাত্রা করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলল।

অতি ভারাক্রান্ত সকলের মন। কারণ, যে-কথা রামপ্রসাদ আগের দিনে বলেছিলেন, তা সকলের মনে গাঁথা রয়েছে। এক অজানিত বিয়োগ ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে সবাই অনুসরণ করছে তাঁকে।

রামপ্রসাদ হালিশহরের শিবের গলির মধ্যে দিয়ে গঙ্গার দিকে চললেন। সকলে শুনতে লাগল তাঁর আকুল কণ্ঠের গান ঃ

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়
যা হবার তাই হল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে
ঘরে ফিরে চল ॥···

শোকাচ্ছন্ন শোভাযাত্রা রামপ্রসাদের সঙ্গে গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছাল। আরও খানিক এগিয়ে এসে, বিসর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট সেই ঘাট।

রামপ্রসাদ সেই ঘাটে এসে দাঁড়ালেন। এই তাঁর সেই বহুদিনের পরিচিত প্রিয় ঘাট। দীর্ঘকাল ধরে দিনের পর দিন এখানে তিনি এসেছেন, বসেছেন, গান গেয়েছেন। এই ঘাটে, এই গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে তিনি যখন আপন মনে গান গাইতেন, সেই সব সময়েই তাঁর কণ্ঠের গান বেশি শুনেছে হালিশহরের লোকেরা। গঙ্গার বুকে নৌকায়, বজরায় দূরের যাত্রীরা।

সেই চির-পরিচিত ঘাটে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ শোভাযাত্রার ও সমাগত সকলের কাছে বিদায় নিলেন। (কোন কোন মতে, তারপর তিনি ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন মাথায় প্রতিমা নিয়ে)। মতান্তরে, কালীমূর্তি গঙ্গার ধারে রেখে গঙ্গায় নামালেন রামপ্রসাদ।

গঙ্গার ধারে তখন অগণিত লোকের ভিড়। সকলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে রামপ্রসাদের দিকে। তারা দেখলে, রামপ্রসাদের দিকে। রামপ্রসাদ সিঁড়ির ধাপে ধাপে নেমে গঙ্গায় নাভি-জলে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সেখান থেকে ভেসে এল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গান:

কালী গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে
এ তনু তরণী ত্বরা করি চল্ বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥

দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি।
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইব ধেয়ে ॥

এই গানখানি গেয়ে রামপ্রসাদ আর একটি গান ধরলেন :

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে
তুই স্বর্গে যাবি।
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ॥
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খোয়ালে ॥
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চলে ॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিলায় জলে ॥

সকলে শুনলে, রামপ্রসাদ তারপর তৃতীয় গান আরম্ভ করলেন :

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।...
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলেম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে।
ওমা শ্রীসূর্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো ॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়।
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো ॥

প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে।
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গো ॥

সেইভাবে অর্ধাঙ্গ জলে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ তিনটি গান শেষ করে চতুর্থ গান আরম্ভ করলেন, যেমন ভাবে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে তিনি অন্যান্য দিন স্নানের সময় গানের পর গান গেয়ে যেতেন।

গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে এবার সকলে শুনতে লাগল রামপ্রসাদের কণ্ঠে সেই শেষ গান :

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমন সুখ কি পাছে ॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি।
মাগো ও মা ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে ॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই তোমায় সাধিতাম নাই।
মাগো ও মা, দিয়ে আশা কাটলে পাশা
তুলে দিয়ে গাছে ॥
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়।
মাগো ও মা আমার দফা হল রফা দক্ষিণা হয়েছে ॥

শেষ কলির শেষ কথা 'দক্ষিণা হয়েছে' অতি করুণ সুরে গাইবার পরেই রামপ্রসাদের জীবনের অবসান হল। এবং তাঁর সম্বন্ধে বেশীর ভাগ বিবরণীতেই আছে যে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে। এমন কি এডওয়ার্ড জে. টম্পসনও লিখেছেন—

'Then he died singing like Saxon Caedmon ; with the conclution of the lyrics, his soul, went through the top of his head and passed to the world of Brahman.'

রামপ্রসাদের মৃত্যুর বর্ণনা ওইভাবেই আছে তাঁর প্রায় সব জীবনী পুস্তকে। শুধু পাদ্‌রি উইলিয়াম কেরি লিখেছেন :

He died…it is said by jumping into the river Ganges with the image of Kali.

আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের মন হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে, কেরি সাহেবের মতন, যে, রামপ্রসাদ গান শেষ করবামাত্র গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন করেছিলেন শ্যামা প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে।

একটি মত প্রচলিতও আছে যে, তিনি প্রতিমা মস্তকে ধারণ করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। আর তাঁর দেহ দেখতে পায়নি গ্রামবাসীরা।

বিষ্ণুপুরের আদি ধ্রুপদাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ৯২ বছর বয়স পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। এই সুদীর্ঘ আয়ুর জন্যে অনেক শোক পেতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর পাঁচ পুত্র একে একে পরলোকগত হন তাঁর চোখের সামনে। তা ছাড়া অন্য শোকও পেয়েছিলেন।

সব পুত্রদের হারিয়ে শেষে জীবনেও সঙ্গীতকে একান্ত অবলম্বন করে রেখে দিন কাটাতেন, শিষ্যদের শিক্ষাদানে নিজেকে নিযুক্ত রেখে। সাধারণত তিনি কোন অসুখে পড়তেন না। শরীর প্রায় সুস্থই ছিল ৯২ বছর বয়সেও। অর্থাৎ বিশেষ কোন ব্যাধি তাঁর শরীরে আশ্রয় নেয়নি। এবং বয়সের পক্ষে যথাসম্ভব সক্ষম ছিলেন, বলা যায়।

তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে। সে-যাত্রা আর সুস্থ হতে পারলেন না, অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে গেল। অবশেষে ঘনিয়ে এল অন্তিম ক্ষণ।

শেষ অবস্থা বুঝে তাঁর শিষ্যবর্গ এবং কোন কোন আত্মীয় তাঁকে মল্লেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন।

মল্লেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির-চত্বর তাঁর বাড়ির পাশেই। বিষ্ণুপুরের এই প্রাচীন দেবালয় বিষ্ণুপুরবাসীদের মতন ভট্টাচার্য বংশেরও অতি পবিত্র স্থান। সেজন্যে রামশঙ্করের কথায় তাঁকে মল্লেশ্বর মন্দিরে নিয়ে যাবার আয়োজন হল, গঙ্গাযাত্রার মতন।

খাটে শায়িত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় মল্লেশ্বর মন্দিরে। তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন—অন্তিম ক্ষণ উপস্থিত।

তাঁকে দেখা গেল মন্দিরে নিয়ে আসবার সময়—বুকের ওপর হাত দু'টি যুক্ত করে রয়েছেন। এবং গুন্ গুন্ করে গাইছেন নিজের রচিত সেই প্রিয় গানখানি :

অজ্ঞানতম নিকরে, গাঢ়ময়ি পতিতে
জ্ঞান কিঞ্চিৎ বিতর জগদম্বে।

বিষ্ণুপুরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে সুপরিচিত ছিলেন রামশঙ্কর। অনেকেরই হৃদয়ে তাঁর অতি সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন পাতা ছিল তাই

তাঁর শেষ অবস্থার কথা শুনে তখন অনেকে ছুটে এসেছেন মন্দির প্রাঙ্গণে।

রামশঙ্করকে ধীরে ধীরে বহন করে তখন তাঁর শিষ্য ও আত্মীয়রা আনছিলেন মন্দিরের সামনে। আর তিনি গুঞ্জন করছেন সকলের সুপরিচিত সেই গানটি—

কলুষ পূরিত মম কলেবর, অশেষ কুৎসিত কর্মতৎপর
স্থির মতি সংসার জল বিম্বে ॥
তব মায়াময় মোহ গর্তে, অন্ধ অতিশয় নয়ন সত্ত্বে,
শর্করা সম বাস বিষয় নিম্বে
তব চরণ কভু মননে নাই ধরে, এমন দুর্মতি রামশঙ্করে
কুরু কৃপাময়ি কৃপা অবিলম্বে ॥

এইভাবে তাঁকে নিয়ে আসা হল মন্দিরে। তারপর উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করলেন, রামশঙ্করকে মন্দিরের চাতালে নামাবামাত্র তাঁর মৃত্যু হল। যেন দেব-মন্দিরের এই সান্নিধ্যটুকু লাভ করবার জন্যেই তাঁর প্রাণ এতক্ষণ কোনরকমে ছিল। তাঁর সেই গানের গুঞ্জনও স্তব্ধ হয়ে গেল তারই পূর্ব মুহূর্তে-জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের সূক্ষ্ম, অদৃশ্য রেখাটি মুছে গেল!

তাঁর শেষ সংবাদ শুনে বিষ্ণুপুরের আরো বহু লোককে সেখানে আসতে দেখা গেল তাদের প্রিয় সঙ্গীতাচার্যকে শেষ বারের মতন দর্শনের জন্যে। মল্লেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তখন লোকারণ্য। জানা যায়, তের বছরের বালক যদু ভট্টও তখন সেখানে ছিলেন।

রামশঙ্করের মৃত্যুতে সমবেত জনতার মধ্যে থেকে ক্রন্দনের রোল উঠল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। 'আমাদের শঙ্কর চলে গেল'—শোকার্ত অনেকের কণ্ঠ থেকে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়েছিল।...

কালীসাধক এবং শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতারূপে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম রামপ্রসাদের পরেই মনে আসে। স্বরচিত সুমধুর শ্যামাসঙ্গীতের গায়ক কমলাকান্ত, সাধক কমলাকান্ত নামে বাঙলাদেশে সুপ্রসিদ্ধ। শক্তিসাধকদের মধ্যে রামপ্রসাদের সঙ্গে যেমন কমলাকান্তের নাম সুপরিচিত, তেমনি সঙ্গীতের জন্যেও তাঁদের দুজনের জীবনে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। দুজনের নামই বাঙালীর হৃদয়ে আজও সঞ্জীবিত রয়েছে তাঁদের রচিত শক্তিভাবের গানের জন্যে।...

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের সাধকজীবনের পরিচয় পেয়ে তাঁকে বর্ধমান দরবারের সভাপণ্ডিতরূপে বরণ করে নেন। তাঁর জন্যে বাসগৃহও দান করেন কোটালহাটে। সে হল ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের কথা। কমলাকান্তর বয়স তখন প্রায় ৪০ বছর।

সেই থেকে কমলাকান্ত তাঁর পূর্ব নিবাস চান্নার পাট তুলে দিয়ে কোটাল-হাট নিবাসী হয়েছিলেন। তাঁর সমাধিও আছে কোটালহাটের বাড়িটিতে। জীবনের শেষ ১১ বছর তিনি এখানে অধিষ্ঠান করেন।

তাঁর মৃত্যুকালে যে গান গাইবার প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হবে তারও ঘটনাস্থল কোটালহাটের বাসস্থানটি।

মৃত্যুর সময় কমলাকান্তের বয়স হয় বছর পঞ্চাশেক। তাঁর চরম ক্ষণের বিবরণ এইরকম পাওয়া যায়ঃ

কোটালহাটের সেই বাড়িতে তখন কমলাকান্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন। জীবনের আর কোন আশা নেই। তাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত শুনে মহারাজা তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

মুমূর্ষু কমলাকান্তের ঘরে তাঁর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন তেজশ্চন্দ্র।

কমলাকান্ত তাঁকে দেখে বসতে ইঙ্গিত করলেন এবং তিনিও বসলেন। সাধক তখন ক্ষীণ কণ্ঠে গুন গুন করে গাইছিলেন তঁর প্রিয় শ্যামাসঙ্গীতটি—মজিল মোর মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।...

তাঁর নিদান সময় বুঝে তেজশ্চন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন— কি ভট্চায, তুমি তো চললে। কেবল এই বুড়োটা পড়ে রইল। তোমার কি গঙ্গাতীরে যাবার ইচ্ছে? ব্যবস্থা করব?

কমলাকান্ত কথার উত্তর না দিয়ে মুখে মুখে একটি পদ রচনা করে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করলেন তেজশ্চন্দ্রের কাছে। মন্দিরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে, বুকে হাত রেখে তিনি তেমনি স্বরে তাঁর একনিষ্ঠ শ্যামাভক্তির সেই গান গাইলেনঃ

কি বালাই, কেন গঙ্গাতীরে যাব,
আমি কালো মায়ের ছেলে হয়ে
বিমাতার কি শরণ ল'ব?...

সেই তাঁর শেষ গান এবং শেষ কথা।

এবার নতুন পদ্ধতির পাঁচালি গানের স্রষ্টা দাশরথি রায়ের কথা। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর প্রসঙ্গ।

স্বনামধন্য পাঁচালিকার দাশরথির স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। শরীর সুস্থ রাখার জন্যে নিয়ম পালন করাও সম্ভব হত না সেকালের আসরের রীতির জন্যে। অধিক রাত্রির পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি, গান ইত্যাদির পরে আরও বেশি রাতে ঠাণ্ডা দুধ, খাবার আহার্য। এসব কারণেই হয়ত তাঁকে হাঁফানি রোগে আক্রান্ত হতে হয় এবং মৃত্যু ঘটে মাত্র ৫১ বছর বয়সে (সিপাহী বিদ্রোহের বছরে)। সেবার দুর্গাপূজা উপলক্ষে কাশিমবাজারে পাঁচালি গান করার পর বাড়িতে এসেই তাঁর জ্বরবিকার হয়—কাশিমবাজারের জলহাওয়া সেকালে স্বাস্থ্যকর ছিল না।

অসুখ অতিশয় বৃদ্ধি পায়। কালীপূজার আগের দিন। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে দাশরথি নিজেই ব্যবস্থা করে গঙ্গাযাত্রা করলেন।

কথিত আছে, সজ্ঞানে মৃত্যু হয় তাঁর। স্বভাবকবি ও স্বভাবগায়ক দাশরথির মৃত্যুকালে গানেরও প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু তাঁর কোন কোন আধুনিক গবেষক ও জীবনী-লেখকের ধারণা যে গান রচনার বা গাইবার জনশ্রুতিটি প্রবাদ মাত্র, সত্য নয়।

এ বিষয়ে আর একটি বিবরণী দেওয়া যাক। স্বনাম-প্রসিদ্ধ শিল্পশাস্ত্রী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলী) মশায় তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা ও ভারতের শিল্পকথা'য় বলেছেন—

"মাসের মধ্যে দু'একদিন আর একজন গায়ক আসতেন। তাঁর নাম বক্কেশ্বর মুখুজ্যে। ইনি ছিলেন দাশরথি রায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য।...তাঁর মৃত্যুর পরে বক্কেশ্বর মুখুজ্যেই দাশু রায়ের পাঁচালির প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনি হাওড়ার পুলের কাছে স্ট্র্যাণ্ড রোডের একটি দোতলার ঘরে থাকতেন। আমাদের বাড়িতে অনেকবার এবং বড়বাজারের বারোয়ারী পূজার নানা আসরে তাঁর পাঁচালি গান হয়েছে। ইনি আজীবন কলকাতা শহরে পাঁচালি গান গেয়ে তাকে চালু রেখেছিলেন।...বক্কেশ্বরের গলায় দাশরথির আর একটি গান খুব সরস ও মর্মস্পর্শী হত। সেটি হল অন্তিমকালে গঙ্গার তীরে বসে রচিত তাঁর শেষ "ইচ্ছাপত্র":

তোরা সব ফিরে যা ভাই তিনু রে।
আমি যাব না, যেতে পারব না,

অন্তিমকালে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে রে ॥
আমার যা কিছু সব টাকাকড়ি   ঘর দরজা বাগান বাড়ি
একমাত্র অধিকারী তিনকড়ে ভাই তুমি রে।
ফিরে যা' ভাই তিনু রে ॥

একটু বড় হয়ে বঙ্কেশ্বরবাবুকে প্রশ্ন করতাম—'গঙ্গার তীরে মৃত্যুর মুখে গান রচনা করা কি সম্ভব?' বঙ্কেশ্বরবাবু জোর করে বলতেন যে, 'গানখানি দাশু রায়েরই রচনা। কারণ তিনি মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে নাকি হেঁটে গিয়ে গঙ্গার তীরে শয়ন করেছিলেন এবং বেশ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।'

সলিসিটর গঙ্গোপাধ্যায় মশায় যে গানটিকে যথার্থত দাশরথির "ইচ্ছাপত্র" (will) বলেছেন, সেই গানটি রচনার কথাই দাশরথির জীবনীকারেরা প্রবাদ বলেছেন। তাঁরা (অর্ধেন্দ্রকুমারের মতন) মৃত্যুকালে গান রচনা অসম্ভব স্থির করেছেন এই ভেবে যে সেই অন্তিমকালে কি করে গান লিখবে মানুষ?

কিন্তু আসন্নকালে গান রচনা সম্ভব নয় কেন, যখন সে অবস্থায় গান গাইবারও কথা জানা যায়?

দাশরথির ওই গানটির ভাষার মধ্যেই স্পষ্ট বলা রয়েছে যে, তা গঙ্গা-তীরে এবং কবির আসন্নকালে রচিত। এমন কথা দাশরথি জীবনের অন্য কোন সময়ে রচনা করতে পারেন না এবং অন্য কোন কবিও দাশরথির নাম করে এমন গান প্রচলন করেননি। তা ছাড়া, বঙ্কেশ্বর মুখুজ্যে ছিলেন দাশরথির সাক্ষাৎ শিষ্য। তিনি যখন জোর দিয়ে জানান যে, গানটি দাশরথিই অন্তিমকালে গঙ্গার ধারে রচনা বরেছিলেন—তখন সেকথা ধর্তব্য হবে না কেন?

আরও একটি কথা। গানটি কি দাশরথি কাগজ-কলম নিয়ে বসে লিখে-ছিলেন, না মুখে মুখে রচনা? মনে হয়, শেষেরটিরই সম্ভাবনা বেশি। জীবনের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে যিনি গঙ্গাযাত্রা করেছেন, তিনি গান লেখবার জন্যে নিশ্চয় কাগজ-কলম-কালি ইত্যাদি নিয়ে যাননি সঙ্গে। অসংখ্য পাঁচালি ও কবির লড়াইয়ের আসরে যিনি মুখে মুখে রচনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তিনি অন্তিমকালে কনিষ্ঠ তিনকড়িকে উদ্দেশ করে মুখে মুখেই এই শেষ গানটি রচনা করে শুনিয়েছিলেন মনে হয়!

তা ছাড়া নবকান্ত চটোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা গানের সঙ্কলনগ্রন্থ

'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে (৩য় সংস্করণ, ১৮৯৩ খৃঃ, পৃঃ ৫৪৮, ৯৭৮ সংখ্যক গান) গানটিকে স্পষ্টভাবে দাশরথির মৃত্যুকালের সঙ্গীত নামে মুদ্রিত করা হয়। ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী থেকে এখানে সম্পূর্ণ গানখানি উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

তোরা সব ফিরে যা ভাই তিনু রে,
অন্তিমকালে দাশরথি ভাগিরথীর তীরে রে ॥
ভবে আসতে হয়েছে একা, যেতে হবে একা রে।
আমার যতকিছু টাকা কড়ি, ঘর দরজা বাগান বাড়ি,
সকল ধনের অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে।
হয়ে বিচক্ষণ কর রে রক্ষণ,
ঘরে বিধবা রমণী রইল তারে অন্ন দিও রে ॥
ওরে তোরা ভাবিস রে একা, কিন্তু আমি নইরে একা,
বসে আছি আমি মায়ের কোলেরে।
বলে ভগবান যদি বের হয় রে প্রাণ,
অন্তিমকালে দাশরথির ভাগরথীর তীরে রে ॥

ওস্তাদ রমজান খাঁও জীবনের শেষ ক্ষণে গান গেয়েছিলেন এবং তা রীতিমত তাঁর উপযুক্ত সঙ্গীত। তাঁর মৃত্যুকালের সেই বিচিত্র কথা 'সঙ্গীতের আসরে, পুস্তকের 'কলকাতা আজব শহরে' অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেজন্য পুনরুল্লেখ করা হল না।

এবার স্বনামধন্য গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুকালে গান গাওয়ার প্রসঙ্গ।

আচার্য অঘোরনাথ শেষ জীবনে কাশীবাসী হয়েছিলেন। তবে সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নেননি সেখানেও। শেষের প্রায় ৭/৮ বছর তিনি কাশীতেই বেশি থাকতেন, মাঝে মাঝে আসতেন স্বগ্রাম রাজপুরের বাড়িতে। বারাণসীতে তাঁর বেশ কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সেখানকার নানা আসরেও তিনি গেয়েছেন শেষ বয়সে। কাশীর সন্তান গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেও (ধ্রুপদী) তখন নিয়মিত শিক্ষা দিয়েছেন। আত্মীয় ও শিষ্য অমরনাথ ভটাচার্যও বছরে দু-তিনবার কাশীতে এসে চক্রবর্তী-মশায়ের কাছে শিখেছেন তখন।

এমনিভাবে অঘোরনাথের কয়েক বছরের কাশীবাস-পর্ব চলেছিল। তারপর

সব শেষ হয়ে এল একদিন। কিন্তু 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' রূপ নিয়ে তাঁর জীবনের অন্তিমক্ষণ দেখা দেয়নি। সকরুণ হলেও শান্ত এবং অপ্রত্যাশিত, সংঘাতহীন সেই বিদায়ের মুহূর্ত। মৃত্যুর কোন গ্লানিমা সেই পরম লগ্নটিকে কলুষিত বা বিকৃত করতে পারেনি। কিংবা বলা যায়, মৃত্যু যেন এই চিরসত্য চিরবিচ্ছেদকে রূপায়িত করে অদৃশ্য হয়ে গেল চকিতে।

অঘোরনাথের অতি আকস্মিক মৃত্যু হয়। বয়স তখন ৬৩ বছর চলেছে। সেকালের হিসাবে রীতিমত বৃদ্ধ বয়স। কিন্তু শরীর তাঁর জরাগ্রস্ত হয়নি। কেশ, গুম্ফের পক্কতা দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু শরীর ও মুখের অবয়ব তখনো প্রায় অটুট। মেদবর্জিত সুঠাম দেহপট। অল্পস্বল্প ভ্রমণ প্রত্যহই করেন। অতি প্রত্যুষে নিয়মিত শয্যাত্যাগ। ঊষাকালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গীত শিক্ষা দান। সবই পূর্বেকার মতন চলেছে। সঙ্গীত-শক্তিতেও পটু আছেন। সকালে এবং কখনো সন্ধ্যায়, গানের আসর বসে, তিনি গান করেন প্রায় আগেকার মতন। তবে কণ্ঠস্বর আগের তুলনায় কিছু নিস্তেজ হয়ে এসেছে। তাহলেও গান গাইতে কোন অসামর্থ্য বোধ নেই। ধ্রুপদ গান, ভজনও গেয়ে থাকেন। ধ্রুপদাঙ্গে গানে কিংবা টপ্পার ধরনে গান করেন ভজন। বেশির ভাগই প্রতিদিনের ঘরোয়া আসর। বারাণসীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্রতিবেশী কেউ কেউ তাঁর সেসব আসরে উপস্থিত হন।

এমনিভাবে বাইরে থেকে দিন বেশ নিরুপদ্রবে একটির পর একটি চলে যায়। নিশ্চিন্ত, শান্তির দিন সব। কিন্তু সেই শান্তিময় পরিবেশে, তাঁর আপাত সুস্থ দেহের মধ্যে অলক্ষ্যে মৃত্যু-কীট দানা বেঁধেছিল তা বাইরে বুঝতে পারেননি কেউ।...

তিনি তখন খালিশপুরায় থাকতেন। এখানে শ্রীরামপুরের গোস্বামীদের জগদ্ধাত্রী মন্দির। তার পাশেরই বাড়িতে চক্রবর্তী মশায়ের বাস।

সেদিন সকালবেলা বাইরের দিকের ঘরটিতে তিনি বসে আছেন। আগের দিন ছিল শিবরাত্রি। উপবাস করেছিলেন। এবার পারণ করবেন। বাড়িতে ভগিনীকে বললেন পায়স আনতে।

তারপর বললেন—একটা ভজন গেয়ে নিই।

সেই ভজন গান গাইতেই অকস্মাৎ ঢলে পড়লেন এক পাশে। সেখানে তখন বাইরের কেউ ছিলেন না। কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, অন্তরের প্রেরণাতেই গাইতে আরম্ভ করেছিলেন অঘোরনাথ।

ভগিনী পায়সের বাটি নিয়ে এসে দেখেন—তিনি অনন্ত সুরলোকে প্রয়াণ করেছেন।

স্বনামধন্য সুর-শিল্পী আবদুল করিম খাঁ-ও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অঘোরনাথের মতন গান গেয়েছিলেন। কিন্তু অঘোরনাথের সঙ্গে তাঁর ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ছিল যে, চক্রবর্তী মশায় শুনতে পাননি মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। মৃত্যু একেবারে অতর্কিতে এবং অতি অকস্মাৎ এসেছিল। প্রতিদিনের মতন সেদিনও গান গাইবার সময় তাঁর মৃত্যু হয় আচম্বিতে।

কিন্তু আবদুল করিম খাঁর বিষয়ে সেকথা বলা চলে না। তাঁর মৃত্যু এক হিসেবে আকস্মিক ভাবে হলেও, তার পরোয়ানা তিনি পেয়েছিলেন কিছুক্ষণ আগে। বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে। শেষ বিদায়ের ক্ষণ সমাসন্ন। সুতরাং শেষ করণীয় যা আছে এখনি করে নিতে হবে। আর সময় নেই। গৃহ থেকে বহু দূরে, এক যাত্রাপথের মাঝখানে হঠাৎ মহাযাত্রার ডাক তাঁর কানে পৌঁচেছিল। তিনি ইতিকর্তব্য স্থির করে নিতে কিছু সময় পেয়েছিলেন, তাই সঙ্গীতেই জীবনের শেষ নিবেদন জানিয়ে গেলেন।

যথার্থ সঙ্গীত-সাধক ছিলেন আবদুল করিম খাঁ, আবাল্য তাঁর সঙ্গীতের সাধনা। সঙ্গীত তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। অন্তরের গভীরতম প্রকাশের বহন তাঁর সঙ্গীত। তাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলের রহস্যালোকে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার শেষ আকুতি সঙ্গীতেই ব্যক্ত হয়েছিল। সচেতন ভাবেই তা করবার অবকাশ পেয়েছিলেন তিনি, সে সময় অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত।

তাঁর সেই বিয়োগ-পঞ্জীর বিবরণ অনেকাংশে জানা গেছে, পরে তা যথাসম্ভব বর্ণনা করা হবে। এখানে তাঁর সঙ্গীতজীবনটি একবার জরিপ করে নিতে ইচ্ছা হয়।

তাঁর সমকালে তুল্য কণ্ঠসঙ্গীত-শিল্পী বেশি ছিলেন না সমগ্র ভারতবর্ষে। ভারতীয় সঙ্গীতে বহুকাল তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় থাকবে—প্রদেশে প্রদেশে আসরে, জলসায়, সম্মেলনে অসংখ্য শ্রোতাদের প্রাণে সাড়া জাগাত, সকলের মুখে মুখে ফিরত যে নাম।

তিনি যে সঙ্গীতের সাধক ছিলেন তা তাঁকে আসরে সামনাসামনি দেখলেও সহজেই ধারণা হত। ক্ষীণ, নাতিদীর্ঘ, অতি সাধারণ অবয়ব ও মুখভাবে।

তবে সাধারণ মানুষের মতন বহির্মুখী, পারিবার্শ্বিক সর্ব বিষয়ে সচেতন ও সদাজাগ্রত আদৌ নন। বাহ্য বহু বিষয়ে উদাসীন।

মাথায় একটি প্যাঁচদার পাগড়ি ভিন্ন বেশভূষা সাধাসিধা; চাল-চলনও। প্রথম দর্শনে কিংবা অ-সাঙ্গীতিক পরিবেশে দেখলে মনে হয়—ব্যক্তিত্বহীন।

কিন্তু অসাধারণ হয়ে উঠতেন এবং শিল্পী-জনোচিত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেত গান আরম্ভ করলে। তখনই আবদুল করিম খাঁর স্বরূপ। গান একটু অগ্রসর হলেই সুরের মধ্যে একান্তভাবে আত্মস্থ হয়ে যেতেন। সঙ্গীত-ক্রিয়ার অনুধ্যানে সেই আত্মসমাহিতভাব এক দর্শনীয় বস্তু ছিল আসরে। মুখভাবে এক আবিষ্ট প্রকাশ, চোখের দৃষ্টিতে ধ্যানের মহিমা। শ্রোতাদের যেমন সুরের আবেশে আচ্ছন্ন করতেন, তেমনি নিজের সৃষ্টিতে নিজেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন। সঙ্গীতের একটি নিষ্কম্প ধ্যানী-সত্তা যেন। সেই রূপে অতি আকর্ষক ছিল তাঁর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব।

তেমনি রঞ্জনী সেই সুরকণ্ঠ। শ্রোতারা সকলেই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর স্বর বলশালী বা উদাত্ত ছিল না। বরং ঝিম্ আওয়াজ বলা যায়। কিন্তু যেমন সুমিষ্ঠ, তেমনি সুরেলা। শ্রী ও মাধুর্যমণ্ডিত। চিকণ, মনোরম কারুকর্মে শোভমান আর সে কাজের সূক্ষ্ম কারিগরি শ্রোতাদের মনে অনুরণন জাগায়। কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহু সাধনায় লাভ-করা শিল্প-নৈপুণ্য। সত্যকার কলাবতের কণ্ঠ।

গীতিরীতিতেও তাঁর নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। রাগবিস্তারে অসামান্য অধিকারী হলেও অল্পক্ষণ মাত্র চলে তাঁর আলাপচারি। গান ধরে নিতে বিলম্ব করেন না। গানের অঙ্গে অঙ্গেই রাগের রূপায়ন হতে থাকে। গানে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে চলে রাগের আবাহন। রাগের স্বকীয় রূপ ক্রমে অবয়বপ্রাপ্ত হয়, ছন্দিত সুরের লীলায় তান কর্তবের অলঙ্করণে সুসজ্জিত হয়ে।

আর তাদের কি বিপুল বৈচিত্র্য। সেইসব মনোমুগ্ধকর তানের কত সঞ্চয়, যেন অফুরন্ত। ঝরনা ধারার স্বচ্ছন্দ গতিতে তানের পর তান নিঃসৃত হয়, কিন্তু কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটে না। প্রত্যেকটি তান স্বতন্ত্র, কোনটিই আগেকার অনুকৃতি নয়।

তাঁর ছন্দের কাজও প্রত্যেকটি আলাদা রকমের। দরদী কণ্ঠে ছন্দ-জ্ঞান ও রসবোধের যুগল মিলন। সেই সঙ্গে কণ্ঠের বিস্তারও স-বিস্ময়ে লক্ষ্য করবার মতন—তিন সপ্তকে তার অবাধ বিচরণ। এই সমস্ত গুণের যোগফলে

শ্রোতাদের তিনি আসরে দীর্ঘকাল মোহাবিষ্ট করে রাখেন।

খেয়াল, ঠুংরিতেই সিদ্ধ গুণী বলে সকলের সুপরিচিত। কিন্তু অনেক সময় যেমন দেখা যায় শিল্পীর কোন কোন গুণ সাধারণের অগোচরে থাকে, তেমনি তাঁরও সঙ্গীতকৃতির পূর্ণ পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশ পায়নি। একথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে তিনি একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ গায়কও ছিলেন।

তেমনি অনেকের কাছেই এটি সম্ভবত সংবাদ মনে হতে পারে যে আবদুল করিম ছিলেন একজন বীণকারও (যেমন ছিলেন বড় গোলাম আলীর পিতৃব্য খেয়াল-গুণী কালে খাঁ)। তাঁর এই শেষোক্ত পরিচয়ের একটি স্থায়ী নিদর্শনও আছে। মৃত্যুর মাস দুয়েক আগে বীণাবাদনের রেকর্ড করেছিলেন আবদুল করিম খাঁ সাহেব।

বীণা বাজাবার কথায় তাঁর সঙ্গীত-কৃতির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা আসে।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতধারার সঙ্গে কর্ণাটকী বা দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের অনেকখানি পার্থক্য আছে রীতিনীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গীত-শৈলীর এই দূরত্বকে সঙ্গীতক্রিয়ার মধ্যে নিকটতর করতে যাঁরা সচেষ্ট হন, আবদুল করিম খাঁকে উত্তর ভারতে তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়।

দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের রীতিনীতি তিনি অনুশীলন করেছিলেন এবং এই দুই সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রয়োগে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করেছিলেন তাঁর উপস্থাপনায়। তাঁর নিজের সার্গম-শৈলী এ বিষয়ে একটি দিক্-দর্শনী।

তাঁর ব্যক্তি-জীবনেও দাক্ষিণাত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, তবে সেকথা এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। কথা হচ্ছে তাঁর দাক্ষিণাত্য পদ্ধতির প্রতি প্রীতি। দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গীত বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবার জন্যে, তা যথাসম্ভব আয়ত্ত করবার জন্যে তিনি দীর্ঘকাল মাদ্রাজে বাস পর্যন্ত করেছিলেন।

কর্ণাটকী পদ্ধতির প্রসিদ্ধ বীণকার বীণা ধনম্মল তাঁর বন্ধুস্থানীয়। বীণা ধনম্মলের বাদন-রীতি ঘনিষ্ঠভাবে বহুদিন শোনেন এবং তাঁর বীণা যন্ত্রে সূক্ষ্ম কারুকর্মের ব্যঞ্জনার দৃষ্টান্তে নিশ্চয় লাভবান হন। সেই সঙ্গে দাক্ষিণাত্য রীতির সঙ্গীতেও অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। তাঁর বীণ-চর্চার কথা যে আগে উল্লেখ

করা হয়েছে, সে বিষয়েও তিনি বীণা ধনম্মলের বাদন থেকে হয়ত প্রেরণা পেয়ে থাকবেন।

অবশ্য গুণী বীণকারের দৃষ্টান্তের অভাব খাঁ সাহেবের নিজের বংশেও নেই। গোয়ালিয়র দরবারের বিখ্যাত বীণাবাদক বন্দে আলী খাঁ, আবদুল করিমের পিতৃকুল গৌরবান্বিত করেন। তাঁদের ঘরানা প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হবে যথাস্থানে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দক্ষিণ ভারতীর সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি উত্তরাঞ্চলের পদ্ধতির একটি শিল্পসুন্দর সংমিশ্রণ করেছিলেন। আর এই নব রূপায়নের কার্যে দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের আদর্শরূপে যাঁরা তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এক নেতৃস্থানীয় হলেন উক্ত গুণী বীণা ধনম্মল।

কর্ণাটকী রীতি আয়ত্ত করবার জন্যে এবং তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার জন্যে আবদুল করিম খাঁ একটি স্বকীয় গায়ন-শৈলীর রূপ-গঠন করেন। তাঁর সেই মৌলিক চালের গানের জন্যে তিনি চিহ্নিত ছিলেন সঙ্গীত জগতে।

বংশধারার দিক থেকে তিনি কিরানা ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। দিল্লীর নিকটবর্তী কিরানা নামে প্রসিদ্ধ গ্রামটি কর্ণপুর নামেরই অপভ্রংশ। এই গ্রাম একটি ভারত-প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পরিবারের জন্ম দেয়। বেশ কয়েকজন গুণী একাধিক পুরুষে পরিবারটিকে ধন্য করার ফলে গ্রামের নামটি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ঘরানার মর্যাদা লাভ করে।

কিরানা ঘরানার নাম-যশ শোনা যেতে থাকে ভারতের নানা দরবারে ও সঙ্গীতের আসরে। আবদুল করিম খাঁর সঙ্গীত-জীবনের আগে থেকেই কিরানা ঘরানার নাম সুপরিচিত। এই সঙ্গীত-সাধক রবিবারে জন্ম লাভ করে তিনি বংশের গৌরব বহুলাংশে বর্ধিত করেন।

কিরানা ঘরানা অর্থে যে একটি বৈশিষ্ঠ্যপূর্ণ চাল বা সঙ্গীতশৈলী, তা আবদুল করিমের আগেকার কালে ব্যবহার করা হয়ত ঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে ঘরানা বলতে কিরানা গ্রামের এই সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারকে ধরা যায়। কারণ এ বংশের সকলে একটি অনন্য কিংবা বিশিষ্ট সঙ্গীতশৈলীর সাধনা করেননি, যেমন হয়েছে অন্য নানা ঘরনার ক্ষেত্রে। এমন কি, এ বংশে সকলে গানেরও চর্চা করেননি। বীণকার বন্দে আলীর নাম আগেই করা হয়েছে। তেমনি গীতিরীতিতেও এ বংশের অনেকে বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করেছেন।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এ বিষয়ে! উক্ত বীণাবাদক বন্দে আলী খাঁ

সাধারণত ধ্রুপদাঙ্গে বীণাবাদন করতেন তার পরণ বাজাতেন মৃদঙ্গ সঙ্গতে। তানসেনের পুত্রবংশীয় গুণী নির্মল শাহের তিনি শিষ্য। বারাণসীর ধ্রুপদ-গুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে পরিবর্তন, পুস্তকে কাশীর একটি ধ্রুপদের আসরে বন্দে আলী খাঁর বীণা-বাদনের বর্ণনা করেছেন। আবার অন্য সূত্রে জানা যায়, বন্দে আলী খাঁ নাকি ঠুংরি অঙ্গে বাজিয়েছেন কোন কোন আসরে। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রহিম আলী ছিলেন গায়ক এবং দিল্লীনিবাসী। তা ছাড়া গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য খেয়াল গায়ক হদ্দু খাঁ ও তাঁর পুত্র রহমত খাঁ কিরানার এই বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু তাঁদের গীতিরীতির সঙ্গে কিরানা ঘরানার অন্যান্য গায়কদের পার্থক্যের কথা বলা বাহুল্য।

আবার আবদুল করিম উক্ত রহমৎ খাঁর শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। এবং নিজের পিতা ও খুল্লতাত প্রভৃতি আত্মজনদের তালিমও পান শৈশব থেকে। কিন্তু একথা সর্ববাদীসম্মত যে, তিনি (আবদুল করিম) স্বকীয় চালেই আসরে গাইতেন।

এ বিষয়ে এত কথা বলার উদ্দেশ্যে এই যে, কিরানা ঘরানার বা পরিবারের অন্তর্গত সঙ্গীতজ্ঞরা একই ঢংয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন না—অর্থাৎ কিরানা ঘরানা কোন একটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত চাল নয়; একটি সঙ্গীতজ্ঞ বংশ বা পরিবার।...

বরং কিরানা ঘরানা কথাটি প্রয়োগ করা যায় আবদুল করিম খাঁর সঙ্গীতকৃতি থেকে। তিনি একটি বিশিষ্ট চালে গাইতেন এবং তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের ধারায় সেই শৈলী অনেকাংশে বজায় থাকে। যেমন, আবদুল করিমের শিষ্যবর্গ আবদুল ওয়াহিদ (ভাগিনেয়) রামভাই কুন্দগোলকর (সোয়াই গন্ধর্ব নামে সঙ্গীতসমাজে সুপ্রসিদ্ধ,) গণেশচন্দ্র বেহরে (বেহরে বুয়া নামে অধিকতর সুপরিচিত,) সুরেশবাবু মানে, রোশনারা বেগম প্রভৃতি। আবার সোয়াই গন্ধর্বের শিষ্যদের মধ্যে নাম করা যায় গঙ্গুবাই হাঙ্গল, ভীমসেন যোশী, বাসবরাজ রাজগুরু, সরস্বতী বাঈ রানের। তেমনি সুরেশবাবু মানের শিষ্য মানিক বর্মা ও হীরাবাঈ বরোদেকার। আবার সরস্বতী বাঈ রানে জ্যেষ্ঠা ভগিনী হীরাবাঈ বরোদেকারের শিক্ষাও পান। একথা সকলেরই জানা আছে যে, হীরাবাঈ ও সরস্বতী বাঈ আবদুল করিমেরই কন্যা।

এইভাবে আবদুল করিম থেকে আরম্ভ করে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য মণ্ডলী নিয়ে কিরানা ঘরানার পত্তন হয়, বলা যায়। কারণ আবদুল করিম খাঁ

যে একটি বিশিষ্ট গায়ন-শৈলী বা চাল প্রবর্তন করেন, উল্লিখিত শিল্পীরা সকলে সাধ্যমতন অনুসরণ করেন সেই সঙ্গীত ধারা।

আনুমানিক ১৮৭১ খ্রীঃ আবদুল করিম খাঁর এই পরিবারে জন্ম হয়। সঙ্গীত-ব্যবসায়ী বংশ। সুতরাং নিতান্ত শৈশবকালে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ হ'ল—বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। প্রথম তালিম পিতার কাছে। তারপর পিতৃব্যদের কাছে।

পরিবারের সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ, যদিও প্রত্যেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। পিতৃকুলে বন্দে আলী খাঁ ও রহিম আলীর নাম আগেই করা হয়েছে, তা ছাড়াও এদিকে আছেন রহমন বক্স, নান্নে খাঁ, আবদুল্লা প্রভৃতি। তেমনি মাতৃকুলের দিক গৌরবান্বিত করেছেন গোয়ালিয়রের সুবিখ্যাত হদ্দু হস্সু খাঁর ধারা তাঁদের পিতামহ নথন পীর বক্সের সময় থেকে।

এমনি একাধিক ধারার উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতিক পরিবেশে আবদুল করিমের সঙ্গীত-জীবন গঠিত হয়। এবং অতি অল্প বয়সেই গুণী গায়ক রূপে খ্যাতিমান হন তিনি।

পিতা ও পিতৃব্যদের কাছে প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করবার পর (হদ্দু খাঁর পুত্র) রহমৎ খাঁর তালিমও তিনি পান। রহমৎ খাঁ স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত কৃতী হয়েছিলেন খেয়াল অঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সমসাময়িক কালে তাঁর সমকক্ষ খেয়াল-গায়ক অতি অল্পই ছিলেন উত্তর ভারতে। রহমৎ খাঁর মধ্যবয়সেই মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল, নচেৎ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেয়াল-গুণী হিসাবে সঙ্গীত-জগৎ থেকে অবসর নিতে পারতেন।

আবদুল করিম খাঁ ভিন্ন তাঁর আর একজন শিষ্যের কথা জানা যায়, যিনি সাময়িকভাবে শিক্ষার সুযোগ পান রহমৎ খাঁর কছে। তিনি হলেন কাশীর ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী জীবনে ধ্রুপদ চর্চা করলেও প্রথম জীবনে গোপালবাবু খেয়াল গায়ক (এবং তবলাবাদকও) ছিলেন। যে সময় রহমৎ খাঁ একবার বছর খানেক কাশীতে অবস্থান করেন, গোপালচন্দ্র খাঁ সাহেবের কাছে শিখেছিলেন সেই সুযোগে। রহমৎ খাঁর অতিরিক্ত নেশার ফলে মস্তিষ্কের পীড়া তখন মাঝে মাঝে দেখা দিলেও অন্য সময়ে স্বাভাবিক থাকতেন। গান গাইতেন, শিক্ষাও দিতেন। অবশ্য সাধারণের পক্ষে তাঁর শিক্ষা পাবার সুবিধা ছিল না কোন সময়েই। গোপালচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ও অধ্যবসায়ী এবং পশ্চিমের বাসিন্দা হওয়াতেই তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল।

আবদুল করিম খাঁ জানতেন যে, গোপালবাবু রহমৎ খাঁর শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেজন্যে একটি প্রীতির সম্বন্ধ অনুভব করতেন তাঁর সঙ্গে।

তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, খাঁ সাহেব যখন প্রথম কলকাতায় আসেন এবং ভবানীপুরে তাঁর গান হয়। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দেবার অনেক আগে সেবার যখন আবদুল করিম প্রথম এখানে আসেন দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের উদ্‌যোগে।

এখন আবদুল করিমের প্রথম জীবনের কথায় আবার ফেরা যাক। প্রতিভাধর তিনি, স্বাভাবিক সুকণ্ঠ ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে মাত্র ১৫।১৬ বছর বয়সেই সঙ্গীতে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন।

সূক্ষ্ম কারিগরিতে ভরা তাঁর স্থিতিস্থাপক কণ্ঠ তাঁর প্রাথমিক সঙ্গীত-জীবন থেকেই শ্রোতাদের আকর্ষণ করত তাঁর গানের দিকে। তাঁর মতন এত অল্প বয়সে খুব কম কলাবতই সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হন জুনাগড়ের রাজপরিবারে।

শুধু তাই নয়। রীতিমত জলসার অনুষ্ঠান করে তখনই তিনি মুজরো নিতে আরম্ভ করেছেন। সে সময় থেকেই নানা আসর থেকে তাঁর ডাক আসতে থাকে এবং যশ, অর্থ দুই-ই উপার্জন করতে থাকেন তিনি।

জুনাগড় রাজপরিবারে নিযুক্ত হবার দু-বছর পরে অর্থাৎ তাঁর ১৮ বছর বয়সে বরোদার গায়কোয়াড়ের দরবারে গায়করূপে তিনি যোগ দেন। তার পর তাঁর সুনাম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বরোদা দরবারেও বেশীদিন নিযুক্ত থাকেননি তিনি। সে কাজ ছেড়ে দেবার পর বাইরের নানা দরবার ও সঙ্গীতাসর থেকে আমন্ত্রিত হতে থাকেন এবং সেই সব আসরে যোগ দিয়ে বৃহত্ত সঙ্গীত-সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেন।

উপার্জন যখন ভালভাবে হতে থাকে তার একটি বড় অংশ ব্যয় করতে আরম্ভ করেন সঙ্গীত-চর্চার বিস্তারের জন্যে। বছরের পর বছর ধরে নিজের অর্থে নানা স্থানে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে এক একটি কেন্দ্র স্থাপন করে যান। সঙ্গীতজ্ঞ-রূপে তাঁর নাম সমধিক পরিচিত, কিন্তু সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও উদ্‌যোগী পুরুষ হিসাবেও তাঁর নাম স্মরণীয়।

তাঁর উদ্‌যোগে বিভিন্ন সঙ্গীত-কেন্দ্র স্থাপিত হয় ভারতের নানা জায়গায়—বোম্বাই, পুণা, মিরাজ, বেলগাঁও ইত্যাদিতে এবং সেই সব সঙ্গীত-কেন্দ্রে ভাবীকালের জন্যে অনেক সঙ্গীতজ্ঞের জীবন গঠিত হয়েছে। তাঁর

এই অবদানটির কথা তেমন সুবিদিত নয় পূর্বাঞ্চলের সঙ্গীতজ্ঞ মহলে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের সঙ্গীত-সমাজে সেকথা বহুজনেরই জানা আছে।

তা ছাড়া আরও নানা প্রকারে সহায়তা করতেন তিনি উদীয়মান গায়ক-বাদকদের। এ বিষয়ে মিরাজের বার্ষিক উরুস্ উৎসবটির কথা বলা যায়। সেখানে খাজা মিরাজ সাহেবের। দরগায় প্রতি বছর যত সঙ্গীতজ্ঞ জমায়েত হতেন তাঁদের মধ্যে তরুণ সঙ্গীতজ্ঞদের প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন এবং প্রয়োজন মতন সাহায্যও করতেন তিনি।

সঙ্গীত বিষয়ে এমনি নানা কার্যধারা সত্ত্বেও খাঁ সাহেবের মধ্যে ছিল একটি আত্মসমাহিত ভাব—আসরে শুধু নয়, ব্যক্তি জীবনেও।

অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, নিরুপদ্রব মানুষ। আত্মপ্রচারের জন্যে আদৌ উন্মুখ ছিলেন না, প্রচার বা নাম যশ যা হয়েছে, তার জন্যে তাঁকে তৎপর হতে হয় নি। বরং বিনয়ী ছিলেন বলা যায়।

তাঁর গুণগ্রাহীরা একাধিকবার তাঁকে ইউরোপে গুণপনা প্রদর্শনের জন্যে পাশ্চত্ত্য জগতে যাবার অনুরোধ জানান, এমন কি ইউরোপের কোন কোন সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি আমন্ত্রিতও হন। কিন্তু সেই অসামান্য সম্মান-লাভের সুযোগ নিতে রাজি হননি আবদুল করিম।

তাঁর সঙ্গীতকৃতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে আরও দু-একটি কথা বলা যায়। তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ কতখানি তৈরী ছিল, এটি তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। বোম্বাই ফিলহার্মনিক সোসাইটির স্থাপনকর্তা মিঃ ক্লেমেন্টস্ একবার শ্রুতি বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন। তখন আবদুল করিম নিজের কণ্ঠে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়ে দেন সপ্তকের মধ্যে শ্রুতির অবস্থান কিভাবে হয়। মিঃ ক্লেমেন্টস্ আবদুল করিমের প্রদর্শিত শ্রুতি বৈজ্ঞানিক বিচারসহ বলে সমর্থন জানান।

এক একজন গুণীর কোন একটি রাগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। তিনি বিশেষভাবে সেইটির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে আবদুল করিম সিদ্ধ ছিলেন ভৈরবী রাগিণীতে। তাঁর এই এক আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল যে, ভৈরবী তিনি নানা রূপে গেয়ে যেতেন। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের জন্যে অন্য রাগের স্বর-সহায়তা কখনও গ্রহণ করতেন না।

বাঙলার সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণ তাঁর গান শোনবার প্রত্যক্ষ সুযোগ পায় তাঁর জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক

অধিবেশন উপলক্ষে সেবার আবদুল করিম কলকাতা আসেন। তার কয়েক বছর আগে দিলীপকুমার রায় খাঁ সাহেবকে কলকাতায় প্রথম নিয়ে আসবার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই প্রথম-বারে এখানকার অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে তেমন জানতেন না এবং তাঁর গান শোনাবার সুযোগও পাননি অনেকে। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের কল্যাণে তাঁরা খাঁ সাহেবের সঙ্গীত-কৃতির আস্বাদন করে তৃপ্ত হন।

সে হল ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। সেই বছরেরই শেষ দিকে তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, যার প্রসঙ্গ পরে বর্ণনা করা হবে। সেবার ঐ সম্মেলনের পক্ষ থেকে তাঁকে যদি আমন্ত্রণ করে আনা না হত, তা হলে সে সুযোগ বাঙলা দেশ আর কখনও লাভ করতে পারত না।

সম্মেলনের সেবারকার অধিবেশনে আবদুল করিম খাঁ প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন দ্বিতীয় দিনে। ১৯৩৭-এর জানুয়ারির ৩ তারিখে। সকালবেলার আসর। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশাবরীতে ধ্রুপদ, রামকিষণ ও ভবানীসেবক মিশ্র ভ্রাতাদের রামকেলিতে দ্বৈতকণ্ঠে খেয়াল, তার পর মুস্তাক আলী খাঁ তোড়ি ও ভৈরবীর গৎ সেতারে বাজাবার পর সকলের শেষে আবদুল করিমের গান আরম্ভ হল। উৎকর্ণ শ্রোতাদের সামনে তিনি আড়াই ঘণ্টারও বেশিক্ষণ একাসনে বসে গেয়ে গেলেন সেদিন।

সেই অন্তর্মুখী, আত্মসমাহিতভাবে তিনি গান আরম্ভ করলেন, তাঁর সুরের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে শ্রোতারাও ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। যেমন তাঁর সমস্ত আসরেই হয়ে থাকে। খেয়াল ও ঠুংরি দু-রকমই গাইলেন। প্রথমে ধরলেন বিলম্বিত লয়ে মিঞা-কি-তোড়ি—"দ'ইয়া বতা দুবারা বায়ী।" গানখানি শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করলেন ঐ রাগেই দ্রুত লয়ের গান—'বেগুণ গুণ গাওয়ে।'

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মিঞা-কি-তোড়ির গান দু'খানি গেয়ে যখন শেষ করলেন, বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনির সঙ্গে শ্রোতারা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি দ্বিতীয় গানটি গাইতে আরম্ভ করলেন—শুদ্ধ আশাবরী, বিলম্বিত ঝুমরা তালে: 'বিচাওয়া মনওয়া।' শুদ্ধ আশাবরীর রূপায়ণ সম্পূর্ণ করে অবশেষে ধরলেন তাঁর চিরঃস্মরণীয় ভৈরবীর ঠুংরিটি—'যমুনা কি তীর।'

সেদিন সকালবেলার অনুষ্ঠান যখন খাঁ সাহেব শেষ করলেন, বাঙলার

শ্রোতাদের সঙ্গীত বিষয়ে একটি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। এখানকার গায়কদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর তান কর্তবের ধরন-ধারণ অনুকরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেদের সাধ্য মতন। আর 'যমুনা কি তীর' গানটি মুখে মুখে ফিরতে লাগল কিছুদিন ধরে। এই ভৈরবীর ঠুংরিটি অনেকের মনের মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে রইল।

সম্মেলনে আরও এক দিন তাঁর গান হল—চতুর্থ অনুষ্ঠানে। জানুয়ারির ৫ তারিখ, রাত্রির আসর। প্রায় সকলের শেষে।

তাঁর পরে গান হয়েছিল শুধু ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের 'বন্দেমাতরম' ও ভজন। এদিনও প্রায় তিনঘণ্টা শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে এক দমে খাঁ সাহেব গেয়ে গেলেন।

প্রথমে দুখানি খেয়াল গাইলেন শুদ্ধ কল্যাণে, বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে। যথাক্রমে গান দুটি হল—'এরি'এক নজরা' ও 'মন্দার বাজে রে'। তার পর দুখানি মালকোষের খেয়াল—অধুনা-প্রসিদ্ধ 'পীর না জানি রে' ও 'আজ মোরে ঘরে আইলা।' প্রত্যেকটিই আসরে সাড়া জাগানো গান।

এই চারখানি খেয়ালের পর দুটি ঠুংরি গেয়ে খাঁ সাহেব মধুরেণ সমাপ্ত করলেন। প্রথমটি তাঁর বিখ্যাত ঝিঝোটি 'পিয়া বিন নাহি' এবং দ্বিতীয়টি সরফরদা—'গোপাল মেরি'।

সম্মেলনের আসর মাৎ হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত কলকাতায় বেশি দেখা যায়নি।

কলকাতায় সর্বজনীন সম্মেলনে সেই আবদুল করিম খাঁর প্রথম ও শেষ অনুষ্ঠান। সেই বছরেই অক্টোবর মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স তখন তাঁর ৬৬ বছর।

মৃত্যুর কিছু আগে তাঁর বীণা-যন্ত্রে রেকর্ড করবার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতেরও কয়েকটি রেকর্ড গৃহীত হয় তাঁর। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত তাঁর ঐ দুখানি ঠুংরি—'যমুনা কি তীর' ও 'পিয়া বিন্ নাহি। তা ছাড়া কটি খেয়াল গানেরও রেকর্ড তাঁর হয়।

এই ক'টিই তাঁর সঙ্গীতস্মৃতির তবু কিছু নিদর্শন স্বরূপ বেঁচে থাকবে ভাবীকালের জন্যে।

তাঁর যে মৃত্যুর প্রসঙ্গ বর্ণনা করবার জন্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা তার ঘটনাকাল হল—২৭ অক্টোবরের (১৯৩৭) রাত্রি। স্থান—দক্ষিণ ভারত। পণ্ডিচেরির কাছে একটি সামান্য, অখ্যাত রেলস্টেশন।

দক্ষিণ ভারতের পথে সেই যাত্রার আগে তিনি মিরাজে ছিলেন। অন্যান্য বছরের মতন মিরাজের সেই উরুস উৎসবে যোগ দেবার জন্যে তিনি গিয়েছিলেন সেখানে। উৎসব শেষ হবার সময় পণ্ডিচেরি যাবার জন্যে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এল।

পণ্ডিচেরির একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয় সেখানে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান করতে। প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করবার জন্যে সেই আসরের ব্যবস্থা করা হয়। পণ্ডিচেরিতে সেই উপলক্ষে গিয়ে গান গাইতে সম্মত হন খাঁ সাহেব।

সঙ্গে শিষ্য-সেবক ও তবল্‌চিকে নিয়ে তিনি ট্রেনে পণ্ডিচেরি যাত্রা করলেন। শরীরে কোনরকম অসুস্থতা তখন তাঁর ছিল না বলে জানা যায়।

প্রথম রাত্রি তখন পার হয়ে গেছে। খাঁ সাহেব নাস্তা শেষ করে নিয়েছেন সঙ্গীদের সঙ্গে। নির্জন প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নিস্তব্ধতা সচকিত করে ট্রেন পণ্ডিচেরির দিকে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ শরীরে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন আবদুল করিম। অনুভব করলেন, বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। একজন শিষ্যকে ডেকে জানালেন শরীরের এই অবস্থার কথা।

সঙ্গীরা সকলেই তৎপর হয়ে তাঁকে হাওয়া ইত্যাদি করতে লাগলেন। কিন্তু খাঁ সাহেব বিশেষ স্বস্তি পেলেন না কিছুতেই।

সঙ্গীরা ইতিকর্তব্য আলোচনা করছিলেন, এমন সময় ট্রেনের গতি মন্দীভূত হয়ে এল। জানলা দিয়ে মুখ বার করে একজন দেখলেন, একটি স্টেশনে এসে গাড়ি থামছে।

তখন সকলে স্থির করলেন, খাঁ সাহেবকে নিয়ে এই স্টেশনেই নামা যুক্তিযুক্ত। তা হ'লে সেবা-শুশ্রুষার সুবিধা হবে।

তাঁকে নিয়ে তাঁরা স্টেশনে নেমে পড়লেন। অতি ছোট স্টেশন। নাম সিঙ্গাপোয়াকোলম্‌। লোকজন বিশেষ কেউ নেই।

খাঁ সাহেবকে সেখানেই একটা বেঞ্চে তাঁরা আরাম পাবার জন্যে সম্ভব মতন ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি স্থিরভাবে খানিক বিশ্রাম করে নিলেন কষ্ট উপশমের আশায়। কিন্তু স্বস্তি পেলেন না, বুকের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

তিনি হয়ত বুঝতে পারলেন—চরমক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে, আর সুস্থ হবার

আশা নেই। শেষ কর্তব্য স্থির করে তিনি প্ল্যাটফর্মের ওপর সতরঞ্চ বিছিয়ে দিতে বললেন, নামাজের জন্যে। অন্তিম মুহূর্তে খোদার কাছে শেষ প্রার্থনা নিবেদন করবেন।

তখনি কথা মতন ব্যবস্থা হল। তিনি নামাজে বসলেন জানুতে ভর দিয়ে। কিন্তু আজীবন একনিষ্ঠ সঙ্গীতসাধক আবদুল করিম প্রচলিত গদ্য-ভঙ্গীতে নামাজের মন্ত্র পাঠ করলেন না। প্রাণের গভীরতম আবেগে প্রার্থনার মন্ত্রগুলি দরবারি কানাড়ার স্বর-ধ্বনিতে নিবেদন করতে লাগলেন।

দরবারি কানাড়ার রাগরূপে সেই শেষ প্রার্থনাসঙ্গীত সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। তিনি ঢলে পড়লেন পাশে। সঙ্গীতকণ্ঠ তাঁর চির-নীরব হয়ে গেল।

রাত তখন প্রায় এগারটা।

॥ একটি আশ্চর্য প্রতিভা ও অবিশ্বাস্য মৃত্যু ॥

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন বসেছে। এলাহাবাদ। ১৯৩৪ সাল।

সে রাতের অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে উদ্‌যোক্তাদের পক্ষ থেকে পরের দিনকার সূচী ঘোষণা করা হল। সে অধিবেশন বসবে সকালবেলা প্রথমে ধ্রুপদ গান হবে। গাইবেন মুরারিমোহন মিশ্র। রাগ দরবারী তোড়ি।

সেকালের সঙ্গীত-সম্মেলনে অনেক সময় শিল্পীদের নামের সঙ্গে রাগের নামও আগাম জানিয়ে দেওয়া হত। সে সব রাগের নির্বাচন করতেন তাঁরা, অর্থাৎ পরিচালকরাই। এবং শিল্পীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ও তাঁদের মতামত না নিয়ে শ্রোতব্য রাগের নাম তাঁরা ঘোষণা করতেন। একই আসরে যেন রাগের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে কারণে যে শিল্পীদের সঙ্গে রাগের নাম সম্মেলনের পক্ষে ঘোষণা করা হ'ত, তা নয়।

অনেক সময় উদ্‌যোক্তারা অধিবেশনের প্রতিটি বিষয় একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুসারে স্থির করতেন। সেই সঙ্গে এমন একটি মনোভাবও হয়ত তাঁদের মধ্যে ছিল যে, নিখিল ভারত সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের যাঁরা শিল্পী তাঁরা নিশ্চয় সক্ষম হবেন একদিন আগে ফরমায়েশ করা রাগ গাইতে বা বাজাতে। অনুষ্ঠান-সূচীতে বৈচিত্র্য জন্যে আগেকার আমলের সম্মেলন

পরিচালকরা অনেক সময় শিল্পীদের জন্যে এমনিভাবে রাগ নির্দিষ্ট করে দিতেন।

সেদিনও এলাহাবাদ সম্মেলনে বসে অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে মুরারিমোহন ঘোষণা শুনলেন যে, পরের দিন সকালে তাঁকে গাইতে হবে দরবারী তোড়ির ধ্রুপদ। পিতা-পুত্র দু'জনে সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিতে এলাহাবাদে এসেছিলেন।

সম্মেলনের মঞ্চে পিতা মোহিনীমোহন মিশ্রও ছিলেন। সে অধিবেশনে তাঁরও গানের অনুষ্ঠান ছিল সেই রাতে। তিনিও জানতে পারলেন, মুরারিকে দরবারি তোড়ি গাইবার জন্যে বলা হয়েছে।

মোহিনীমোহন চিন্তিত হলেন ঘোষণা শুনে। কারণ মুরারি দরবারি বা শুদ্ধ তোড়ি কখনো শেখেনি তাঁর কাছে। অন্য কোন বড় আসরেও কখনো তোড়ি গায়নি। এত রাতে বাড়ি ফিরে নতুন করে শেখানোও তো অসম্ভব ব্যাপার। এই সম্মেলনে তোড়ি ছাড়া অন্যকোন রাগ গাইলে ভাল হয় কাল সকালে। কিন্তু একথা সম্মেলন-এর কর্তৃপক্ষকে কিছুতেই জানান চলে না। অতি লজ্জাকর ব্যাপার হবে তা হলে।

তোড়ির ঘরে দরবারী এমন কিছু একটা নতুন বা বিশেষ কঠিন রূপ নয়। অনেকের মতে দরবারি তোড়ি বলে তোড়ির আলাদা কোন প্রকার-ভেদ নেই। শুদ্ধ তোড়ির সঙ্গে তার কি পার্থক্য? যে তোড়ি দরবারে গাওয়া হয়েছিল তারই নাম হয়ে যায় দরবারি তোড়ি। তঁদের মতে শুদ্ধ তোড়ির সঙ্গে তা অভিন্ন।

কিন্তু কেউ আবার দরবারি তোড়িকে শুদ্ধ তোড়ি থেকে একটু পৃথক করবার পক্ষপাতী। এই মতের সঙ্গেও পরিচিত আছেন মোহিনীমোহন। বহুদর্শী সঙ্গীতবিদ্ তিনি। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না যে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ যখন দরবারি তোড়ি ফরমায়েশ করেছেন তখন তাঁরা তোড়ির কিছু প্রকারভেদ শুনতে ও শোনাতে চান। এবং তাঁরা শেষোক্ত মতের পোষক। দু-একদিন আগে একথা জানতে পারলে মুরারিকে অনায়াসেই দরবারি তোড়ি ভালভাবে শিখিয়ে তিনি এখানে গাওয়াতে পারতেন।

কিন্তু এখন তো অসম্ভব। সে [illegible]র অনুষ্ঠান শেষ হতে আড়াইটে বেজে গেল। সকাল সাড়ে সাতটায় গান হবার কথা। সুতরাং কোন রকমেই সম্ভব নয়। একটা যেমন-তেমন আসরে গান হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের এত বড় সম্মেলন আর বাঙলা দেশও নয়।

তা ছাড়া ধ্রুপদ। শুধু গানখানি নয়, পদ্ধতিসম্মত আলাপচারি সম্পূর্ণ করে তবে গান ধরতে হবে। সঙ্গত করবেন পশ্চিমাঞ্চলের কোন অভিজ্ঞ পাখোয়াজী। এখন গানই শিখবে কখন, আর কখনই বা তৈরি হবে! এই সব সব ভেবে মোহিনীমোহন স্থির করলেন সকালের অধিবেশনে পুত্রের না যাওয়াই ভাল। গেয়ে নাম খারাপ করার চেয়ে তা শ্রেয়।

সম্মেলন স্থান থেকে বাড়ি ফেরবার পথে মোহিনীমোহন মুরারিকে বললেন—দরবারি তোড়ি তোমার জানা নেই। কাল সকালে ওখানে তো তোমার গাওয়া হতে পারে না। তুমি বাড়িতেই থেক। আমি ওখানে গিয়ে একটা কিছু বলে দেব।

মুরারি চুপ করে চলতে লাগলেন। পথে আর কিছু কথা হল না। সম্মেলনে আগত শিল্পীদের জন্যে নির্দিষ্ট বাড়িতে ফিরে এসে রাত্রের খাওয়া শেষ করলেন দু-জনে। রাত তখন তিনটে বেজে গেছে।

মোহিনীমোহন শোবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় মুরারি জিজ্ঞেস করলেন—বাবা, দরবারী তোড়ি কি রকম? এর আলাপটা একটু দেখিয়ে দিন না।

মোহিনীমোহন তখন খুবই ক্লান্ত। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া তিনি নিজে গেয়েছেন সম্মেলনে। এখন এই শোবার সময়ে রাগালাপে তাঁর স্পৃহা ছিল না। তা ছাড়া এ শোনবার আর দরকারই বা কি?

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—দরবারী তোড়ির আলাপ শুনে আর এখন কি হবে? শুয়ে পড়।

—না, আমার এখন ঘুম আসবে না। আপনি এর চলন আর আলাপটা একবার দেখান।

অগত্যা দরবারি তোড়ির আলাপচারি শোনালেন মোহিনীমোহন। তারপর তিনি শয্যায় আশ্রয় নিলেন। রাত তখন প্রায় চারটে।

কিন্তু মুরারি বিছানার ধারেও গেলেন না। বেরিয়ে পড়লেন বাড়ির সামনেকার খোলা জায়গাটিতে। এইমাত্র শোনা দরবারির আলাপ সেখানে বেড়াতে বেড়াতে গুঞ্জন করতে লাগলেন।

ক্রমে অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠল। তখন ঘরে এসে ডেকে তুললেন পিতাকে।

—বাবা, দরবারি তোড়ির একটা গান শোনান।

একটু অপ্রসন্ন হলেন মোহিনীমোহন।

—আবার দরবারির গান শুনে কি হবে এখন? তোমার ইচ্ছেটা কি?

—গানটা একবার দেখিয়ে দিন।

আর কিছু বললেন না। মোহিনীমোহনের একবার সন্দেহ হল বটে, কিন্তু এই নিয়ে আর আপত্তি জানালেন না। ছেলের স্বভাব ভাল রকমই জানতেন তিনি। যত ধীর আর নম্রই হোক ভেতরে অত্যন্ত রোখা। যদি কোন কাজ করবে মনে স্থির করে থাকে, তা সে করবেই। কোন বাধা মানবে না।

এই ভেবে দরবারি তোড়ির একটি ধ্রুপদ গাইলেন আদ্যোপান্ত। নিবিষ্ট হয়ে মুরারি শুনলেন। কোন কোন অংশ বিশেষ করে শোনবার জন্যে পিতাকে গাইতে হল একাধিকবার। গানটা খুঁটিয়ে শুনে নিয়ে মুরারি আবার বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এবার গঙ্গার ধারে। শুধু গানখানি আগাগোড়া গলায় তুলতে হবে তাই নয়, আলাপ সমেত সেটি প্রস্তুত করতে হবে। কোন পাখোয়াজীর সঙ্গে গানটি গঠিয়ে নেবার সুযোগ নেই। একাই এই অবস্থায় যতটুকু করা সম্ভব।...

এদিকে বেলা আর একটু বাড়ল, রোদ উঠল। মোহিনীমোহন আর ঘুমোবার বৃথা চেষ্টা করলেন না। কিন্তু মুরারি কোথায়? শেষ রাতটুকু তাকে তো একেবারেই শুতে দেখা গেল না।

খানিক পরে ফিরতে দেখলেন তাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্নান সেরে জামা-কাপড় বদলে বেরুবার জন্যে মুরারি প্রস্তুত হয়ে এলেন।

—কনফারেন্সে যাচ্ছি। গান গাইব।

মোহিনীমোহন চমৎকৃত হলেন।

—বল কি? এ গান কখন্ শিখলে যে কন্ফারেন্সে গাইতে যাচ্ছ? এ কি সাধারণ কোন আসর?

—না, বাবা। আমি গাইতে যাব। না গেলে ভাল হয় না। আপনি আর 'না' বলবেন না।

তাকে আর বাধা দিলেন না, কিন্তু তার সঙ্গে নিজে আর তাঁর যাবার ইচ্ছে হল না। এই রকম বিনা প্রস্তুতিতে কখনও গাওয়া যায়, আর এত বড় সম্মেলনে? নির্ঘাৎ হাস্যাস্পদ হবে। কি করে তা বসে থেকে দেখা যায়? ওখানে আর গিয়ে দরকার নেই।

মনে অতিশয় অস্বস্তি নিয়ে ঘরে বসে রইলেন মোহিনীমোহন। তাঁর সমস্ত চিন্তা অধিকার করে রইল সম্মেলনে মুরারির গান। মাত্র খানিক আগেই যে গান শুধু শুনেছে, তৈরি করবার সময়ই পায়নি, তা কেমন করে কন্‌ফারেন্সে গাইবে? পাখোয়াজী পর্যন্ত নিজের নয়। একটু ঘুমিয়েও নেয়নি সারা রাতের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। মুরারির ভাবনায় অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়লেন সম্মেলনের দিকে। একরোখা ছেলেটা কি করবে কে জানে। আর বাঙলার বাইরে এই সব দুর্ধর্ষ ওস্তাদের সামনে!

এই সব ভাবতে ভাবতে পৌঁছলেন এসে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কন্‌ফারেন্সের হলে প্রবেশ করা মাত্র সতেজ, সুরেলা গলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ডায়াস তখনও দেখতে পাননি, গায়ক তখনও চোখের আড়ালে কিন্তু এ গলা তাঁর চেয়ে বেশি আর চেনে কে? সারা হল্ সুরে ভরে উঠে গম্ গম্ করছে।

রাতের শেষ প্রহরে দরবারী তোড়ির যে আলাপের কাঠামো দেখিয়েছিলেন, তাকেই ভিত্তি করে রাগের বিস্তৃত রূপ প্রদর্শন করে চলেছে গায়ক। তার নিজস্ব অনুভবে, প্রতিভায় স্পর্শে প্রাণবন্ত সেই রাগের আলাপন। প্রভাতকালীন দ্বিতীয় প্রহরের সেই উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগটির প্রকারভেদ। কোমল ধৈবতকে মূল স্বর দেখিয়ে, কোমল গান্ধার আর কোমল ঋষভের যুগ্ম আবেদন কি হৃদয়স্পর্শী রূপেই প্রকাশ হচ্ছে। শোনবার মতন।

মোহিনীমোহন হলের মধ্যে এসে মুরারির গান শুনতে লাগলেন। মনের সব উদ্বেগ নিশ্চিহ্ন হয়ে তখন তাঁর নিশ্চিন্ত কৌতূহলের আনন্দ।

যথারীতি আলাপাচারি শেষ করে মুরারি গান ধরলেন। পাখোয়াজে সঙ্গত করেছেন গোয়ালিয়রের প্রবীণ গুণী পর্বত সিং। তাঁর সঙ্গে অতি সাবলীল কণ্ঠে গায়ক গানের বন্দেশ সুন্দরভাবে দেখাতে লাগলেন। যেন কতদিন ধরে এই গানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়।

তখন মুগ্ধ শ্রোতাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব হ'ত যে, গানখানি আলাপ সমেত ক' ঘণ্টা মাত্র আগে গায়কের প্রথম শোনা, তাও খণ্ডভাবে।

গান শেষ করতে মুরারি মুখরিত প্রশংসায় ধন্য হলেন। তাঁর সেদিনকার অসাধারণত্বের অনেকখানিই কিন্তু রয়ে গেল অজ্ঞাত অধ্যায় হিসেবে।...

আর একটি বড় আসরের ঘটনা। এটিও সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন। অধিবেশন হয় আগ্রা শহরে।

বাঙলা থেকে সেই সম্মেলনে যোগ দিতে যান গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে, তারাপদ চক্রবর্তী, মুরারিমোহন মিশ্র প্রভৃতি।

সে রাতের অধিবেশনে একটি অপ্রিয় ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বাঙালী শিল্পীদের প্রতি স্পষ্ট বিরোধী মনোভাব। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে বাঙলার রাগ-সঙ্গীতের শিল্পীদের সম্পর্কে সেকালে একটি বিরুদ্ধ মনোভাব কোন কোন সময় দেখা গেছে—সেখানকার শিল্পী ও শ্রোতাদের অনেকের মধ্যেই। রাগ-সঙ্গীত মূলত পশ্চিমাঞ্চলের সম্পদ, বাঙালীর নয়, বাঙালীর রাগ-সঙ্গীতচর্চা অনধিকার—এই ধরনের একটা ধারণা পশ্চিমাদের মধ্যে কোন কোন মহলে সে যুগে ছিল। এবং তা কখনও কখনও প্রকাশ পেত সম্মেলনের আসরেও।

আগ্রা সম্মেলনের সেই রাতে বাঙালী-শিল্পী-বিরোধী মনোভাবটি স্থানীয় শ্রোতাদের মধ্যে কিছু উগ্র ও নির্লজ্জ ভাবে প্রকাশ পায়। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বাঙালী গায়কদের গান না শোনবার জন্যে তখন শ্রোতারা বদ্ধপরিকর।

বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবীণ ধ্রুপদগুণী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় গান আরম্ভ করবার পরই সেই সব অসহিষ্ণু শ্রোতাদের কাছে বাধা পেতে লাগলেন। হৈ হৈ চীৎকার হতে লাগল তাঁর গান থামিয়ে দেবার জন্যে। তিনি তা সত্ত্বেও গান বন্ধ করলেন না। গেয়ে চললেন খানিকক্ষণ ধরে। কিন্তু বহু কণ্ঠের সম্মিলিত চীৎকার ও করতালি ধ্বনিতে তাঁর গান অশ্রুত থেকে যেতে তিনি কিছুক্ষণ পরে গান বন্ধ ক'রে উঠে গেলেন।

সেই হট্টগোলের মধ্যে পরবর্তী গায়কের নাম ঘোষিত হ'ল—মুরারিমোহন মিশ্র। ঘোষণার পরই তরুণ শিল্পী সপ্রতিভভাবে আসরে এসে বসলেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই যেন। তাঁর আকৃতি ও বেশবাসে অবাঙালী বলে ভুল করবার কোন কারণ নেই। তা ছাড়া, পশ্চিমাঞ্চলের শ্রোতাদের কাছে তিনি অপরিচিতও নন।

শ্রোতাদের তখন যা মেজাজ তাতে বাঙালী-শিল্পীর পক্ষে আসরে গাইতে

বসা অতি দুঃসাহসের কাজ। গান যতই ভাল গাওয়া হোক, অসহিষ্ণু শ্রোতারা তা অগ্রাহ্য করবার জন্যে সোচ্চারভাবে প্রস্তুত। সেখানে মুরারির মতন কোন তরুণ বয়সীর গাইতে বসা সমীচীন হবে কি না সে বিষয়ে মোহিনীমোহনের মনেও দ্বিধা জাগছিল।

কিন্তু মুরারির অটল আত্মবিশ্বাস। অকুতোভয় শিল্পী-সত্তা। পিতার কাছে গাইবার সম্মতি চেয়ে নিলেন।

তারপর মঞ্চে বসে যখন গান গাইতে আরম্ভ করলেন তখনও আসরের আবহাওয়া রীতিমত প্রতিকূল। শ্রোতাদের বাঙালীর গান শোনবার মতন মতিগতি আদৌ নেই। অশান্ত পরিবেশ।

তিনি কোনদিকে দিক্‌পাত না করে অবিচলিতভাবে গানের উদ্বোধন করলেন। ধীর-স্থির ভাবে আলাপ করতে লাগলেন স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে। দেখা গেল, অনিচ্ছুক শ্রোতারাও ক্রমে আকৃষ্ট বোধ করে গোলমাল থামিয়েছেন। শান্ত ভাব ধারণ করেছে আসর।

তখন স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল—গানে বাধা দেবার কথা কারুরই আর মনে পড়ছে না। আসরের বিরুদ্ধ পরিবেশ ক্রমে একেবারে বদলে আনলেন তরুণ সুর শিল্পী। বীতরাগ দর্শকরা শেষ পর্যন্ত অনুরাগী শ্রোতায় পরিণত হলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গান চলল সমস্ত শ্রোতা মুগ্ধচিত্তে বসে শুনলেন। তারপর গান শেষ হতে সানন্দ করতালিতে সচকিত হয়ে উঠল সম্মেলন ভবন।…

এমনি প্রতিভাধর গায়ক ছিলেন মুরারিমোহন মিশ্র। আর এই সব বড় বড় আসর যখন মাৎ করেন তখন বয়স মাত্র ১৯-২০ বছর। তারও কয়েক বছর আগে থেকে কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা সেই কিশোরের। কলকাতার নানা আসর থেকে তখন তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

রাগ-সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর অনায়াস বিচরণ পটুত্ব যেমন সমঝদারদের চমৎকৃত করেছিল, তেমনি অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গীতেও তিনি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই রেকর্ড হয়েছিল তাঁর ছ খানি গান—আধুনিক ও পল্লীগীতি।

সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ প্রভৃতি গানের নিষ্ঠাবান গায়করূপেও খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন মুরারিমোহন। আর সেজন্যে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর বিশেষ স্নেহ ও আস্থাভাজন।

সেই অল্প বয়সেই রবীন্দ্র সঙ্গীতে এমন কৃতী হন যে, দিনেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রধান গায়কের আসন দিতেন। অনেক সম্মেলক গীতিতেও তাঁদের নির্দেশে নেতৃত্ব করতে হত তাঁকে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যায় যে, উত্তরকালে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী মহোদয়া সঙ্গীতস্মৃতি বিষয়ে স্বরচিত একটি নিবন্ধে সে যুগের বাঙলা দেশের উদীমান গায়ক হিসেবে মুরারিমোহনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

তারপর ১৯৩৪ সালে যখন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ সঙ্গীতপ্রেমীদের পরিচালনায় আরম্ভ হল নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা (ও সঙ্গীত সম্মেলন)—যার বিচারক-মণ্ডলী অলঙ্কৃত করেন তৎকালীন বাঙলার শ্রেষ্ঠ ও ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতগুণীরা এবং যা প্রতিভা আবিষ্কারে উচ্চ মানের জন্যে শুধু পথিকৃৎ নয়, আজও আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে—তখন সেখানে সকলকে চমৎকৃত করে দেয় মুরারিমোহনের দুর্লভ সঙ্গীত-প্রতিভা।

সেই প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় কলেজের ছাত্ররূপে (বয়স তখন ১৯ বছর) মুরারিমোহন সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হলেন। ধ্রুপদে প্রথম স্থান, খেয়ালে প্রথম স্থান, টপ্পায় প্রথম, আধুনিক গানে প্রথম, লোক-সঙ্গীতে প্রথম এবং কীর্তনে দ্বিতীয়—এই হল তাঁর প্রতিযোগিতায় ফলাফল। ওই বছরেই দ্বিতীয় অধিবেশনের সাধারণ প্রতিযোগিতায় তাঁর গ্রুপে এইরকম নির্বাচন দেখা গেল—মুরারিমোহন ধ্রুপদে প্রথম, টপ্পায় প্রথম, গজলে প্রথম, রবাব যন্ত্রে প্রথম, স্বরলিপিতে প্রথম, আধুনিক বাংলা গানে প্রথম, খেয়ালে দ্বিতীয় (খেয়াল বিভাগে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৪১ জন), ভজনে দ্বিতীয় এবং কীর্তনে তৃতীয়।

তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে একজন সফল প্রতিযোগী হিসেবে মুরারিমোহন নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে খেয়াল গানের অনুষ্ঠান করলেন।

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে অসামান্য গুণপনার পরিচয় সেবার সমঝদারেরা লাভ করলেন তা যুগপৎ স্বভাবদত্ত এবং শিক্ষার সুবর্ণ ফল। সঙ্গীতচর্চার অতিশয় কৃতী পিতার সুযোগ্য পুত্র মুরারিমোহন। প্রতিভা তাঁর জন্মসূত্রে লাভ করা উত্তরাধিকার। সঙ্গীত-প্রতিভায় বহুমুখীনতাও তাঁর পৈত্রিক দৃষ্টান্ত বলা যায়।

পিতা মোহিনীমোহনের তুল্য বহুমুখী সঙ্গীতজ্ঞ বর্তমান শতকে দুর্লভ। তিনি একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ভজন কীর্তন ইত্যাদি গায়ক এবং পাখোয়াজ তবলা বীণা রবাব ক্ল্যারিওনেট সুরচয়ন সুররঞ্জন প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতে অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ভজন কীর্তন কাব্যসঙ্গীত ইত্যাদি রীতির গায়ক হলেও এত বিভিন্ন যন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না মোহিনীমোহনের মতন। তা ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র পরিণত বয়সে সিনেমার ব্যবসায়ী সঙ্গীতে অনেকাংশে আত্মনিয়োগ করার ফলে রাগসঙ্গীতচর্চা গভীরভাবে করবার অবকাশ পেতেন না।

অপরপক্ষে মোহিনীমোহন ছিলেন রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে একজন নেতৃস্থানীয়। বিভিন্ন অঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীতে এবং নানা যন্ত্রে তিনি অনেক শিষ্যও সংগঠন করেছিলেন। তার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে অবান্তর। শৈশবকাল থেকে হাতে গড়া দ্বিতীয় পুত্র মুরারি ও তাঁর ভাইবোনের নাম শুধু এ প্রসঙ্গে করা রইল।

মুরারির এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা. তবলাবাদক মদনমোহনও পিতার শিষ্য আধুনিক কাব্যসঙ্গীতের খ্যাতনাম্নী গায়িকা নির্মলা মিশ্রও মুরারীমোহনের কনিষ্ঠা। পিতার শিক্ষাধীনেই শ্রীমতী নির্মলা ধ্রুপদ খেয়ালের চর্চা অল্পবয়স থেকে ভালভাবে করতেন ; কিন্তু টাইফয়েড রোগে কণ্ঠের ক্ষতি ঘটাবার পর থেকে হালকা সঙ্গীত গাওয়া আরম্ভ করেন।

মোহিনীমোহনের তুল্য বাঙলার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় বহুমুখী প্রতিভার প্রসঙ্গে। তিনি হলেন বিগত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী—লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী। মোহিনীমোহনের মতন তিনিও নানা রীতির কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, ভজন গান, এবং বীণা, এসরাজ তবলা পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রের শিল্পী ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী। সঙ্গীতজীবনে এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তিনিও মোহিনীমোহনের মতন মূলত ধ্রুপদী নামে পরিচিত হতে গৌরব বোধ করতেন। কারণ ধ্রুপদই ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু।...

মোহিনীমোহনের সঙ্গীত-জীবন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতে মুরারিমোহনের বহুমুখীনতা তাঁর পিতারই উত্তরাধিকার। এই প্রতিভা নিয়েই মুরারির জন্ম। সঙ্গীত সাধনায় নিবেদিত-প্রাণ পিতার জন্যে বাড়িতে সঙ্গীতের আবহ। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সে শিশুর সুরের সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্ক

গড়ে ওঠে সহজ, স্বাভাবিক এবং অব্যর্থ ভাবে। পাঁচ বছরের ছেলে পাখীর মতন অনায়াসে গান গাইতে আরম্ভ করে। মিষ্টি গলা আর সেই সঙ্গে গান শুনে শিখে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা।

তার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীমোহন লক্ষ্য রেখে চলেন শ্রুতিধর ছেলেটির দিকে। গান দিলেই সে শিখে নেয়, বেশি কষ্ট করে শেখাত হয় না তাকে।

এমনি ক'রে কিশোর বয়সেই মুরারি রীতিমত গাইয়ে হয়ে উঠল। শুধু সুরেলা গলায় গান নয়, রাগ-পদ্ধতির রীতি-নীতি, বিভিন্ন অঙ্গের কলা-কৌশল শিখে নিতে লাগল দক্ষতার সঙ্গে। অসামান্য মেধা। দরাজ সুকণ্ঠ। অল্প আয়াসে সুর ঝরে পড়ে সাবলীলভাবে। আর অন্তর দিয়ে গান গায়। তার নিজের মনের অনুভব মিশে যায় বলে গান স্পর্শ করে শ্রোতাদের অন্তর।

দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় তখন মোহিনীমোহন বসবাস করছেন। সেখানে কৈশোর থেকেই মুরারীর গানের খ্যাতি। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়বার সময় ছ'খানি গানের রেকর্ড বেরিয়ে সে প্রসিদ্ধি আরও বিস্তৃত হয়ে যায়।

কলেজ-জীবনের গোড়া থেকেই খ্যাতনামা। শুধু রাগ-সঙ্গীতে নয়, আরও নানা ধরনের গানের জন্যেও বিভিন্ন দিকে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কৃতিত্বের জন্যে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয়পাত্র।

কলেজের ছাত্র-জীবন থেকে খ্যাতির পরিমণ্ডল অতি দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন এবং কলকাতার ভাল ভাল আসর। তারপর বাঙলার বাইরের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে মর্যাদা লাভ। একাধিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে প্রতিভার স্বীকৃতি। বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে বাঙলার এক প্রতিশ্রুতিমান তরুণ কণ্ঠশিল্পী। তরুণতম। কারণ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, শচীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি সকলেরই বয়োকনিষ্ঠ মুরারি মিশ্র।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতগুণ ছাড়া মুরারিমোহনের স্বভাবে ক'টি বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে লাগল। মন অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐকান্তিক ভক্ত, পরমহংসদেবের বাণী ও আদর্শ সেই তরুণ বয়সেরই অনুসরণ করে চলবার অনুগামী ও প্রবাসী। পরবর্তী কয়েক বছর গান উপলক্ষে বাঙলার বাইরে যেখানে বাস করতে হয়েছে, যথাসম্ভব থেকেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি-সদনে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অন্তরের গভীর যোগ তাঁর পরিচিত

কারুরই অবিদিত ছিল না! অনেকেই বিস্মিত হতেন, এত অল্প বয়স থেকে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবে এমন সমর্পিত-প্রাণ দেখে।

সরল, মধুর স্বভাব। তেমনি চরিত্রবান, শুদ্ধ সত্তা। অল্প বয়স থেকে মাঘোৎসব ও নানা সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্যে তরুণী যুবতীদের সঙ্গে মেলমেলার অবাধ সুযোগ। সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠার জন্যে স্বাধীনা অনুরাগিণীদেরও অভাব নেই। কিন্তু স্বভাবতই নারীসঙ্গ বিষয়ে মুরারি নিস্পৃহ। এমন কি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। একথা যে অতিশয়োক্তি নয় এ বিষয়ে দু-একটি উদাহরণ পরে দেওয়া হবে। চরিত্রের একদিকে যেমন ধৈর্য, স্থৈর্য, ও নম্রতা, আর একদিকে তেমনি অনমনীয় ঋজুতা, যা দৃঢ়তারই নামান্তর। অথচ সদালাপী, মিশুক ও বন্ধুবৎসল।

আর অন্তরের সবচেয়ে প্রিয় সাধন—সঙ্গীত। সঙ্গীতৈকপ্রাণ। সঙ্গীত-জীবনের প্রথম দিকে নানা অঙ্গের গানে অপক্ষপাত আগ্রহ ছিল।

সেই সঙ্গে একাধিক সঙ্গীত-যন্ত্রেও হাত পড়ত কারণ পিতার সঙ্গীত-ভাণ্ডারে এক ডজনেরও বেশি বিভিন্ন যন্ত্র এবং যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা বাল্যকাল থেকেই দেখতে অভ্যস্ত। সেই একাধিক যন্ত্রের মধ্যে রবাবটির প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় রবাব বাদনে বিচক্ষণ গুণীদেরও প্রশংসা অর্জন করেন, যখন বর্ষীয়ান, ব্যবসায়ী যন্ত্রীদের মধ্যেও রবাব-বাদক সুদুর্লভ।

কিন্তু পরে মুরারিমোহনের বৈচিত্র্যবিলাসী সঙ্গীত-চর্চা ঘনীভূত হয়ে প্রায় একমুখীনতার পথে এগিয়ে চলে। যন্ত্র-সঙ্গীত ছেড়ে দিলেন একে একে।

কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা বিভিন্ন রীতি থেকে ক্রমে কেন্দ্রায়ত হয়ে ধ্রুপদ ও খেয়ালে এসে স্থায়ী হল। এই দুই অঙ্গের মধ্যে আবার খেয়ালের ওপর ঝোঁক পড়তে লাগল বেশি করে। ধ্রুপদের অনুশীলনে ছেদ না পড়লেও খেয়ালের সৌন্দর্যে অধিকতর আকৃষ্ট হলেন।

আরো ভাল করে নিবিষ্ট হবার ইচ্ছা জাগল খেয়াল গানে। খেয়াল আরও ব্যাপকভাবে, আরও গভীরভাবে, আরও আধুনিক কালের উপযোগী অভিনব তান-কর্তবে মনোমুগ্ধকর ভাবে আয়ত্ত করতে অনুপ্রেরণা জাগল অন্তরে।

সঙ্গীতচর্চার এই পর্যায়ে—যে কালের প্রসঙ্গে এই নিবন্ধ আরম্ভ হয়েছে তার অব্যবহিত পরে—পিতা-পুত্রে আদর্শগত সংঘাত সৃষ্টি হল।

আগেও আভাস দেওয়া হয়েছে, নানা যন্ত্র ও গীত-রীতির মধ্যে মগ্ন

হলেও মোহিনীমোহন ছিলেন প্রধানত ধ্রুপদী। রাগ-পদ্ধতি সম্পর্কে নিষ্ঠাবান এবং ঐতিহ্য অনুসারী সঙ্গীত বিষয়ে ধ্যান ধারণায়ও।

মতামতে তিনি সাম্প্রতিক কালের বিচারে হয়ত প্রাচীনপন্থী। তিনিও খেয়ালের চর্চা করেছেন বটে, কিন্তু, তা খানিক পরিমাণে ধ্রুপদ-ঘেঁষা। খেয়াল গানে ইতিমধ্যে নানা অভিনবত্বের সঞ্চার হয়েছে যা তাঁর সাধনার যুগে ছিল না। এত বৈচিত্র্যময় তান-লীলা খেয়ালে এনেছে এক নতুনের স্বাদ, যার রীতি-নীতি ও ঢঙ অর্বাচীন মনে হয় তাঁর কাছে। রাগ মিশ্রণের নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিকদের কাছে যে নতুন নতুন সৌন্দর্যের দ্যোতক, তাঁর মতে সেসব প্রয়াস রাগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে।

এই ধরনের মনোভাবের জন্যে পুত্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর প্রকট হয় সঙ্গীত বিষয়ে। কারণ যুগধর্মের প্রভাবে মুরারিমোহন আধুনিক চালের খেয়ালের অনুবর্তী হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, খেয়ালের নতুন কর্মকাণ্ডের অংশভাগী হওয়া।

কিন্তু পিতার এ বিষয়ে অন্তরের সায় নেই। বরং বিরূপতা আছে।

প্রাচীন ও নবীনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব!...

পুত্রের অদম্য আগ্রহ পশ্চিমে গিয়ে নতুন পদ্ধতির খেয়াল শিক্ষা করবার। অবশেষে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে স্থাপিত লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে মুরারিমোহন ভর্তি হতে চাইলেন।

অভিপ্রেত না হলেও পিতা মত দিলেন শেষ পর্যন্ত। মনে দুঃখ পেলেন, কিন্তু পুত্রের সাধে বাদ সাধ. .ন না। অক্ষুণ্ণ রইল অন্তরের স্নেহ।

মুরারির দিক থেকেও পিতার প্রতি অবাধ্যতার কোন প্রশ্ন নেই। তেমন অমান্য করবার মতন স্বভাবই নয় তাঁর। পিতার খেয়াল গান সেকেলে মনে হয়। এখানকার পশ্চিমের খেয়ালে অনেক নতুন কারুকর্ম, অনেক তানের বৈচিত্র্য এসেছে, সে সব শেখবার বড় ইচ্ছে করে' এই মুরারির মনের ভাব। পিতার ওপর ভক্তি শ্রদ্ধার কোন অভাবই নেই। এ পর্যন্ত তাঁর কাছে যা পেয়েছেন, তাই সঙ্গীতজীবনের মূল সম্বল। তা ছাড়াও আরও কিছু চাই। সে জন্যেই পশ্চিমে যেতে হবে। পিতার প্রতি সম্মান বা বিশ্বাসের অভাবের জন্যে নয়।

কলকাতায় ছাত্র-জীবনে বি. কম. পড়া চলছিল। কিন্তু মন উন্মুখ হয়ে ছিল সঙ্গীতকে পুরোপুরি জীবনের অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করতে। অন্য কোন বৃত্তির কথা চিন্তা করা অসম্ভব বোধ হয়। এই অবস্থায় বাড়ির সম্মতিতেই

এখানকার কলেজ পাঠে ইতি করে লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন।

শিক্ষার্থীরূপে যোগ দিলেন সেখানকার মরিস কলেজে। ছয় বছরের সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর অধ্যক্ষ।

কলেজে প্রবেশ করবার সময় থেকেই রতনজনকরের সপ্রশংস দৃষ্টি মুরারিমোহন আকর্ষণ করেন। পরীক্ষা করে অধ্যক্ষ তাঁকে ভর্তি করে নিলেন একেবারে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। নতুন পরিবেশে প্রতিভা স্ফুরণের নতুনতর সুযোগ উপস্থিত হল।

লক্ষ্ণৌতে মুরারিমোহন স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করলেন। আমিনাবাদ অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। তারই অতিথিভবনের একটি ঘরের বাসিন্দা হলেন।

বয়স তখন ২১ বছর। যৌবনের পরিপূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সঙ্গীত সাধনায় এবার আরও একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

পরে মিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে জানা যায়, রাত চারটে থেকে গান শোনা যেত মুরারির। বেলা, দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলত। প্রতিদিনের এই নিয়মিত সাধনা। তারপর কলেজের শিক্ষা। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে নানা আসরে গান, এ সব তো ছিলই।

সুতরাং সেই প্রতিভাবান তরুণ যে সঙ্গীত-জীবনে উত্তরোত্তর এগিয়ে চললেন তা অনুমান করা কঠিন নয়।

পশ্চিমাঞ্চলে শুধু লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ রইল না। সর্বভারতীয় সম্মেলনে লক্ষ্ণৌতে আসবার আগে থেকেই লাভ করেছেন সুনাম। এখানে থাকতে বড় বড় আসরে শুধু নয়, লক্ষ্ণৌর বাইরে দিল্লী ও মীরাটেও সঙ্গীতজ্ঞ মহলে গুণীর প্রতিষ্ঠা পেলেন। লক্ষ্ণৌ বাসের সময়ও যোগ দেন একাধিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে।

কিন্তু পশ্চিমের আরও অনেক শহরে ছোটখাটো আসরেও এত আমন্ত্রণ আসত যা থেকে বোঝা যেত নামডাক অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গীতচর্চার অনেক গোষ্ঠীই তাঁর গান শুনতে আগ্রহী। ছোট ছোট সঙ্গীতকেন্দ্রেও বাইরেকার কোন শিল্পীর যখন ডাক আসে, তখনই বোঝা যায় সে শিল্পীর সঙ্গীত-জগতে যথার্থ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

মুরারিমোহন ২৩।২৪ বছরের মধ্যেই সে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

অনেক সুহৃদও লাভ করেন লক্ষ্ণৌতে, সুর-শিল্পী মহল থেকে। তাঁদের মধ্যে তিনজন সবচেয়ে অন্তরঙ্গ হন। বেহালা-গুণী বিষ্ণু গোবিন্দ যোগ (ভি.

জি. যোগ), অমৃতকণ্ঠ দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুসকর (ডি. ভি. পালুসকর—বিষ্ণু-দিগম্বর পালুসকরের পুত্র) এবং সেতারী ধ্রুবতারা যোশী (ডি. টি. যোশী-লক্ষ্মৌ-য়েরই সন্তান)। এই চারজনের অনেক মেলামেশা, অনেক আসরে যোগদান আর অনেক দিনের একত্র সঙ্গীতচর্চা পরিচিত মহলে স্মরণীয় হয়ে আছে।

কলকাতায় থাকতেও যেমন, তেমনি এই বিদেশ বাসের সময়েও যাঁরা সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই ভালবেসেছেন মুরারিমোহনকে। শুধু সঙ্গীত-প্রতিভার জন্যে নয়; সরল অমায়িক নিরহঙ্কার স্বভাবের জন্যেও।

সর্বজনপ্রিয়—একটি কথার কথা। সংসারে কোন মানুষের সম্পর্কেই তা সঠিক প্রয়োগ করা যায় কিনা সন্দেহ। যিনি সকলের প্রিয় কিংবা যাঁর শত্রু নেই এমন ব্যক্তি ইহজগতে কোথায়? তবে সর্বজনপ্রিয় বা অজাতশত্রু হওয়ার উপযুক্ত মানুষ জগতে দেখা যায়, যদিও তাঁরা তা হতে পারেন না তাঁদের নিজেদের কোন দোষে নয়, অন্যের কারণে।

নিতান্ত নির্বিরোধী হয়েও কেউ কেউ কারুর অতিশয় অপ্রিয় এমন কি গুপ্ত শত্রুতার লক্ষ্য হয়ে থাকেন অবস্থা-বৈগুণ্যে কিংবা ঘটনাচক্রে। মুরারিমোহন সম্পর্কেও সর্বজনপ্রিয় কিংবা অজাতশত্রু বিশেষণ ব্যবহার করা যায় না, যদিও সেই রকম হবার মতন অন্তঃকরণ ও চরিত্র তাঁর ছিল। অথচ যে মারাত্মক শত্রুতার ফলে তাঁর জীবনের চরম ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসে সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর নিজের কোন অপরাধের জন্যে সেই ভয়াবহ শত্রুতার সৃষ্টি হয়নি—এবং তার কারণ বা উপলক্ষ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না পর্যন্ত।

বরং বলা যায়, সেই চূড়ান্ত বৈরিতার তিনি পাত্র হয়েছিলেন তাঁর গুণের জন্যে—সঙ্গীতগুণের জন্যে। গুণ কখনও কখনও সংসারে দোষের তুল্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। দু'শ বছর আগেও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যেমন মন্তব্য করেছিলেন—গুণ হয়্যা দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়!

মুরারিমোহনের সঙ্গীতবিদ্যা যে দোষের কারণ হয়ে তাঁর জীবনের ভয়ানক পরিণতি ঘটিয়েছিল, সে প্রসঙ্গ শেষে প্রকাশ্য। তার আগে তাঁর জীবনের অন্যান্য আরও কিছু কথা আছে। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা ও চরিত্রবলের দু-একটি কাহিনী।

মরিস কলেজে যোগ দেবার কয়েক মাস পরের ঘটনা। তখনও তিনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

ধ্রুপদ গানের ক্লাস। কলাবত অধ্যাপক আশাবরী রাগের ধ্রুপদ

শেখাচ্ছেন। মুরারীমোহন ভিন্ন অন্য কয়েকজন ছাত্রও ক্লাসে রয়েছেন।

আশাবরীর গান গাইবার সময় শিক্ষকের হঠাৎ চোখ পড়ল—মুখ ফিরিয়ে নিলে মুরারি মিশ্র আর সে মুখে ফুটে রয়েছে হাসির রেখা।

গান বন্ধ করে তিনি রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি হাসছিলে কেন?

লজ্জিত হয়ে মুরারিমোহন বললেন—এমনি।

—না। কক্ষনো শুধু শুধু হাসোনি। তুমি নিশ্চয় আমার গানকে বিদ্রূপ করবার জন্যে হেসেছিলে। তুমি আমাকে অপমান করেছ।

মুরারিমোহন নম্রভাবে উত্তর দিলেন—আপনি বিশ্বাস করুন আপনাকে অপমান করবার জন্যে আমি হাসিনি। হঠাৎ হাসি এসে গিয়েছিল।

শিক্ষক সক্রোধে বলে উঠলেন—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তুমি আমায় অপমান করবার জন্যে হাসছিলে। আমি প্রিন্সিপ্যালের কাছে রিপোর্ট করব তোমার নামে।

তখনি তিনি উঠে চলে গেলেন। খানিক পরেই নিয়ে এলেন রতন-জনকরজীকে সঙ্গে নিয়ে। বক্তব্য ইতোমধ্যেই তাঁকে শোনানো হয়ে গেছে। এখন শুধু অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন মুরারির দিকে।

রতনজনকর মুরারিকে ভালভাবে জানতেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এর গান শুনে হেসেছিলে কেন?

মুরারিমোহন সলজ্জভাবে উত্তর দিলেন—ওঁর আশাবরীতে ভুল হচ্ছিল। সেজন্যে হঠাৎ আমার হাসি এসে যায়। কিন্তু আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম আর ওঁকে অপমান করবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।

রতনজনকর বললেন—আশাবরীতে কি ভুল হচ্ছিল দেখাও তো।

মুরারিমোহন পিতার কাছে আশাবরী ভালভাবে শিখেছিলেন। শিক্ষক কিভাবে গাইছিলেন, তাঁর ভুল কোথায় সব দেখিয়ে, শোনালেন আশাবরীর শুদ্ধ রূপের ধ্রুপদ।

রতনজনকর মুরারিকে কোনরকম তিরস্কার না করে ফিরে গেলেন।

এই পর্বের ফলেই জানা গেল যে, মুরারিমোহন ধ্রুপদের ক্লাসে অতঃপর শিক্ষক নিযুক্ত হলেন! এবং সেই ছাত্র অবস্থাতেই!

রতনজনকরজীর নির্দেশে, অন্যান্য ক্লাসে ছাত্ররূপে থাকলেও, ধ্রুপদ শিক্ষা দিতে লাগলেন মুরারি মিশ্র। যতদিন মরিস কলেজ ছিলেন, ধ্রুপদের অধ্যাপক হয়েই থাকেন সেই তরুণ বয়সে।

উক্ত শিক্ষকের অভিযোগের ফলেই রতনজনকরজী সেদিন মুরারিমোহনের প্রতিভাকে নতুন করে আবিষ্কার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তখন মরিস কলেজে সাড়া পড়ে গিয়েছিল তরুণ সঙ্গীতজ্ঞের এই কৃতিত্ব উপলক্ষ করে। কিন্তু এই নিয়ে তাঁর নিজের মনে কোন অহমিকা কোনদিন জাগেনি। তেমনি মনে কোন প্রবৃত্তির বিকারও ছিল না, যা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিতে পারত এই প্রথম যৌবনকালে।

যুবতীর প্রেমের সঙ্গে তার দৈহিক আকর্ষণ চরিতার্থ করবার সুযোগ এলে এসময় অনেকেরই হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু মুরারির অন্তর অন্য ধাতুতে গড়া। যথার্থ সৎ ও ধর্ম-প্রবণ। এ সম্পর্কে আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে তাঁর সংযত চরিত্রের।

লক্ষ্ণৌতে বাস আরম্ভ করার কিছুদিনের মধ্যেই সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে একেবারে নিমগ্ন করে দেন। সকাল বেলাতেই একাদিক্রমে ৬ ঘণ্টা রিয়াজের কথা আগেই বলা হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি সদনে তাঁর বাসের প্রসঙ্গে।

তাল-লয়ে আরো অধিকার অর্জনের জন্যে নিয়মিত তবলচীও নিযুক্ত করেন। তবলা-সঙ্গতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় চিত্তে কেটে যায় তান-সাধনের বৈচিত্র্যে। নানা মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন চালের তান রিয়াজের সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে, পরীক্ষা চলছে। নতুন নতুন তানের পরিকল্পনা এবং তবলার সঙ্গে সেসব গঠানো। এইভাবে খেয়াল গানের সাধনা অগ্রসর হতে থাকে।

তবলচী চলে যাবার পরেও অনেক সময় সাধনা বন্ধ হয় না। শুধু সকালে নয়, সময় হলে বিকাল, সন্ধ্যাতেও ঘরখানি মুখরিত থাকে নানা চিত্তাকর্ষক সুরে। এখানে নিত্য আবাহন চলে রাগের অর্থাৎ যা মনকে রঞ্জিত করে।

সুরে তদ্‌গত গায়ক বাহ্য জগতের অনেক কিছুতেই উদাসীন। তাঁর ধারণাও নেই এই সুরের রঞ্জিনী শক্তি অন্য কোন কোমল হৃদয়কে মায়াবিষ্ট করেছে কিনা।

একদিন গাইবার সময় হঠাৎ নজরে পড়ল ঘরের জানালার মধ্যে দিয়ে অদূরবর্তী আর একটি জানলায়। সেখানে এক যৌবন-ধন্যা রূপসী পর্দার পাশে ছবির মতন দাঁড়িয়ে। সে আয়ত চোখের একাগ্র দৃষ্টি এইদিকেই এবং মুরারির মতন অনভিজ্ঞেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে. সেই দৃষ্টি বিমুগ্ধ মনের।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার গানে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। তারপর ভুলে গেলেন সেই মুগ্ধা তরুণীর কথা।

কিন্তু পরের দিন গাইতে গাইতে আবার সেই অনুরাগিণীকে সেইভাবে দেখতে পেলেন। যতক্ষণ গান চলল তার শেষ পর্যন্তও দেখা গেল বাতায়ন-বর্তিনীকে।

তারপর থেকে দিনের পর দিন।

মুরারিমোহন ঘরের জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। আর খুললেন না।

চোখের আড়াল হতে আবার দেখা গেল আর এক রকমের বিপত্তি।

তখন ও পক্ষ থেকে ভেট পাঠানো আরম্ভ হ'ল। স্থানীয় এক ধনী ও অভিজাত-বংশীয়া নন্দিনী। অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করলেন উপহার সামগ্রীতে। মুরারি আদৌ রূপবান ছিলেন না। তাঁর প্রতি আকৃতি প্রকাশ পায় নিতান্ত সুরের আকর্ষণেই। কোন যুবকের পক্ষে এই অবস্থায় প্রলুব্ধ না হওয়া বড়ই কঠিন। প্রত্যাখ্যান করতে বিশেষ সংযমের প্রয়োজন।

মুরারিমোহন ভেট ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এ পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের ফলে আর অগ্রসর হতে পারলে না নাটিকাটি। বিয়োগান্তে কিছুদিনের মধ্যেই যবনিকাপাত ঘটল।—

লক্ষ্ণৌতে থাকবার সময় পশ্চিমাঞ্চলের আসরে যেমন যোগ দিতেন, তেমনি বাঙলার সঙ্গীতক্ষেত্রের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। বছরে একবার করে আসতেন কলকাতায়। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে গানের অনুষ্ঠান করতেন। বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, নাটোর-রাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ সঙ্গীতপ্রেমীর। তাঁদের মতন মুরারির আরো অনেক গুণগ্রাহী, শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। যেমন সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।

সঙ্গীতক্ষেত্রে মুরারিমোহনের অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করতেন সকলে। তাঁর প্রতি তাঁদের বড় আশা ছিল, ভরসা ছিল প্রদীপ্ত প্রতিভার আধার বলে।...

পশ্চিমে কয়েকটি বড় বড় সঙ্গীত সম্মেলনে, দিল্লী লক্ষ্ণৌ মীরাট প্রভৃতি শহরের নানা আসরে তাঁর গান গাওয়ার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনের মধ্যে বারাণসী সম্মেলনেও যোগ দিয়ে লাভ করেছিলেন গুণীজনের স্বীকৃতি।

বারাণসীতে তিনি আগেও গান গেয়েছিলেন, সেখানেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি হয়েছিল। দু'জন বাঙালী ছাত্রী হয়েছিলেন এখানে। তাঁরা দুই

ভগ্নী। কাশীরই এক বাঙালী গায়ক তাঁদের আগে থেকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্ণৌর ওই সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যাবার সময় শিখতেন মুরারিমোহনের কাছে। কাশীতে তিনি এলে সেখানেও তাঁর কাছে শিখতেন। আগেকার শিক্ষকের কাছে শিক্ষা তাঁরা বন্ধ করে দেননি বটে, কিন্তু মুরারিমোহনের প্রতি ছাত্রীদের সমধিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিচয় পান শিক্ষকটি। তবে মুরারি কিংবা তাঁর ছাত্রীরা বা তাঁদের অভিভাবকরা কেউই শিক্ষকটির মতিগতির সন্ধান জানতেন না।

সেবার আবার মুরারি গাইতে এলেন বেনারস কনফারেন্সে। সঙ্গে ছিলেন, অন্তরঙ্গ দুই সুহৃদ বেহালা-শিল্পী ভি. জি. যোগ ও সেতার-বাদক ডি. টি. যোশী। বয়স তখন তাঁর ২৪ বছর। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত শরীর। এ বিষয়েও ব্যায়াম-বলিষ্ঠ মোহিনীমোহনের যোগ উত্তরাধিকারী।

কিন্তু কোথা থেকে কি যে ঘটে যায়।

এবার কাশীতে আসাই কাল হল মুরারিমোহনের। কিন্তু কার্য-কারণের গূঢ় রহস্য ভেদ করবার সাধ্য সে সময় কারুর ছিল না। যখন উদ্‌ঘাটিত হল—তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি। তখন কোন আশা ভরসা করবার আর নেই।

কিন্তু সে সব পরের কথা পরে। এখন আগেকার বিবরণ দেওয়া যাকে।

কাশীর সঙ্গীত সম্মেলনে মুরারির অনুষ্ঠান হ'ল। গান গাইলেন শ্রোতাদের প্রশংসাধন্য হয়ে।

সঙ্গীত-শিল্পীর আত্মপ্রকাশের আনন্দ। সাধনার সার্থকতার আনন্দে পরিপূর্ণ অন্তর। কোথাও কোন বেসুর নেই যেন জগতে।

সম্মেলনের শেষে তাঁর এক গুণগ্রাহী, সেই ছাত্রী দু'জনের পিতা তাঁদের বাড়িতে প্রীতিভোজের আয়োজন করলেন। মুরারির সঙ্গে সে রাত্রে শ্রী ডি. টি. যোশী প্রভৃতিও নিমন্ত্রিত হলেন। কাশীর সেই সঙ্গীত-শিক্ষকটিও উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

ভোজের ব্যবস্থা প্রচুর। বন্ধুদের সঙ্গে বসে পরমানন্দে মুরারি সে সবের সদ্ব্যবহার করলেন। পাশাপাশি বসে সে রাত্রে আহার করলেন শ্রী যোগ ও শ্রী যোশীর সঙ্গে।

পরের দিন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন তিন বন্ধু মিলে।

কিন্তু মুরারিমোহন জ্বর নিয়ে লক্ষ্ণৌতে ফিরলেন।

প্রথমে কারুরই এমন কিছু গুরুতর মনে হয়নি। অল্প অল্প জ্বর। ওষুধ-পথ্য চলছে। আসা-যাওয়া দেখা-শোনা করছেন মিশনের সন্ন্যাসীরা, প্রিয় সুহৃদ যোগ, যোশী প্রভৃতি। প্রথম দিকে গানও কিছু কিছু হত।

কিন্তু কিছু দিন পরে বোঝা গেল, জ্বর একেবারে ছাড়ছে না। আর মাঝে মাঝে শরীরের মধ্যে একটা যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটা বাড়তে বাড়তে এক সময় অসহ্য বোধ হতে থাকে।

যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বন্ধুরা। প্রথমে জানাশোনা ডাক্তার, পরে লক্ষ্ণৌর সব বড় বড় ডাক্তারই মুরারিকে পরীক্ষা করেন, চলে চিকিৎসা। কিন্তু কোন উপশম হয় না রোগের। দিনের পর দিন আর গান গাইতে পারেন না। ঘর থেকে বেরুনোও বন্ধ।

এককালের সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ দেহ, বিস্তৃত বক্ষ, প্রশস্ত স্কন্ধ এখন দুর্বল, শীর্ণ, রোগ-পাণ্ডুর। প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থা।

অসুখ আরম্ভ হবার কয়েকদিন পর থেকেই বাড়িতে চিঠি আসে—পিতার কাছে, বড় ভাই মনোজমোহনের কাছে। প্রথম প্রথম তাঁরা জানতে পারেন—মুরারির জ্বর হয়েছে, এখনো সারছে না। তবে চিকিৎসার কোন ত্রুটি নেই। কখনো হয়ত ওরই মধ্যে একটু কম থাকে। মুরারি জানান—এখন অনেকটা ভাল আছি। আবার যন্ত্রণাটা যখন বাড়ে, কয়েকদিন পরের চিঠিতে খবর আসে কলকাতায়।

এমনি ভাবে কিছু দিন যায়। গভীর উৎকণ্ঠা বোধ করতে থাকেন পিতা-মাতা। তারপর স্থির হয়, মুরারিকে কলকাতায় আনিয়ে চিকিৎসা করানো হবে। আর দেরি করা উচিত নয়। বিশেষ লক্ষ্ণৌর ডাক্তাররা যখন কিছু করতে পারছেন না।

জ্যেষ্ঠ মনোজমোহন ভাইকে আনতে গেলেন লক্ষ্ণৌ থেকে।

দাদার সঙ্গে মুরারির বড় প্রীতি। ভালবাসেন বন্ধুর মতন। দাদার কাছে তাঁর কোন কথা গোপন নেই। বাইরে থাকতে সবচেয়ে বেশি চিঠি তাঁকেই লেখা হয়। সেই যে সুন্দরী মেয়েটি রোজ জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনত, তারপর ভেট পাঠাত—সেসব কথাও দাদাকে জানাতে বাদ পড়েনি। সরল স্বভাব এবং প্রতিভাবান এই ভাইটির ওপরেও মনোজ-মোহনের অতিশয় স্নেহ।

উদ্বিগ্ন মনে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে, স্টেশন থেকে আমিনাবাদ। সেখানকার রামকৃষ্ণ

মিশনের আশ্রম। তার বাইরের দিকে দোতলার যে ঘরে মুরারি থাকেন সেখানে মনোজমোহন এলেন। ঠিক এতখানি আশঙ্কা করা যায়নি চিঠি থেকে।

শয্যার একপাশে শ্রী যোগ বসেছিলেন, আর তাঁরই গায়ে মাথা রেখে মুরারী অর্ধশয়ান। চেহারা দেখে চিনতে কষ্ট হয়। কি শীর্ণ, বিবর্ণ—এ কি সেই মুরারি?

দাঁড়াবার ক্ষমতা আর মুরারির নেই। দাদাকে দেখে দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। অশ্রুর মধ্যে দিয়ে যেন প্রকাশ পেলে—শুধু স্নেহ নয়-মনের গভীর নৈরাশ্যও! এ ব্যাধিকে পরাস্ত করবার সব দেহিক ও মানসিক শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সেই রাত্রেই তাঁকে ট্রেনে ওঠানো হল স্ট্রেচারে করে। বন্ধুরা স্টেশনে এসে বিদেয় দিলেন।

কলকাতায় আনিয়েই যথাসম্ভব চিকিৎসা আরম্ভ করা হল। প্রথম থেকেই দেখতে লাগলেন ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য্য। উপকার বিশেষ দেখা গেল না। জ্বর আগেকার মতন চলতে লাগল, একদিনের জন্যেও ছাড়ান নেই। আর মাঝে মাঝে পেটে সেই অসহ্য যন্ত্রণা। তারপর ডাক্তার অমলকুমার রায়চৌধুরী চিকিৎসা করলেন কিছুদিন। কিন্তু কোন সুফল হল না।

বিধানচন্দ্র রায়ও এসে মুরারিকে পরীক্ষা করলেন। তাঁর নির্দেশে চিকিৎসা হতে লাগল কিন্তু কোন উপশম হল না সেই জ্বর আর সেই যন্ত্রণার। কি যে রোগ তা তিনিও অন্যান্য বিখ্যাত ডাক্তারদের মতন, নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন না।

এইভাবে আরো কয়েকদিন যায়।

ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যের চিকিৎসা তার পরও আরো কিছুদিন চলল বটে—ডাক্তার রায়ের সম্মতি নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন—কিন্তু মুরারির অভিভাবকেরা আর আশা বা নির্ভর করতে পারছিলেন না চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওপর। স্বয়ং বিধানচন্দ্র এবং অমলকুমারের মতন ধন্বন্তরির হাতেও কোন সুফল যখন পাওয়া গেল না, তখন আর ডাক্তারীর ওপর কি করে ভরসা রাখেন?

একেবারে নিঃশেষ হয়ে এসেছে রোগীর জীবনীশক্তি। শীর্ণ বিবর্ণ শরীর যেন লীন হয়ে গেছে বিছানার সঙ্গে। পাণ্ডুবর্ণ মুখ-চোখ। কথার স্বর এত নিস্তেজ, ক্ষীণ হয়েছে যে, পাশে না থাকলে শুনতে পাওয়া যায় না। শরীরের এমন দুর্বলতা যে পাশ ফিরতে পারেন না ইচ্ছা মতন। পাশ ফিরিয়ে দিতে

হয়। তার ওপর সেই অসহ্য যন্ত্রণা যখন হতে থাকে, মা-বাবা আর চোখ চেয়ে দেখতে পারেন না। একটি দিনের জন্যেও জ্বরের বিরতি নেই। অথচ কি যে রোগ তা কোন ডাক্তার স্থির করতে পারলেন না, উপকার দূরের কথা।

কলকাতায় আসবার পর এইভাবে প্রায় দু'মাস কাটল। ডাক্তারী চিকিৎসার ওপর প্রায় আস্থা হারিয়ে তখন মুরারির অভিভাবকরা সাহায্য নিতে লাগলেন দৈব ওষুধ, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতির 'অলৌকিক' শক্তির। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশী যার কাছে এসব বিষয়ে যা পরামর্শ পাওয়া গেল, সবই একে একে করে দেখা হতে লাগল। কিন্তু কোন সুফল হল না কোন কিছুতেই।

তবে এখন যাঁরা অর্থাৎ সাধু-সন্ন্যাসীরা দেখলেন, তাঁদের কেউ কেউ জানালেন যে, এ কোন সাধারণ রোগ নয়। শারীরিক কোন কারণে এ ব্যাধির আক্রমণ হয়নি। কেউ কোন আভিচারিক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা করে রোগীর এই অবস্থা ঘটিয়েছে। সাধারণ তুক-তাক নয়। কোন সাংঘাতিক মারণ ক্রিয়ার ফলে এ দেহ নষ্ট হতে চলেছে।

কিন্তু এ অপশক্তির নিরাকরণ এ পর্যন্ত সম্ভব হ'ল না কারো পক্ষে। রোগ-যন্ত্রণার কোন উপশম দেখা গেল না।

আরো দু'সপ্তা গেল।

এর মধ্যে মুরারিমোহনের ফিরে আসা এবং অসুস্থতার কথা শুনে অনেকেই দেখে গেছেন বাড়িতে এসে। সঙ্গীত-জগতের সুহৃদ বা গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ীরা। পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, নাটোর-রাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ সঙ্গীতক্ষেত্রের অনেকেই। এমন সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পীকে এই বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে দেখে সকলে গভীর দুঃখ পেয়েছেন, নিরাময় কামনা করেছেন। কিন্তু সমস্ত মঙ্গল ইচ্ছা সত্ত্বেও বাঁচবার আশা আর করা যায় না রোগীর

এমন সময় কলকাতাতেই একজন তথাকথিত 'অলৌকিক' শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেল এবং তাঁকে মুরারির ঘরে নিয়ে আসা হল।

ব্যক্তিটি অবাঙালী, হিন্দুস্থানী। অতি সাধারণ আকৃতি এবং বহির্লক্ষণে সাধু-সন্ন্যাসী কিছুই নন। এমনকি উপার্জনশীল, গৃহস্থ মানুষ রূপেই টালিগঞ্জ অঞ্চলে জীবন যাপন করেন। বিহার প্রদেশের চৌধুরী শ্রেণীর লোক। তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক গাড়োয়ান এবং গাড়ি আছে। তাই অর্থকরী

পেশা। জীবনযাত্রাও আর পাঁচজন হিন্দুস্থানীর মতন নিতান্ত আটপৌরে।

কিন্তু তিনি যে একজন প্রচ্ছন্ন যোগী, তা বোঝা. যায় তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে।

(বাহ্য অবয়ব দেখে যোগশক্তির সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না এমন অনেক যোগীর পরিচয় পূজনীয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা তান্ত্রিক ও অবধূতের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা তাঁর রচনাবলী থেকে অনেক দৃষ্টান্ত পেতে পারেন।)

মুরারির ঘরে প্রবেশ করে তিনি দরজার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। অদূরে খাটে মুরারির শয্যা। কিন্তু সেখানে রোগীর কাছে গেলেন না। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মুরারির মুখের দিকে।

আর তাঁর দিকে দেখতে লাগলেন মোহিনীমোহন প্রভৃতি। পরণে আধময়লা কাপড, গায়ে আধময়লা শার্ট, তার আস্তিন ঝল্‌ঝলে খোলা। মুখে-চোখেও অসাধারণত্বের কোন চিহ্ন ফুটে নেই। তাঁকে দেখে কারুরই মনে আশা জাগবার নয়।

কতক্ষণ অচঞ্চলভাবে এবং এক লক্ষ্যে রোগীর দিকে চেয়ে থাকবার পর তিনি মৌন ভঙ্গ করলেন।

মুরারিকে তাঁর কাছে উঠে আসবার জন্যে হাতের ইশারা করে ডাকলেন—আও, বেটা আও।

তাঁর কথা শুনে বাড়ির সকলে অবাক হলেন। যে রোগী এতদিন যাবৎ শয্যাশায়ী, বিছানায় উঠে বসবার যার ক্ষমতা নেই, ইনি তাকে বলছেন হেঁটে কাছে যেতে

তিনি কিন্তু এক পাও না এগিয়ে ঐই দরজার পাশ থেকে মুরারিকে আবার ডাক দিলেন—আও, বেটা আও।

যন্ত্রণার সময় ছাড়া রোগীর যেমন নিঝুম অবস্থা দেখা যেত, এতক্ষণ তাই ছিল। কিন্তু এই আহ্বান শোনবার পর—মোহিনীমোহন ও বাড়ির অন্যান্যদের দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না—মুরারি আস্তে আস্তে উঠে বসল; শুধু তাই নয়, দাঁড়াল মেঝেয় পা দিয়ে।

ওদিকে তিনি তেমনিভাবে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মুরারির চোখে চোখ রেখে হাতের ইঙ্গিতে আবার ডাকলেন—উধার সে ঘুম্‌কে আও।

শুধু আসা নয়; খাট ঘুরে তাঁর দিকে আসতে হবে। তিনি এইভাবে

ইঙ্গিত করলেন আসতে। তারপর সকলে যারপর-নেই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন—মুরারি টলতে টলতে পা ফেলে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

তখন তিনি এক হাতের তালুতে কি একটা বস্তু অন্য হাতে দলাই করে মুরারিকে দিয়ে বললেন—খা লে।

মুরারি সেটি খেয়ে নেবার পর তাকে বললেন—অব্ শো যাও।

আবার সেইভাবে পায়ে পায়ে এসে রোগী বিছানায় শুয়ে পড়ল।...

তিনি চলে যাবার আগে রোগের পূর্ববৃত্তান্ত সম্পর্কে মোহিনীমোহনকে জানালেন যে, এই ব্যাধি আরম্ভ হয়েছে বাঙলা দেশের বাইরে কোন জায়গায়। সেখানে একদিন নিমন্ত্রণ ভোজনের পরেই এই রোগের উৎপত্তি, ইত্যাদি।

তিনি একটু পরে চলে গেলেন। এদিকে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল রোগীর।

এতদিন পরে এই প্রথম জ্বর ছাড়ল। মুরারির মুখ-চোখের চেহারায় চলে গেল সেই নিরক্ত পাণ্ডুরতা। তার বদলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফিরে আসতে লাগল। দু-একদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, তার শরীরে অনেকটা জোর এসেছে, খাট থেকে নেমে এঘর-ওঘর যাতায়াত করতে পারছে আর পেটের সেই অসহ্য যন্ত্রণাটা একেবারে নেই। এতদিনের রোগমুক্তির নিশ্চিত লক্ষণ।

সব বিষয়েই ভাল বোধ করছে মুরারি। নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে। কথা বলতে আর কষ্ট হচ্ছে না—স্বর সহজ ও স্বাভাবিক। মনের প্রফুল্লতা অনেকখানি ফিরে এসেছে। তাকে দেখে বাড়ির সকলের আনন্দের সীমা নেই। দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষ হল এতদিনে।

এতকাল পরে মুরারির মধ্যে আবার সঙ্গীত জাগছে।

শরীরের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়ে এক সপ্তাহ কাটল।

কিন্তু হঠাৎ তার পরের দিন থেকে আবার বিপরীত পরিবর্তন। জ্বর আর সেই যন্ত্রণা আবার আরম্ভ হল। জীবনের লাবণ্য মিলিয়ে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ-চোখ। দুর্বল নিস্তেজ শরীর। খাট থেকে নামবার আর শক্তি নেই। গলার স্বর আবার সেই অসুস্থ অবস্থার মতন অতি ক্ষীণ, সানুনাসিক হয়ে এল।

ঠিক যত দ্রুত এক সপ্তাহ আগে উন্নতি দেখা গিয়েছিল, প্রায় তেমনি অবনতি দেখা যেতে লাগল এখন। বাড়ির সকলের মন হাহাকার করে উঠল। কি হল আবার!

মনোজমোহন টালিগঞ্জে তাঁর ডেরায় গিয়ে ভাইয়ের এই খারাপ অবস্থার

কথা তাঁকে জানালেন। তিনি শুনে খানিক চিন্তা করে বললেন; যজ্ঞ করতে হবে। সে জন্য কয়েকটা জিনিস আনতে বললেন। যজ্ঞের সেসব সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে আসা হল তাঁর কাছে। তিনি তাঁর ক্রিয়াদি আরম্ভ করলেন।

কিন্তু এদিকে রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলল। কোন দিকেই ভাল নয়। পরের দিন তাঁকে জানাবার জন্যে মনোজমোহন তাঁর এক মাতুলকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন টালিগঞ্জে।

তিনি তখনো যজ্ঞ করছিলেন। সামনে শিখায়িত অগ্নিকুণ্ড। এরা দুজন গিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবামাত্র তিনি ধুনি থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করতে উঠলেন।

প্রাথমিক বিমূঢ় ভাব কেটে যেতেই তাঁরা দু'জন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলেন আত্মরক্ষার জন্যে।

তিনি খানিক দূর পর্যন্ত সেই জ্বলন্ত কাঠ হাতে তাঁদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে এলেন। তাঁর মুখে এই রকম আর্তস্বর শোনা যেতে লাগল— তোম্ লোগোঁকো ওয়াস্তে মেরা জান্ চালা যায়গা! উও লোগ হাম সে আউর বড়া গুণীন্ হ্যায়।

এরা দু'জনে প্রাণপণ দৌড়ে তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেলেন এবং বাড়ি ফিরে এলেন।

কি থেকে কি হল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তখনই ধারণা করতে পারেননি। হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর এই আকস্মিক ভাব-বৈপরীত্য দেখে। যাঁর কাল পর্যন্ত অন্যরূপ দেখা গেছে, হঠাৎ আজ এ কি হল তাঁর? তিনি এতবড় উপকার করেছিলেন, অথচ আজ এই মারমূর্তি! দুর্বোধ্য। শুধু একটা জিনিস বোঝা গেল যে তাঁর কাছে আর যাওয়া চলবে না।

তা হলে মুরারির কি হবে? আর কোন দিকে আশা করবার মতন কিছু নেই। এই কদিন আগে তার নীরোগ হবার সময়ে ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য একবার দেখেছিলেন এবং বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন তার অভাবিত উন্নতি দেখে। কিন্তু এখন তাঁরও আর বিশেষ ভরসা দেবার চিকিৎসা নেই।

এদিকে পরের দিন টালিগঞ্জ থেকে কয়েকজন হিন্দুস্থানী এসে আর এক অবিশ্বাস্য বিবরণ দিলে মুরারির অভিভাবকদের। গতকাল—মনোজমোহন ও তাঁর মাতুল সেখান থেকে চলে আসবার কয়েক ঘণ্টা পরে—তিনি রক্ত বমন করতে করতে মৃত্যুমুখে পড়েছেন! মৃত্যুর আগে দারুণ বেদনায় কষ্ট

পেয়েছিলেন এবং কাতর কণ্ঠে তাঁকে শুধু বলতে শোনা যায়—হামারা জান লে লিয়া। উও গুণীন্ হামকো মার ডালা।···

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাবার মতন সংবাদ! রীতিমত সুস্থ সমর্থ যে মানুষ যজ্ঞ করেছিলেন রোগীর আরোগ্য কামনায়, তাঁর অকস্মাৎ এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত বমন করে মৃত্যু ঘটে গেল!

ওদিকের সমস্ত আশাই এখন নিঃশেষ!

তারপর রোগীর অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটতে লাগল পাঁচ-ছ'দিন ধরে। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় সেদিন সকালবেলা প্রতিবেশী রাজা রায় মশায় তাঁর গুরুদেবকে নিয়ে এলেন মুরারিকে একবার দেখাবার জন্যে। মোহিনী-মোহনকে তিনি বলে রাখলেন যে, যদি গুরুদেব মুরারিকে দেখবার পর এ সম্পর্কে কোন কথা না বলেন, তা হলে বুঝতে হবে অবস্থা ভাল নয় এবং তাঁকে যেন তখন কিছু জিজ্ঞাসা করা বা বলা না হয়।

রায় মহাশয়ের গুরুদেব যখন ঘরে এলেন, মুরারি তখন যন্ত্রণায় কাতর। তিনি খানিকক্ষণ রোগীর দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর হয়ে রইলেন।

তারপর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে মুরারির গলা বুক পেটের ওপর দিয়ে নিজের ডান পা-টি আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিলেন। এইভাবে পা দিয়ে স্পর্শ করবার পর চলে গেলেন তিনি। কোন কথা বললেন না।

আর মুরারির সেই বিষম যন্ত্রণাটা একেবারে কমে গেল। তিনি বেশ আরাম বোধ করতে লাগলেন তখন থেকে। কথাবার্তা আবার সহজ হয়ে এল। এই ক'দিনের বেদনা দুর্ভোগের পরে একটা শান্তির ভাব এল তাঁর মনেপ্রাণে। এটা সকলেই লক্ষ্য করলেন। রোগীর outlook ভরসা করবার মতন দেখাচ্ছে।

তবে, সপ্তাহখানেক আগে রোগ যেমন একেবারে নিরাময় হয়েছিল, আজকের অবস্থাটা ঠিক তা নয়। রোগমুক্তি হয়নি, শরীরে জোর আসেনি কিংবা দুর্বলতাও যায়নি, কিন্তু রোগী এমন শান্তি আর আরাম বোধ করছেন যা এই শেষের কদিন আদৌ ছিল না। তাই বাড়িতে আবার আশা জাগল—মুরারির ভাল হয়ে ওঠবার একান্ত আশা।

কিন্তু মায়ের কি একটা কথার উত্তরে তখনি মুরারি বলে উঠলেন—আমি তো আজ চলে যাচ্ছি!

কথা শুনে সকলে শিউরে উঠলেন। —ছি, এমন অলক্ষণে কথা মুখে

আনতে নেই। আর কখনও বলো না। তুমি তো অনেক ভাল আছ এখন

সত্যিই রায় মশায়ের গুরুদেবের পা দিয়ে স্পর্শ করবার পর মুরারিকে দেখে ভাল হবার আশাই জাগে। তাই অবিশ্বাস্য মনে হয় ওই সাংঘাতিক কথা।

কিন্তু তখন থেকে মুরারির মুখ থেকে অনেক বারই সেদিন শোনা যায়। আমি আজ রাত্তিরে চলে যাব।

কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন সুহৃদয়ের নাম করে বলতে লাগলেন সকলকে নিয়ে আসবার জন্যে, তাঁদের দেখতে ইচ্ছে করছে।

এমন সুস্থ কথাবার্তার ধরণ এবং জর্জর দেহেও যতখানি সম্ভব এমন প্রাণবন্ত ভাব যে তাঁর কথা বাড়ির কারুরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। আরোগ্যের আশা করছিলেন সকলেই। তবু মুরারির কথা মতন সকলকে খবর দিয়ে আনা হতে লাগল দেখা করাবার জন্যে।

দুপুর গেল, বিকাল গেল!

গানের কথাও মনের মধ্যে বেশ ছিল। আশ্চর্য শোনাতে লাগল যখন দু-একবার বললেন—এবার গান শেখা বিশেষ কিছু হল না। পরের বার আবার যখন আসব, খুব ভাল করে গান শিখব। গান শিখতে আবার আসব।

এ সব কথা যাঁরা শোনেন, চোখ সজল হয়ে ওঠে। কিন্তু মুরারিকে দেখে বিশ্বাস করতে কিছুতেই মন চায় না। কেন এ জীবনে গান কিছু হবে না? জীবনের এখনও অনেক বাকি। সেরে উঠবে। আমার গান গাইবে। অপূর্ণতার ছেদ পড়বার লক্ষণ ত দেখা যায় না!…

ক্রমে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি এল। যাদের নাম করে করে দেখা করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন, দেখা হল সকলেরই সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় রাত নটা বেজে গেল।

তারপর বাড়ির আপন জনদের সঙ্গে কথায় আরও কিছুক্ষণ গেল। তারপর মুরারি মাকে ডেকে দিতে বললেন।

—মা, একটু জল দাও।

মায়ের হাতে জল খাওয়ার পর মুহূর্তেই সব শেষ! জলটুকু খাওয়ার জন্যেই যেন প্রাণটি ছিল।……

মৃত্যুর অনেকদিন পরে দুর্ঘটনার রহস্য অনেকখানি ভেদ হয়েছিল নানাসূত্রে পাওয়া বিবরণে।

মুরারির অভিভাবকরা জানতে পেরেছিলেন, সব নষ্টের মূলে কাশীর সেই ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গীত-শিক্ষকটি। ছাত্রীদের মুরারিমোহনের কাছে শিক্ষার আগ্রহ ও শ্রদ্ধার ভাব দেখে আক্রোশের বশে সে সেই নিমন্ত্রণের রাত্রিতে অলক্ষ্যে শত্রুতা সাধনের ব্যবস্থা করে। সম্ভবত কোন আভিচারিক ক্রিয়াসিদ্ধ ব্যক্তির সাহায্য সে নিয়েছিল।......

কিন্তু একথা জানতে পারা যায়নি—মুরারির ব্যাধির উপশম যিনি করতে সমর্থ হন, তাঁর শোচনীয় ও আকস্মিক মৃত্যু কি প্রক্রিয়ায় ঘটালো কাশীর সেই দুষ্কৃতকারিরা।

তবে জানতে পারা যায়নি বলেই যে ব্যাপারটি ঘটেনি তা তো নয়। জীবন ও জগতের সব কথা কি এ পর্যন্ত জ্ঞাত হয়েছে?

হ্যাম্‌লেটের সেই বহুল-প্রচারিত উক্তিটি তাই আজও একটি দিক্‌দর্শনী হয়ে আছে—

There are more things in heaven and earth, Horatio
Than are dreamt of in your philosophy.

তবে বিজ্ঞানী মানুষের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার নব নব জয়যাত্রার পথে এত এগিয়ে চলেছে, যে ভবিষ্যতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের পার্থক্য কি পরিমাণ থাকবে, কেউ বলতে পারে না। বিচিত্র-প্রতিভা বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের Tele-theraphy যদি সম্ভব হয়ে থাকে, Tele-killing কেন বিশ্বাস করা যাবে না?

কিন্তু কারণ যা-ই হোক, এমন প্রতিভার এই শোচনীয় অকাল বিসর্জন হয়ে গেল!

যেন একটি বসন্ত-বাহারের খেয়াল আরম্ভ হয়েছিল অপরূপ সম্ভাবনা নিয়ে নিয়ে। সংক্ষিপ্ত আলাপচারির পরে তারই প্রতিশ্রুতি ভরা স্থায়ী কলিটি মাত্র শোনা গিয়েছিল। কিন্তু উদাত্ত অন্তরা আর নব নব তান বিস্তারের লীলা বিলাসের আগেই অকস্মাৎ গানখানি স্তব্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে!



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৩	হুইয়া	লইয়া
৬	১	'গিরশিচন্দ্র'	'গিরিশচন্দ্র
৮	৪	ছুড়ে	ছুঁড়ে
১২	৩০	গুর্জার, তোড়ি	গুর্জরি তোড়ি
১৪	৭,৮	দরবারি, কানাড়া	দরবারি কানাড়া
১৮	২০	ঘটনা জীবনের	জীবনের ঘটনা
৪৮	২৫	নরেন্দ্রনাথ	নগেন্দ্রনাথ
৫৯	২৯	বল্লেন	চল্লেন
৮০	৯	সঙ্গে	সঙ্গ
৮৮	২	পরে	পরের
,,	,,	পরের	পরে
৯৫	৮	অভিনেত্রীগণ	অভিনেতৃগণ
১০৪	১৭	বানের	বাদনের
১১০	৩	সুপ্পণ খাঁ আর	সুপ্পণ খাঁর
১১১	১৩	সঙ্গীতকার রূপে	সঙ্গতকাররূপে
১১২	৪	হয়েছে	হয়েছেন
১১৩	২	সাত্রা	মাত্রা
,,	১২	এখানকার	এখনকার
১২০	২৫	সঙ্গত	সঙ্গীত
১২২	১	হাতে	হাতের
১২২	১৪	সঙ্গীত, সঙ্গীতের	সঙ্গত, সঙ্গতের
১২৭	২১	লাগনে	লাগলেন
১৩৪	৩	সঙ্গত সভায়	সঙ্গীত সভায়
১৩৭	২০	বলে	হলে
১৫৩	১৭,১৮,২০,২৫	বাঙাল	বাঙ্গাল
১৭৮	২৯	এরা	এবং
১৭২	১৬	এল	এসে
১৭৬	১৭	'অমৃতকণ্ঠ ধ্রুপদী'	'এক মধুকণ্ঠ ধ্রুপদী
১৭৭	২	মৌজুদ্দিন	জগদীপ

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
১৭৮	৩	মধুকণ্ঠী	মধুকণ্ঠ
১৭৯	৪	সঙ্গীত	সঙ্গীত
১৭৯	২১	ধ্রুপদ-পাখোয়াজী	ধ্রুপদী-পাখোজী
১৮২	৩	তা	না
১৮৫	৩	জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা	জ্যেষ্ঠ ভাত
১৯৩	১১	তাঁদেয়	তাঁদের
১৯৭	২৭	খুইব	খুবই
২০৮	৯	সোনা	শোনা
২১৩	১৭	কর	করা
২১৭	১২	সঙ্গীতকার	সঙ্গতকার
২১৮	২৭	করছিলেন	করেছিলেন
২১৯	১৯	আজ	আর
২২০	১০	কিছু	কিন্তু
২২৪	১৩	ঠমক	গমক
২২৬	১৭	ভাগ	ভাগী
২৩৩	৩	সঙ্গীতকার	সঙ্গতকার
২৩৪	২৫	শিখকে	শিখতে
২৫৪	২১	বধিবারে	পরিবারে
২৬১	২৫	কেই	কেউ
২৭১	৫	শেখাত	শেখাতে
২৭১	২৭	বয়সেরই	বয়সেই
২৭১	২৮	প্রবাসী	প্রয়াসী
২৭৯	১১	যোগ	যোগ্য
২৭৯	১৭	যাকে	যাক
২৮১	৮	দেহিক	দৈহিক
২৮১	১১	বিদেয়	বিদায়
২৮২	১০	কেই	কেউ
২৮৭	১৮	আমার	আবার
২৮৮	২২-২৩	নিয়ে নিয়ে	নিয়ে
২৮৮	২৩	প্রতিকৃতি	প্রতিকৃতি